আল কুর'আনে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের নির্দেশনা: একটি বিশ্লেষণ

(Qur'anic Directives on Family and Social Relations: An Analysis)

পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র
আগস্ট-২০২০

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
সাজেদা হোমায়রা
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি. নং- ১০৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “আল কুর’আনে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের নির্দেশনা: একটি বিশ্লেষণ” (Qur’anic Directives on Family and Social Relations: An Analysis) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণাকর্ম। পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ গবেষণাপত্র বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

____

(সাজেদা হোমায়রা)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি. নং- ১০৩/২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সাজেদা হোমায়রা কর্তৃক উপস্থাপিত "আল কুর'আনে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের নির্দেশনা: একটি বিশ্লেষণ" (Qur'anic Directives on Family and Social Relations: An Analysis) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোনো অংশ অন্যের ডিগ্রী থেকে নেয়া হয়নি অথবা অন্য কোনো প্রকাশনায় প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি। সুতরাং গবেষককে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

_____

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য, যার অশেষ রহমতে পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের নির্দেশনাবলী নিয়ে আমার গবেষণা "আল কুর'আনে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের নির্দেশনা: একটি বিশ্লেষণ" (Qur'anic Directives on Family and Social Relations: An Analysis) শেষ করতে পেরেছি। সালাত ও সালাম শেষ নবী মানবতার মুক্তির মহান দূত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর মহান সাহাবাগণ, তাবি'ঈনসহ মহান ব্যক্তিগণের প্রতি যারা তাঁদের জীবনকে গঠন করেছিলেন কুর'আনের আদর্শে।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে, আমাকে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন লাভ ও এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার অনুমোদন প্রদানের জন্য।

আমার পরম শ্রদ্ধাঞ্জলি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন এর প্রতি, যাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে চির কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ রেখেছেন।

অতঃপর আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম ও মাতা সেহেলী শহীদের প্রতি যাদের দু'আ, উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতায় আমি পিএইচ.ডি. গবেষণা কর্মটি শেষ করতে পেরেছি। আমি তাঁদের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন এর তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি. গবেষণায় যোগদান করি এবং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ রহমতে অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রতিটি পর্যায়ে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় আন্তরিকতার সাথে আমাকে উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছেন। তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নেয়ার পথ প্রশস্ত করেছেন। তিনি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

এর সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি। বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রতি সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমার পিএইচ.ডি. গবেষণায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা নিয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গের বই থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি তাঁদের প্রতিও আমি অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

-গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশন

আ.	আলাইহিস সালাম
সা.	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	রাদিয়াল্লাহু ‘আন্হু/ ‘আন্হুম/ ‘আন্হা/ ‘আন্হুমা/ ‘আন্হুন্না
রহ.	রাহ্ মাতুল্লাহি ‘আলাইহি
ড.	ডক্টর
পৃ.	পৃষ্ঠা
হি.	হিজরী
বি.দ্র.	বিশেষ দ্রষ্টব্য
ঢা.বি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ্রি.	খ্রিষ্টাব্দ
ইমাম বুখারী	আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা’ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী
ইমাম তির্মিযী	আবূ ‘ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ‘ঈসা আত-তির্মিযী
ইমাম আবূ দাঊদ	আবূ দাঊদ সুলাইমান ইব্ন আশআস্ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহ্মদ ইব্ন শু‘আইব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ্	আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহ্মাদ	আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল
ইব্ন কাসির	আবূল ফিদা ‘ইমাদুদ্দীন ইসমা‘ঈল ইব্ন কাসির
ইব্ন জারীর	আবূ জা‘ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী
ই. ফা. বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়হাকী	আহ্মাদ ইব্ন হুসাইন আল-বায়হাকী
প্রাগুক্ত	পূর্বে উল্লেখিত তথ্যসূত্র

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	১
১ম অধ্যায়	**পরিবার ও সমাজ**	**৪**
১ম পরিচ্ছেদ	পরিবারের পরিচয়	৫
	পরিবারের ভিত্তি	৮
	পারিবারিক বন্ধন	১১
২য় পরিচ্ছেদ	আত্মীয়তার বন্ধন: রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক	১২
৩য় পরিচ্ছেদ	বিয়ে ও বিয়ের গুরুত্ব	২০
	বৈবাহিক সম্পর্কীয় আত্মীয়	২৮
৪র্থ পরিচ্ছেদ	পরিবার ও সমাজ: সমাজ কাঠামোর মৌলিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য	২৯
	সমাজের পরিচয়	৩১
	সামাজিক কাঠামো	৩৩
	সামাজিক মূল্যবোধ	৩৪
	সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি	৩৫
২য় অধ্যায়	**কুর'আন ও পরিবার**	**৩৮**
১ম পরিচ্ছেদ	কুর'আনের আলোকে পারিবারিক সম্পর্কের বিস্তৃত ধারণা	৩৯
	আল কুর'আনে মা	৪০
	আল কুর'আনে বাবা-মা	৪৬
	আল কুর'আনে সন্তান সন্ততি	৫৬
	আল কুর'আনে দাম্পত্য জীবন	৬৭
২য় পরিচ্ছেদ	পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব: কুর'আনি দৃষ্টিকোণ	৭৮
৩য় অধ্যায়	**কু'রআন ও সমাজ**	**৯৩**
১ম পরিচ্ছেদ	রাসূল (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত কুর'আনি সমাজ	৯৫
২য় পরিচ্ছেদ	কুর'আনি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা	১০৪
৩য় পরিচ্ছেদ	আল কুর'আনে বর্ণিত সামাজিক কাঠামোর রূপরেখা	১১৩
৪র্থ পরিচ্ছেদ	ইসলামে সামাজিক সুবিচার	১২৪
৫ম পরিচ্ছেদ	কুর'আনের দৃষ্টিতে সমাজ জীবনে পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা	১২৮

৪র্থ অধ্যায়	**পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল কারণসমূহ এবং এর সমাধানে কুর'আনের নির্দেশনা**	**১৩৯**
১ম পরিচ্ছেদ	পরিবারবিহীন সমাজ: মানবতার অধঃপতন	১৪২
২য় পরিচ্ছেদ	প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক অশান্তি	১৪৫
৩য় পরিচ্ছেদ	নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়: হুমকির মুখে পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা	১৫০
৪র্থ পরিচ্ছেদ	রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা: পারিবারিক ও সামাজিক অস্থিরতার অন্যতম কারণ	১৫৫
৫ম অধ্যায়	**আল কুর'আনে বর্ণিত পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো অনুসরণের সুফল**	**১৫৮**
১ম পরিচ্ছেদ	সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কুর'আন বর্ণিত পরিবার	১৫৯
২য় পরিচ্ছেদ	মুসলিম সমাজে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব	১৬৬
৩য় পরিচ্ছেদ	সমাজের কল্যাণ সাধনে ইসলামী আইনের সফলতা	১৭৭
	সুপারিশমালা	১৮৫
	উপসংহার	১৮৭
	গ্রন্থপুঞ্জি	১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের এবং তিনিই তা লাভের যোগ্য। মহান আল্লাহ এ মহাবিশ্বকে সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী ও আকাশ এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক তিনিই। মানব জীবনকে সুন্দর ও সুশৃংখল করে পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ পাঠিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কুর'আন। আল কুর'আনের শিক্ষা থেকে সঠিক পথ নির্দেশ লাভ করতে হলে এ কিতাবের প্রতিটি কথা বুঝতে হবে, অনুভূতির তীব্রতা দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। কেননা কুর'আন কিয়ামত পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য জীবন সমস্যার সব বিষয়ই পরিপূর্ণ সমাধান দিতে সক্ষম। কুর'আন অবতীর্ণ হবার যুগ থেকে বর্তমান শতাব্দীর চলমান যুগ পর্যন্ত মহাগ্রন্থ আল কুর'আন নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে যে গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয়েছে, এ পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নিয়ে এমন গবেষণা হয়নি। কুর'আন নিয়ে গবেষণার সমাপ্তি নেই এবং পৃথিবী ও মানব সভ্যতার অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত এর গবেষণা চলতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর মানুষ লাভ করতে থাকবে নিত্য নতুন তথ্য ও তত্ত্ব।

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের নাম ইসলামী জীবন বিধান। সমগ্র মানব জীবনকে কেন্দ্র করেই এ বিধান রচিত। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক জীবনের সবকিছুতেই আল্লাহর নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। জীবনের কোনো একটি দিক বা কর্মক্ষেত্র তাঁর বিধান থেকে বাদ যায়নি। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান হলো তাঁর অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে জীবন যাপন করা। আর এরই নাম ইসলাম। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক মহান স্রষ্টার অনুগত ও বাধ্যগত জীবন যাপন করছে। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ বলেন: "তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন সন্ধান করছে? অথচ মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই আছে সবাই ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাদের ফেরত নেয়া হবে তাঁরই কাছে।" (আল কুর'আন, ৩:৮৩)

এ আয়াত অনুযায়ী মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর প্রতি অনুগত মুসলিম। তবে মহান আল্লাহ মানুষের প্রতিটি অংগ প্রতংগকে প্রকৃতিগত মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্ত মানুষের ইচ্ছাকে করে দিয়েছেন স্বাধীন। তাই মানুষ সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি সকল বিষয়ে কোনটি গ্রহণ করবে সেক্ষেত্রে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষ যেন তার ইচ্ছার স্বাধীনতার দ্বারা নিজের জন্য মিথ্যা, অন্যায়, অসত্য ও অকল্যাণকর পথ বেছে নিয়ে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দেয়, সেজন্য মহান আল্লাহ জীবন বিধান ও জীবন যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন পৃথকভাবে সবকিছুর। আর নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে কল্যাণ, মুক্তি ও সাফল্যর পথ দেখিয়েছেন।

বর্তমান বিশ্বে যতো প্রকার ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, যৌনবাদী, বস্তুবাদী-ভোগবাদী মতবাদ আছে, সেগুলো কোনোটিই নিখুঁত, নির্ভুল, অনাবিল তিনটি উপাদান উপহার দিতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে সকল মতবাদই ব্যর্থ একমাত্র ইসলাম ছাড়া। একমাত্র ইসলামেই রয়েছে এ তিনটি নিখুঁত উপাদান।

০১. এ পৃথিবীসহ মহাবিশ্ব এবং মানুষের মহান স্রষ্টা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও অবিচল আস্থা।
০২. আল কুর'আন ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহয় বিবৃত ও বর্ণিত নিখুঁত নীতিমালা।
০৩. আল্লাহর রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণের সুখী পরিবার সমূহের ঐতিহাসিক উপমা।

Dhaka University Institutional Repository

এ নীতিমালাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায়, পরিবার ও সমাজকে শান্তিময় করে তুলবার জন্য চমৎকার এবং টেকসই নীতিমালা প্রদান করেছে ইসলামের উৎস আল কুর'আন।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব কল্যাণ। ইসলামী শরীয়তের সকল প্রকার আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধের লক্ষ্যই হলো মানুষের জন্য সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবন পরিচালনার জন্য কুর'আন স্পষ্ট পথ নির্দেশ দিয়েছে। এ পথ নির্দেশ পাওয়া যায় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল পর্যায়ে এবং সমস্ত কাজকর্মের ক্ষেত্রে। ইসলাম মানব জীবনকে একটি একক হিসেবে দেখে। মানব জীবনের দুটি পর্যায় রয়েছে। একটি হচ্ছে ইহজাগতিক জীবন যা ক্ষণস্থায়ী এবং আরেকটি হচ্ছে আখিরাতের জীবন যা চিরস্থায়ী। এ পর্যায়দ্বয়ের কোনো একটিকে বাদ দিয়ে মানুষের সার্বিক কল্যাণ চিন্তা করা যায় না। মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন তা জীবনের উভয় পর্যায় বিস্তৃত হয়। আল্লাহ মানুষকে জীবনের উভয় পর্যায়ের কল্যাণ কামনা করার শিক্ষা দিয়েছেন।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবন মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানব সমাজে পরিবারই হলো মানুষ গড়ার মূল কেন্দ্র এবং সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি। সমাজের শান্তি, শৃংখলা, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার ওপরই নির্ভরশীল। পরিবারই হচ্ছে কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি। আদর্শ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত আদর্শ পরিবার গঠন। পরিবার গড়ে ওঠে যে আদর্শে সমাজও গড়ে ওঠে সে আদর্শে। পরিবার ও সমাজের সুস্থতার ওপরই নির্ভর করে বিশ্বময় মানব জাতির শান্তি ও সুস্থতা। মানুষ সমাজমুখী হয় পরিবার থেকে। সমাজ থেকে মানুষ ফিরে আসে পরিবারে। পরিবার মানুষের উৎপাদন কেন্দ্র এবং প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র।

একটি আদর্শ পরিবার ও সমাজ তখনই হতে পারে যখন তা গঠিত হবে মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আলোকে। আল কুর'আন হলো আল্লাহর সে শাশ্বত বিধান। আল কুর'আন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য জ্ঞানের ফল্গুধারা। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এতে রয়েছে দিক নির্দেশনা। আল কুর'আনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন ও সমাজ পরিচালনা করার মাধ্যমে মানুষ ইহজীবন ও পরলৌকিক জীবনে লাভ করতে পারে শান্তি, কল্যাণ, মুক্তি ও সাফল্য। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মতো পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেরও সুস্পষ্ট রূপরেখা রয়েছে আল কুর'আনে। এ রূপরেখার ভিত্তিতে পরিবার ও সমাজ জীবন গঠন করার মাধ্যমে মানব সমাজ দুনিয়া ও আখিরাতে লাভ করতে পারে মুক্তি ও সাফল্যর জীবন।

এ অভিসন্দভের মূল উদ্দেশ্য পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোকে ইসলামী দৃষ্টিভংগীর আলোকে পর্যালোচনা করা, নিরীক্ষণ করা ও বিশ্লেষণ করা। পর্যবেক্ষণের আলোকে পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা এবং তা নিরসনের জন্য আল কুর'আনের আলোকে সুন্দর ও আদর্শ পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর রূপরেখা উপস্থাপন করা।

এ গবেষণা কর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ১ম অধ্যায়ে পরিবার ও সমাজের পরিচয়, আত্মীয়তার বন্ধন এবং বিয়ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২য় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কুর'আনের দৃষ্টিতে পারিবারিক সম্পর্কের বিস্তৃত ধারণা, পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত কুর'আনি সমাজ, কুর'আনি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজ জীবনে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়ে পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পরিবারবিহীন সমাজের পরিণতি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা।

৫ম অধ্যায়ে আল কুর'আনে বর্ণিত পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো অনুসরণের সুফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য থিসিস বা গবেষণা কর্মটিতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবার ও সমাজের অশান্তি ও অস্থিরতার চিত্র তুলে ধরে মহান আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনার যে মহাকল্যাণময় নির্দেশনা দিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। এ বিষয়টি বর্তমান বিশৃঙ্খল ও অশান্ত সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিগঠনের ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

প্রথম অধ্যায়

পরিবার ও সমাজ

পরিবার মানব সমাজের মূলভিত্তি। পরিবার থেকেই সমাজের সৃষ্টি। সমাজের শান্তি-শৃংখলা, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ইত্যাদি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার ওপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। যদি পারিবারিক জীবন অসুস্থ ও নড়বড়ে হয়, তাতে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তাহলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক। সভ্যতার শুরু থেকেই সমাজবিজ্ঞানীরা পারিবারিক জীবনের সুস্থতা ও সুষ্ঠুতার ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরিবারই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। বহুসংখ্যক পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে উঠে সমাজ। আর সমাজেরই বিকশিত ও সুসংগঠিত রূপ হলো রাষ্ট্র। পরিবার ছাড়া সমাজ টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং সমাজের সুস্থতার জন্যে পরিবার দরকার। বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাতে সূচনা হয় তাদের পারিবারিক জীবনের। অতপর জন্ম নেয় তাদের সন্তান সন্ততি। সন্তান লালন-পালন ও সন্তানের সুশিক্ষার জন্যে পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। পরিবারেই একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। তারা একে অপরের সাথে মিলে মিশে থাকতে চায়। বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন মানুষের প্রকৃতি বিরোধী। আর এ জন্যেও মানুষের পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। পরিবারভুক্ত হয়ে মানুষ সমাজে বাস করে। পরিবারে জন্ম এবং পরিবারেই তার আজীবন অতিবাহিত হয়। সমাজ- জীবন যাপন করার জন্যে মানুষ যেসব প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তার মধ্যে বিবাহ ও পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন। এটা গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে পরিবারই একমাত্র ব্যবস্থা যা ইন্দ্রিয় সর্বস্ব জীবকে মনুষ্য পদবাচ্য করে তোলে। আরেকটি দিক থেকেও এটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন না করলে মনুষ্যজাতি সম্ভবত এতোদিনে বর্তমান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছতে পারতো না।[১]

আল্লাহ তা'য়ালা প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, দয়া, স্নেহ, সহানুভূতি মানুষের প্রকৃতিজাত করে দিয়েছেন। এসব শুভ মানবিক গুণাবলীই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মর্যাদা দান করেছে। এসব গুণাবলী সংরক্ষণের জন্য পারিবারিক জীবন অপরিহার্য।

একটা শিশু জন্মের পর অসহায় অবস্থায় থাকে। সে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত অন্যের আশ্রয়, তত্ত্বাবধান ও সেবা তার দরকার হয়। শিশুকে লালন-পালনের মাধ্যমে পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর ও পরিমাজিত হয়। এভাবেই পারিবারিক আচার ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

মানব শিশু বেঁচে থাকার সব কৌশল ও শক্তি জন্ম সূত্রে লাভ করে না। তাকে অনেক কিছু শিখতে হয়। মানব শিশুকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং সমাজস্থ লোকদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে অবহিত না করাতে পারলে সমাজে বাস করা সম্ভব হয় না। এ গুরুদায়িত্ব পরিবারের ওপর ন্যস্ত।

---

০১. পরিমলভূষণ কর, *সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০১), পৃ. ২৯৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিবারের পরিচয়

পরিবার রাষ্ট্রের প্রথম স্তর, সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর। পরিবারেরই বিকশিত রূপ রাষ্ট্র। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রভৃতি একান্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে পরিবার। বৃহদায়তন পরিবার কিংবা বহু সংখ্যক পরিবারের সমন্বিত রূপ হচেছ সমাজ। আর বিশেষ পদ্ধতিতে গঠিত সমাজেরই অপর নাম রাষ্ট্র। একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের মূলে নিহিত রয়েছে সুসংগঠিত সমাজ রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার ওতপ্রোত এবং পারস্পরিকভাবে গভীর সম্পর্কযুক্ত। এর কোনো একটিকে বাদ দিয়ে অপর কোনো একটির কল্পনাও অসম্ভব। পরিবার সমাজেরই ভিত্তি। রাষ্ট্র সুসংবদ্ধ সমাজের ফলশ্রুতি। পরিবার থেকেই শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবনের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুষ্ঠুতার ওপর। আবার সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্রের প্রতীক। পরিবারকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজের কল্পনা করা যায় না, তেমনি সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রও অচিন্তনীয়। মানুষ সামাজিক জীব। পরিবারের মধ্যেই হয় মানুষের এ সামাজিক জীবনের সূচনা। মানুষ সকল যুগে ও সকল কালেই কোনো না কোনোভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীনতম কাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা প্রথম স্তর হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের যে গুরুত্ব, প্রাচীনতম কালে- মানুষের প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা যখন শুরু হয়েছিলো, মানবতার সে আদিম শৈশবকালে পরিবার ছিল সে গুরুত্বের অধিকারী।[২]

পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি। পরিবার থেকেই সমাজ গঠিত হয়। পরিবার আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা অনুযায়ী বৈধ পন্থায় সম্পর্কিত একজন পুরুষ, একজন নারী ও তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে গড়ে উঠে যে ক্ষুদ্র জনসমষ্টি তা-ই হলো 'পরিবার'।[৩]

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর একজনের সান্নিধ্য আরেক জনের জন্যে পরমশান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাজনক করে দিয়েছেন।

وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ •

অর্থ: তাঁর আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে জুড়ি (স্বামী-স্ত্রী), যাতে করে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো। এ উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন বন্ধুতা-ভালবাসা এবং দয়া-অনুকম্পা। এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।[৪]

তিনি তাদের উভয়ের মিলনের বৈধ পন্থাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তাদের এ বৈধ মিলনকে কেন্দ্র করেই সূত্রপাত হয়েছে পরিবারের। এ মিলন থেকেই জন্ম লাভ করেছে তাদের বংশধারা, সৃষ্টি হয়েছে আত্মীয়তা। সুতরাং মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা অনুযায়ী বৈধ পন্থায়

---

০২. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৩৩

০৩. আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামের পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: বর্ণালি বুক সেন্টার, ২০০৭), পৃ. ১১

০৪. আল কুর'আন, ৩০:২১

সম্পর্কিত একজন পুরুষ, একজন নারী ও তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে গড়ে উঠে যে ক্ষুদ্র জনসমষ্টি তাই 'পরিবার'। মহান আল্লাহ বলেন:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا •

অর্থ: তিনিই সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে মানুষ, তারপর তাদের মাঝে বংশীয় এবং বৈবাহিক বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন। জেনে রাখো, তোমার প্রভু শক্তিমান।[৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا •

অর্থ: হে মানুষ! তোমরা সতর্ক হও তোমাদের রবের প্রতি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি আত্মা থেকে। আর তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। অতঃপর তাদের দু'জন থেকে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। তোমরা ভয় করো আল্লাহ্‌কে, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা (পরস্পর থেকে) তোমাদের অধিকার দাবি করো। আর সতর্ক হও রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের (অধিকারের) ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধানকারী পাহারাদার।[৬]

পরিবারের প্রকারভেদ:

পরিবার সাধারণত দু'প্রকার হয়ে থাকে:

(ক) যৌথ পরিবার

(খ) একক পরিবার

যৌথ পরিবার: পিতামাতা, স্বামী, স্ত্রী, ভাই বোন ও পুত্র কন্যাদের নিয়ে গঠিত হয় যৌথ পরিবার।

একক পরিবার: স্বামী স্ত্রী দু'জনকে নিয়ে গঠিত হয় একক পরিবার। অতপর তাদের সন্তান সন্ততি জন্ম লাভ করে এবং সন্তানদের বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত তারা একক পরিবারের সদস্য থাকে।

পরিবার হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের আয়না। মানবাধিকার, জনসংখ্যা ও নারীদের অগ্রগতি পরিবার দ্বারা প্রভাবিত। সামাজিক উন্নয়নের ধারা ধরে রাখতে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবার একটি সার্বজনীন পদ্ধতি এবং সামাজিক জীবনের মৌলিক ভিত্তি। কিন্তু পরিবার গঠন ও কাজে বিভিন্ন রূপের হয়ে থাকে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের সংগে পরিবারের গঠন ও অন্যান্য অবস্থারও পরিবর্তন হয়।

বর্তমান সমাজে আমরা যেরূপ পরিবারে বাস করি, প্রথম থেকেই সেরূপ পরিবার রয়েছে। সমাজের গোড়াতেই এক পুরুষ ও এক স্ত্রীকে কেন্দ্র করে পরিবার গড়ে উঠেছে। ওয়েস্টার মার্ক এরূপ মতের স্বপক্ষে তথ্য দিয়েছেন প্রাণীজগত থেকে। তার মতে প্রাণীর মধ্যে ঈর্ষার একটি সহজ প্রবৃত্তি রয়েছে; এ ঈর্ষাই বিয়ের মূল কারণ। এক স্ত্রী এবং এক পুরুষের এক

০৫. আল কুর'আন, ২৫:৫৪

০৬. আল কুর'আন, ৪:১

সংগে থাকাটাই প্রাণীজগতের নিয়ম; অতএব মানুষের সমাজেও যে এ রীতিটি গোড়া থেকেই রয়েছে তা এক প্রকার নিঃসন্দেহ।[৭]

বাস্তব প্রেক্ষাপটে, আমরা প্রত্যেকেই কারো না কারোর ওপর দায়িত্বশীল। স্ব স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে সমাজ সমস্যা মুক্ত হতে পারে। পরিবারই হলো মানুষের প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রকৃত শিক্ষালয়। এখানে সে যা শিখবে তাই সারাজীবন প্রতিফলিত হতে থাকবে।

ম্যাক আইভার পরিবারের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন: "The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children."[৮]

অর্থাৎ তিনি বলেছেন মূলত তিনটি কারণে মানুষ পরিবার গঠন করে। ০১. যৌন বাসনা পূরণ ০২. সন্তান জন্ম ও পালন ০৩. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন: "জীব প্রকৃতি ও সমাজ প্রকৃতি এ দ্বৈরাজ্যের শাসনে মানুষ চালিত এবং বিবাহ জিনিসটা সভ্য সমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারের মতোই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সংগে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থাপনা।"[৯] সুতরাং জৈবিক ও সামাজিক এ উভয় প্রকার তাগিদ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পরিবার গঠিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও বলা যায়, একটি সুষ্ঠু পরিবার সুস্থ নাগরিক জীবন গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। বরং বলা যায়, সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের জন্য পরিবারই হচ্ছে প্রথম স্বাভাবিক বীজকেন্দ্র। এর ফলে যদিও একজন নাগরিক পরিবারকেন্দ্রিক এবং সাধারণ সমাজ বিমুখ হয়ে পড়তে পারে; কিন্তু তবুও তার ক্ষতির পরিমাণ পরিবার ধ্বংস করার অনিবার্য পরিণতির তুলনায় নিশ্চয়ই অনেক কম। সত্য বলতে কি মায়ের বাৎসল্যপূর্ণ চুম্বন এবং পিতার স্নেহপূর্ণ সেবাযত্নের পবিত্র পরিবেশেই জন্ম নিতে পারে মানুষের ভবিষ্যৎ সমাজ। নাগরিকত্বের প্রথম শিক্ষা মায়ের ক্রোড়ে আর বাবার স্নেহছায়াতেই হওয়া সম্ভব। যে দেশে পরিবার নেই কিংবা নেই পারিবারিক শৃঙ্খলা পবিত্রতা সেখানকার বংশধর বা ভবিষ্যত সমাজ প্রচণ্ড উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন।[১০]

---

০৭. রেবতি বর্মণ, *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ২৬

০৮. পরিমলভূষণ কর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

০৯. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৯৮

১০. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

পরিবারের ভিত্তি

প্রাচীনকাল থেকে পরিবার দুটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়ে এসেছে। একটি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি-নিহিত স্বভাবজাত প্রবণতা। এ প্রবণতার কারণেই মানুষ চিরকাল পরিবার গঠন করতে ও পারিবারিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং পরিবারহীন জীবনে মানুষ অনুভব করেছে বিরাট শূণ্যতা ও জীবনের চরম অসম্পূর্ণতা। আর দ্বিতীয় ভিত্তিটি হচ্ছে সময় সাময়ীক কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় পরিবার ছিলো বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্র। সমাজ ও জাতি গঠনের জন্য তা-ই ছিলো একমাত্র উপায়। এ কারণে প্রাচীকালের গোত্র ছিলো অধিকতর প্রশস্ত; এতদূর প্রশস্ত যে, নামমাত্র রক্তের সম্পর্কেও বহু ব্যক্তি এক-একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারত। এমনকি বাইরে থেকে যে লোকটিকে পরিবারের মধ্যে শামিল করে নেয়া হতো, তাকেও সকলেই উক্ত উপরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে নিতো। পরিবারের নিজস্ব একান্ত আপন লোকদের জান-মাল ও ইয্যতের যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো, সেই বাইরে থেকে আসা লোকটিরও হেফাযত করা হতো অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে।[১১]

প্রাচীনকালে পরিবার ছিলো একটি রাজনৈতিক দলের মতোই। এজন্য সেকালের রাষ্ট্রনীতির বিস্তারিত রূপ আমরা দেখতে পাই সেকালের এক একটি পরিবার সংস্থার মধ্যে। সেকালের পরিবার অপর কোনো উচ্চতর উদ্দেশ্য পালনের বাহন ছিলো না; বরং পরিবারই ছিলো সেখানে মুখ্যতম প্রতিষ্ঠান। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সেখানে সম্পর্ক স্থাপিত হতো। 'রেহেম' ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে। এর-ই ভিত্তিতে পারিবারিক জীবনে আসতো ভাঙন ও বিচ্ছেদ। যেখানে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তি ছিলো বংশীয় সম্পর্ক। এরূপ অবস্থায় মানুষ নিজেকে রক্ষা করার জন্যে আলো, পানি ও হাওয়ার মতো পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সাথে জড়িত হয়ে থাকতে বাধ্য হবে এটাই স্বাভাবিক। অন্যথায় সে হয় নিজেকে আপন লোকেরই যুলুম-নির্যাতনের তলে নিষ্পিষ্ট করবে অথবা অপর লোকদের দ্বারা হবে সে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং ন্যায়সংগত অধিকার থেকে চির বঞ্চিত।[১২]

পরিবার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথম সিঁড়ি। বিয়ের মাধ্যমে পরিবারের গোড়াপত্তন হয়। নারী ও পুরুষের মাঝে বৈধ পন্থার সম্পর্ক হলো বিয়ে। সুতরাং পরিবার সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বিয়ে। বিয়ে ও পরিবার অঙ্গাআঙ্গীকভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা চিন্তা করা যায় না। অতপর একটি পরিবার বেশ প্রশস্ত ও বিস্তৃত হতে থাকে। একটি পরিবার থেকে জন্ম নেয় অনেকগুলো পরিবার। এভাবে অব্যাহত গতিতে বিস্তার লাভ করে পরিবারের ধারা। আর এ ধারাবাহিকতার পরিণামে জন্ম লাভ করে মানুষের বংশ ও জাতি। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ •

অর্থ: হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে, তারপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে তোমরা পরস্পরের সাথে

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং অবগত।[১৩]

বিয়ে দ্বারাই রচিত হয় পরিবার। আল্লাহ তা'য়ালা নারী ও পুরুষের মধ্যে যে পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন তা চরিতার্থ করার উপায় হচ্ছে বিয়ে। বিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার এক বিশেষ নিয়ামত। বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ তার প্রেম ও ভালোবাসার সঠিক বাস্তবায়ন করতে পার। আর মানব বংশের সুস্থ ও সুষ্ঠ বিকাশ লাভের আল্লাহ প্রদত্ত বিধান হলো বিয়ে। বিয়ের মাধ্যমে নারী পুরুষের একজন আরেকজনের ওপর সুনির্দিষ্ট অধিকার লাভ করে একজনের জন্য অপরজনের ওপর বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়।

বস্তুত এ বিয়ের বন্ধন মানব জগতের উভয়কালীন মানবীয় পবিত্রতা রক্ষার জন্যে বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালারই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সুতরাং বিয়ে যে শুধু পার্থিব জীবনেই গুরুত্বপূর্ণ তা নয় বরং পরলৌকিক জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ।

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ •

অর্থ: তোমরা নিকাহ (বিয়ে) করো না মুশরিক নারীদের যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে। তোমাদের মুগ্ধকারী সম্ভ্রান্ত মুশরিক নারীর চাইতে একজন মুমিন দাসীও অনেক উত্তম। আর মুশরিক পুরুষদের কাছে তোমাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ো না যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে। তোমাদের মুগ্ধকারী সম্ভ্রান্ত মুশরিক পুরুষের চাইতে একজন মুমিন দাসও অনেক উত্তম। তারা (মুশরিকরা) তোমাদের আহবান জানায় আগুনের দিকে। আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের আহবান জানাচ্ছেন জান্নাত আর মাগফিরাতের (ক্ষমার) দিকে। আর তিনি নিজের আয়াত সমূহ মানুষের জন্যে পরিষ্কার করে বয়ান (বর্ণনা) করেন, যাতে করে তারা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে।[১৪]

পুরুষ ও নারীর মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিয়ে হয়, তা মানুষের পিতা হযরত আদম (আ.) এবং আদি মাতা হাওয়ার মধ্যে হয়। কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ •

অর্থ: আর তখন আমরা আদমকে বললাম: হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী বসবাস করো জান্নাতে।[১৫]

এখানে 'তোমার স্ত্রী' শব্দটি উভয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দাম্পত্য সম্পর্কই প্রমাণ করে। যদিও আদম (আ.) এবং হাওয়ার মধ্যে স্থান-কালভেদে অভাবনীয় আবর্তন বিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু সে স্বর্গীয় বিয়ের যোগসূত্র অক্ষত ও অটুট রয়েছে। পৃথিবীতে তাঁদের পূনঃর্মিলন স্থান 'মুজদালিফা' যা আজও বিশেষ ইবাদতের স্থানরূপে সে স্মৃতি বহন করছে। তাঁদের সে পরম

১৩. আল কুর'আন, ৪৯:১৩
১৪. আল কুর'আন, ০২: ২২১
১৫. আল কুর'আন, ০২: ৩৫

মিলন মুহূর্ত হতে আবার সূচিত হয় তাঁদের পার্থিব জীবন অধ্যায়। এটা নতুন মানব জগত গড়ার মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরই সূচনা।[১৬]

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের মহা পরিকল্পনায় আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) দুনিয়ায় এলেন। এখান থেকেই শুরু হয় নারী ও পুরুষের দাম্পত্য জীবন। তাঁদেরই ঔরষজাত সন্তানেরাই এ পৃথিবী সাজিয়েছে। সে সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে বিয়ের রীতি ও পারিবারিক জীবন।

১৬. মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নুমানী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- ডিসেম্বর, ১৯৭৯), পৃ.-০৫

পারিবারিক বন্ধন

মানব জীবনের শান্তি ও সুশৃংখলার জন্যে পরিবার গঠন অপরিহার্য। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে পরিবার একটা বন্ধন হিসেবে কাজ করে। এ বন্ধনের টানেই মানুষ ঘরে ফিরে আসে। পরিবার সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সবার ছায়া হিসেবে কাজ করে। এ পরিবারকে ঘিরেই সবার প্রতিদিনের জীবন যাত্রা। চিন্তা-চেতনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, আনন্দ-অনুপ্রেরণা, আর কর্মস্পৃহার কেন্দ্রবিন্দু পরিবার। পরিবারকে কেন্দ্র করেই সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিকল্পনা উন্নয়ন, মেধা, শ্রম, প্রচেষ্টা ঘুরছে। প্রতিটি শিশুই তার প্রথম জ্ঞান অর্জন করে পরিবার থেকে। একটি শান্তিকামী ও সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনের ব্যাপারে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। একজন মানুষ সুস্থ পারিবারিক জীবনের আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সবসময়ই উম্মতদেরকে কঠোরভাবে উপদেশ দিয়েছেন পারিবারিক বন্ধনকে অটুট রাখার জন্যে। একটি শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহর মূলভিত্তি পরিবারের ওপর ভিত্তি করেই। কারণ, প্রত্যেকটা বিষয় ছোট পরিসরে ভালো হবে তখনই তা বড় পরিসরে ভালো হওয়া সম্ভব। বেশিরভাগ পারিবারিক সমস্যাই হয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকার কারণে। রাসূল (সা.) এর কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাদের সকলেরই মন রক্ষা করেছেন। তিনি যখন ভ্রমনে বের হতেন তখন কোনো না কোনো স্ত্রীকে সাথে করে বের হতেন। এমনকি তিনি যখন যুদ্ধে যেতেন তখনও স্ত্রীদের সাথে নিয়ে যেতেন।

শিশুদের সাবলীলভাবে বেড়ে উঠা নিশ্চিত করতে একটি সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। সুন্দর পারিবারিক পরিবেশের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। পরিবারের মাঝেই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব এবং এটাই একমাত্র উপায়, যেখানে শিক্ষার সুষ্ঠ ধারাকে অব্যাহত রেখে একটি শিশুকে একজন পরিপূর্ণ নাগরিকে রূপদান করা যায়। শিশুর মানসিক সুস্থতার জন্য পারিবারিক সুদৃঢ় বন্ধনের কোনো বিকল্প নেই। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা পেলে মেধার বিকাশ হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাবই একটি শিশুকে বিপথে ঠেলে দেয়। বাবা মায়ের ঝগড়া, মনোমালিন্য, অর্থনৈতিক সমস্যাসহ বহু সমস্যা সন্তানদের মানসিক বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায় যা শিশুর মনে তার পরিবার সম্পর্কে বিরুপ ধারণা জন্ম দেয়, সৃষ্টি করে হতাশা আর বিষন্নতা। পরিবার একটি শিশুকে সমাজের কাছে পরিচিত করে তোলে। পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থান, সামাজিক শ্রেণি, পারিবারিক কাঠামো ইত্যাদি শিশুর আচরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পারিবারিক নিয়ম-শৃংখলা, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে একটি শিশু সমাজে প্রত্যাশিত আচরণ করতে শেখে। নৈতিক মূল্যবোধ ও ন্যায়-অন্যায় বোধটাও শিশু পরিবার থেকেই শিখে।

পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সম্পর্ক যদি চমৎকার ও আন্তরিক হয় তাহলে পরিবারই হবে সুন্দর জীবনের অনুপ্রেরণা এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। মূলত পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণেই মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত। পারিবারিক সুদৃঢ় বন্ধনই সুখ ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ।

২য় পরিচ্ছেদ

আত্মীয়তার বন্ধনঃ রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক

ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধন ছাড়াও সমাজে মানুষের মধ্যে আরেক প্রকার সম্পর্ক গড়ে উঠে। এটাকে আত্মীয়তা বন্ধন (Kinship ties) বলা হয়। এ বন্ধন দুটি সূত্রে গড়ে উঠে। প্রথমটি রক্ত সম্পর্ক, দ্বিতীয়টি বৈবাহিক সম্পর্ক।

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হচ্ছে মা ও বাবার দিক থেকে আত্মীয়। সুতরাং মা, নানী, নানীর মা, দাদী, দাদীর মা এবং তাদের উর্ধ্বস্ত নারীগণ। দাদা, দাদার পিতা, নানা, নানার পিতা এবং তাদের উর্ধ্বস্তন পুরুষগণ। ছেলে, মেয়ে তাদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদের অধঃস্তন ব্যক্তিবর্গ। ভাই, বোন, তাদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদের অধঃস্তন ব্যক্তিবর্গ। চাচা, ফুফু, মামা, খালা এবং তাদের সন্তানগণ এরাও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে রক্তের সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ছিন্ন করার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি এসেছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ •

অর্থ: আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জিহাদে শরিক হয়েছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মীয়রা আল্লাহ্‌র বিধানে একজন অন্যজন অপেক্ষা বেশি হকদার। অবশ্যি আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানী।[১৭]

আত্মীয়তার সম্পর্কই আইনগত অধিকারের ভিত্তির কাজ করবে। এসব সম্পর্কের মাধ্যমে উত্তরাধিকার বণ্টন করা হবে। ইসলামে রক্ত সম্পর্ককে অলঙ্গনীয় হিসেবে দেখা হয়। আত্মীয়তা বা রক্তসম্পর্ক আল্লাহ প্রদত্ত সম্পর্ক। আল্লাহ চান না বান্দা এ সম্পর্কের অমর্যাদা করুক। শরয়ি বিধান অনুযায়ী রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হক বা অধিকার রয়েছে। তাদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব। শরয়ি কারণ ছাড়া সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুর'আনে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের হকের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا •

অর্থ: হে মানুষ! তোমরা সতর্ক হও তোমাদের রবের প্রতি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি আত্মা থেকে। আর তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। অতঃপর তাদের দু'জন থেকে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। তোমরা ভয় করো আল্লাহকে, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা (পরস্পর থেকে) তোমাদের অধিকার দাবি করো। আর সতর্ক হও রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের (অধিকারের) ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধানকারী পাহারাদার।[১৮]

---

১৭. আল কুর'আন, ০৮: ৭৫

১৮. আল কুর'আন, ০৪: ০১

ইসলামে পারিবারিক ব্যবস্থাকে উন্নত ও সুগঠিত করার জন্যে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক বলতে বুঝায় মা ও বাবার দিক থেকে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দেরকে। এদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা জান্নাত প্রবেশের অন্যতম কারণ বলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত যুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১৯]

অন্যত্র বলা হয়েছে: আবু মূসা আশয়ারি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, অভ্যস্থ মদ্যপায়ী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ও যাদুতে বিশ্বাসী।"[২০]

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিময় পারিবারিক জীবন যাপন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রাপ্তির লক্ষ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক যথাযথভাবে অটুট রাখা প্রত্যেক মানুষের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ হচ্ছে স্বজন ও আপনজনদের সার্বিক খোঁজ খবর রাখা ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের হক সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা কুর'আনে বলেন,

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ •

অর্থ: আর আত্মীয়-স্বজনকে তার অধিকার দাও।[২১] আত্মীয়তা সূত্রে যারা আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا •

অর্থ: তোমরা সবাই এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করোনা। পিতা-মাতার প্রতি ইহ্‌সান করো এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ব সাথি, ভ্রমণ পথের সাক্ষাত লাভকারী পথিক এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতিও ইহ্‌সান করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অহংকারী দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।[২২]

সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই উচিত সে যেন তার রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। এ উত্তম ব্যবহার বিভিন্ন পন্থায় হতে পারে। অর্থাৎ আত্মীয়ের প্রয়োজরে প্রেক্ষিতে ধন-সম্পদের মাধ্যমে এবং শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দ্বারা যে কোনো উত্তম পন্থায়।[২৩]

---

১৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, অনু. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল: ১৯৮২), খ. ৩, হাদীস নং-৫৯৮৪

২০. মুসনাদে আহমদ, হাদিস-১৯৫৮৭

২১. আল কুর'আন, ১৭ : ২৬

২২. আল কুর'আন, ০৪: ৩৬

২৩. শাইখ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল উসাইমিন (রহ.), *ইসলামে আত্মীয় স্বজনের অধিকার*, অনু. মো: আবদুল মতিন (ইসলামহাউজ.কম, ১৫ এপ্রিল, ২০১৪), পৃ. ১

নিয়মিত আত্মীয়দের খোঁজ খবর নেয়া, দুঃখের সময় বা নিতান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে আত্মীয়ের অধিকার রক্ষা করা যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও তাদের অধিকার প্রদানে সোচ্চার হওয়া উচিত।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো:

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ •

অর্থ: তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো।[২৪]

তখন নবী (সা.) ডাক দিলেন, হে বনি কা'ব ইবনু লুয়াই, নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো। হে আবদে মানাফ গোত্রীয় লোকজন! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো! হে হাশেম বংশীয়রা, নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো! হে মুহাম্মদ তনয়া ফাতেমা! নিজেকে আগুন হতে রক্ষা করো! নতুবা আমি তোমাকে আল্লাহর কোপানল হতে রক্ষা করতে পারবো না। আমার করার কিছুই থাকবে না। কেবল তোমরা যে আমার রক্তের বন্ধনে বাঁধা। আমি আমার রক্তের হক আদায় করি।[২৫]

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা ঈমানের দাবী। আত্মীয় স্বজনের সংগে করণীয় হলো তাদের নিঃস্বার্থে ভালোবাসা, তাদের সংগে সদ্ব্যবহার করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাদের সংগে সম্পর্কের বিচ্ছেদ না ঘটানো। মানুষের মাঝে ভালোবাসা, দয়া, সহযোগিতার মূল ভিত্তি হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক। এ সম্পর্ক নষ্ট হলে সমাজ বিনষ্ট হবে। নিকটাত্মীয়দের অসাদাচরণ পেয়ে, অসম্মান পেয়ে, বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ পেয়ে বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েও তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। ইহকালীন ও পরকালীন সুখ শান্তির জন্যই আত্মীয়দের সংগে সুসম্পর্ক ও সদ্ভাব বজায় রাখা উচিত। রাসূল (সা.) রক্ত/আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন একাধিক হাদিসে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি: যে লোক রিযিক প্রশস্ত ও আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।[২৬]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা দ্বারা মানুষের হায়াত দরাজ হয়, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য যে অন্য পক্ষ থেকে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তা সে স্থাপন করে। পক্ষান্তরে যার সাথে সম্পর্ক বহাল আছে, তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করলে তা হবে ভালো সম্পর্কের প্রতিদানে ভালো সম্পর্ক রাখে।

যখন আমরা আত্মীয়-কুটুম্ব বলি, তখন নিবিড় সম্বন্ধ-জালে আবদ্ধ একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে নির্দেশ করি। আত্মীয়-কুটুম্বদের মধ্যে যে সম্বন্ধ-জাল গড়ে উঠে তা সামাজিক সম্বন্ধের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি নিবিড় এবং গভীর। এ ধরনের আত্মীয়তা বন্ধন সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। এ কারণে আত্মীয়তা বন্ধনকে সমাজতত্ত্ববিদগণ social grid বলে আখ্যায়িত করেন। পারিবারিক বন্ধনের গন্ডি ছাড়িয়ে সমাজস্থ ব্যক্তিগণ আত্মীয়-কুটুম্বের একটা বৃহত্তর গন্ডির অন্তগর্ত হয় এবং এভাবেই সামাজিক বন্ধনের ভিত তৈরি হয়।[২৭]

---

২৪. আল কুর'আন, ২৬:২১৪

২৫. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অনু. মাওলানা মোজাম্মেল হক, মাওলানা আফলাতুন কায়সার (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার, ২০০২), খ. ১, হাদীস নং-২০৪

২৬. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং-৫৫৫৯

২৭. পরিমলভূষণ কর, *সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ, আগস্ট ২০০১) পৃ. ৩৪২

যেহেতু আত্মীয় স্বজনরা ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ, তাই তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং আদান প্রদান যাতে সুশৃংখল ধারায় গড়ে উঠে সেদিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

বৈবাহিক সম্পর্ক: সমাজের লোকদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া বৈবাহিক সূত্রে আরেক প্রকার সম্পর্ক গড়ে উঠে। স্বামীর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সংগে স্ত্রীর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিবাহের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রথমে বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিবাহ (Marriage, matrimony, wedlock) হলো একটি সামাজিব বন্ধন বা বৈধ চুক্তি, যার মাধ্যমে দু'জন মানুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতিভেদে বিবাহের সংজ্ঞার তারতম্য থাকলেও সাধারণভাবে বিবাহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে দু'জন মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও যৌন সম্পর্ক সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। 'বিবাহ' একটি বৈশ্বিক সার্বজনীন সংস্কৃতি। বিবাহ সাধারণত কোনো রাষ্ট্র, কোনো সংস্থা, কোনো ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, কোনো আদিবাসী গোষ্ঠী, কোনো স্থানীয় সম্প্রদ্রায় অথবা দলগত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা স্বীকৃত হতে পারে। একে একটি চুক্তি হিসেবে দেখা হয়। সাধারণত আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় অথবা ধর্ম নিরপেক্ষ আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করা হয়। বৈবাহিক কার্যক্রম সাধারণত দম্পতির মাঝে সমাজ-স্বীকৃত বা আইনগত দায়িত্ববোধ তৈরি করে এবং এর মাধ্যমে তারা বৈধভাবে স্বেচ্ছায় সন্তান জন্ম দিতে পারে।[২৮]

মূলত বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ একে অপর থেকে উপকৃত হয় এবং আদর্শ পরিবার ও নিরাপদ সমাজ গড়তে একে অপরের সহায়ক হয়। বিবাহ মানব সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। যুগে যুগে প্রতিষ্ঠানটি এর আদি রূপ থেকে বর্তমান কাঠামোয় উপনীত হয়েছে। বিবাহপ্রথাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে প্রধানত ধর্ম। বিয়েসংক্রান্ত সকল নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ হয়েছে ধর্মীয় অনুশাসনে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় ধর্মীয় শাস্ত্রের বিধানই ছিলো সামাজিক আইন, ধর্মীয় আইনের দ্বারাই শাসিত হতো সমাজ-সংসার। ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনের পাশাপাশি লোকজ সংস্কৃতিও বৈবাহিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে নানাভাবে। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই বিয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও শাস্ত্রীয় বিধানে বৈদিক যুগ থেকেই বিবাহ নারী-জীবনের প্রধান প্রাপ্তি ও পরম সার্থকতা বলে বিবেচিত, নারীর জন্যে বিবাহ অপরিহার্য, পুরুষের জন্যে নয়। ঋগ্বেদে বিয়ের সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ আছে।

এ স্মৃতি এবং অর্থশাস্ত্রে আট প্রকারের হিন্দু-বিবাহ পদ্ধতির উল্লেখ আছে। 'ব্রাহ্ম', 'দৈব', 'আর্য', 'প্রজাপত্য', 'অসুর', 'রাক্ষস', 'পৈশাচ' ও 'গান্ধর্ব' এ আট ধরনের বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহই শুধু গ্রহণযোগ্য ছিলো। দায়ভাগ গ্রন্থে জীমূতবাহন উল্লেখ করেছেন যে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য এবং গান্ধর্ব বিবাহ অনিন্দনীয়। ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী নিজ বর্ণের মধ্যে বিবাহ ছিলো সাধারণ নিয়ম। সবর্ণে বিবাহ উৎকৃষ্ট হলেও এ ব্রাহ্মণ পুরুষকে নিজ বর্ণ ছাড়া নিম্নতর তিন বর্ণে বিবাহের অধিকার দিয়েছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং কৌটিল্যের মতে পুত্রপ্রজননই নারীর প্রধান কাজ। শাস্ত্রীয় বিধানমতে আট বছরের মধ্যে কোনো সন্তান প্রসব না করলে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে। আর দশ বছরের মধ্যে স্ত্রী শুধু কন্যাসন্তান প্রসব করলে অথবা বারো বছর পর্যন্ত শুধু মৃত পুত্র প্রসব করলে, স্বামী পুত্রলাভার্থে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে। এুর মতও তাই: 'প্রজনার্থং স্ত্রিয় সৃষ্টা'- প্রজননের জন্যই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি।

২৮. উইকিপিডিয়া: বিবাহ, https://bn.m.wikipedia.org > wiki

প্রকৃতভাবে সব সংস্কৃতিতেই বিয়ের উদ্ভব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নিজস্ব তত্ত্ব আছে। তবে বিবাহ ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা প্রশ্নে তাত্ত্বিকগণ মনে করেন বিবাহ নারীকে মাতা করে আর সন্তানের প্রতি মাতার যতো দায়িত্ব পিতার ততো কখনো মনে করা হয় না।

প্রাচীন বাংলায় একজন স্ত্রী গ্রহণই ছিলো সমাজের সাধারণ প্রত্যাশা, তবে এর ব্যতিক্রমও ছিলো। ইসলাম ধর্মে বিবাহ একটি আইনগত, সামাজিক এবং ধর্মীয় বিধান। ইসলামে বিবাহ বলতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও ধর্মীয়ভাবে নির্ধারিত একটি চুক্তি বোঝায়। এ চুক্তির মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। মুসলিম বিবাহের চুক্তিপত্রে (যা কাবিননামা নামে পরিচিত) উল্লেখ করতে হয় বরের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে প্রদেয় মোহরানার পরিমাণ। স্ত্রীকে দেয়া স্বামীকর্তৃক প্রদত্ত অর্থকে বলা হয় দেনমোহর। তাৎক্ষণিকভাবে দেনমোহর পরিশোধ স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক যদিও স্ত্রী এ দায়িত্ব থেকে স্বামীকে স্বেচ্ছায় মওকুফ করে দিতে পারেন বা পরে গ্রহণ করার অনুমতি দিতে পারেন। মুসলিম আইন অনুসারে দেনমোহর হচ্ছে স্ত্রীর একটি বিশেষ অধিকার। দেনমোহর নির্ধারণ পাত্র-পাত্রীর আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। দেনমোহরের অর্থ স্ত্রী যে কোনো সময়ে দাবি করতে পারে এবং স্বামী তা পরিশোধ করতে বাধ্য। কিন্তু এ বিধান কেবলই একটি আনুষ্ঠানিকতা; স্ত্রী কদাচিৎ দেনমোহর দাবি করে এবং প্রকৃতপক্ষে দেনমোহর এখন বিরল পরিশোধ করা হয়। এটি সামাজিক বিত্তের একটি নিদর্শনে পরিগণিত। মোহরের অংক সাধারণত দুটি ভাগ করা হয়: নগদ ও বাকি। নগদ হিসেবে ঘোষিত অংক সাধারণত বরপক্ষ কর্তৃক উপহার হিসেবে প্রদত্ত স্বর্ণালঙ্কারের মূল্যবাবদ পরিশোধকৃত বলে ধরা হয়। বাকি অংশ পরবর্তীকালে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হলে পরিশোধ করতে হয়। এটা সামাজিক প্রথা।

যৌতুকপ্রথা বিয়ে সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিয়েতে পণপ্রথা হিন্দু ধর্মে একটি স্বীকৃত রীতি। চর্যাপদে বিবাহের সময়ে বরপক্ষকে যৌতুক গ্রহণ করতে দেখা যায়। তাতে মনে হয় পণ প্রথা অনেক প্রাচীন। বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বিবাহ ব্যবস্থায় পণ ও যৌতুক প্রথা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিবর্তিত হয়ে বাস্তবে একই রূপ পরিগ্রহ করেছে। বর্তমানে যৌতুক একটি বড় সামাজিক ব্যাধি।

বাংলার হিন্দু পরিবারগুলির মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিলো। হিন্দু সমাজে ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে মেয়েদের, বাল্যকালে বয়ঃসন্ধির পূর্বেই বিবাহ দেয়াকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হতো। প্রাচীন হিন্দু আইনপ্রণেতা এু নারীর বিয়ের বয়সের যে বিধান দিয়েছেন, তা হলো তিরিশ বছরের পুরুষ বারো বছরের কন্যাকে বিয়ে করবে। চব্বিশ বছরের পুরুষ আট বছরের কন্যাকে বিয়ে করবে, নইলে ধর্ম লঙ্ঘিত হয়। এ আবার বিধান দিয়েছেন, 'কন্যা ঋতুমতী হওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে আত্মীয়স্বজন তার বিয়ে না দিলে, কন্যা নিজের মন মতো পাত্র নির্ধারণ করলে কোনো বাঁধা নেই।'

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ভারতে যে সংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার উল্লেখযোগ্য একটি দিক ছিলো বাল্যবিবাহের বিরোধিতা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। ১৮৭২ সালে হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হলে বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স মেয়েদের ১৪ এবং ছেলেদের ১৮ ধার্য করা হয়। ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে বিয়ের গড় বয়স মেয়েদের ১২ এবং ছেলেদের ১৩ বছর উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিরোধ

আইন (Child Marriage Restraint Act) পাশ হয়। এ আইন অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচের পাত্রী এবং ১৮ বছরের নিচের পাত্রের বিবাহ ছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বহুবিবাহ প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে প্রচলিত ছিলো। জীমূতবাহনের ব্যাখ্যায় এবং প্রাচীন শিলালিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মশাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী ব্রাহ্মণ চার পত্নী, ক্ষত্রিয় তিন পত্নী আর বৈশ্য দুই পত্নী গ্রহণ করতে পারেন। পুরুষের বহুবিবাহ শুধু শাস্ত্রীয় অনুমোদনই লাভ করেনি কার্যক্ষেত্রেও বহু প্রচলিত রীতিতে পরিণত হয়েছিল। আর দাম্পত্য জীবনে প্রাচীনকাল থেকেই নারীর প্রধান অশান্তির কারণ ছিলো গৃহে সপত্নীর অবস্থান। ধর্মের বিধানে রাজারা যতো ইচ্ছে বিয়ে করতে পারতো। শাস্ত্র পুরুষের শত শত বিবাহ সমর্থন করেছে। সে শাস্ত্রের বিধানেই আবার নারীর একাধিক পতিত্ব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের প্রধান প্রবক্তা এু নারীর একপতিত্বের বিধান দিয়েছেন এবং স্বামী দুশ্চরিত্র হলেও স্ত্রীকে সারাজীবন পাতিব্রত্য পালন করতে বলেছেন। পতিপরায়ণতা সাধ্বী স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম। দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথা ধীরে ধীরে তার ধর্মীয় লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এক ধরনের বিবাহ-ব্যবসায়ে পরিণত হয়। হিন্দুধর্মীয় কুলীন পুরুষের বহু স্ত্রী রাখার ব্যবস্থা ছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এ প্রথা ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধির আকার ধারণ করে। উনিশ শতকে কুলীন ব্যবসায়ীরা বিবাহের জন্য এককালীন পণ এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপলক্ষে অর্থলাভের আশা করতেন। 'কুলমর্যাদা' অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অর্থগ্রহণ না করে এঁরা শ্বশুরবাড়িতে গমন করে উপবেশন, স্নান ও আহার কিছুই করতেন না, এমনকি স্ত্রীর সঙ্গে আলাপও করতেন না। দীর্ঘদিন পরে কুলীন জামাতা বেড়াতে এলে শ্বশুরশাশুড়ি এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন তাই তাকে খুশী করার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। এমনকি অনেকে রাতে শোবার আগে শুভ সাক্ষাত উপলক্ষে জামাতা স্ত্রীর নিকট অর্থ দাবী করতেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে, যেমন চন্ডীমঙ্গলে, মুসলমানদের নিকাহ বিবাহের কথা বলা হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, এমনকি বিশ শতকেও মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহ ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিলো। উচ্চশ্রেণির অবস্থাপন্ন মুসলমানদের একাধিক স্ত্রী থাকত। বিশ শতকের শুরুতে কুলীনদের বাইরে হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ তেমন প্রচলিত ছিলো না।

ব্রিটিশ শাসন আমলে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রশ্রেণি পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বহুবিবাহের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে। কালক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বহুবিবাহ বিরল হয়ে পড়ে এবং শিক্ষিত শ্রেণিতে এক বিবাহ দাম্পত্য আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, ধনী মুসলমান পরিবার ছাড়া সকল পরিবারে দ্বিতীয় স্ত্রী বিরল। ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ একটি মাইলফলক। এতে পুরুষের বহুবিবাহের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা প্রয়াস ছিলো। পারিবারিক আইনে যখন দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি প্রয়োজন হয় তখন থেকে দ্বিতীয় বিয়ের হার আরও কমতে থাকে। বর্তমানে বহুবিবাহ নিম্নশ্রেণি ছাড়া উচ্চ শ্রেণিতে খুবই বিরল দেখা যায়।

হিন্দুবিবাহ একটি ধর্মীয় আচারিক বা আধ্যাত্মিক বিষয় এবং এ জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক লিখিত দলিলের প্রয়োজন হয় না। হিন্দু পরিবারে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা কয়েকদিন ধরে চলে। ভবদেবের মতে, বিবাহের আচারাদি শুরু হয় জ্ঞাতিকর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পিতার দিক থেকে কনের রক্তসম্পর্কীয়া আত্মীয়ারা বিবাহের প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। আট প্রকার বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহই হিন্দুদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলো। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে বর্ণিত বিবাহের মাঙ্গলিক আচরণগুলি আজও পালিত হয়। বিবাহকর্ম আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি ছিলো: শুভদৃষ্টি, মাল্যদান, মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞসম্পাদন,

কন্যাদান, পাণিগ্রহণ, অগ্নিপ্রদক্ষিণ, সপ্তপদীগমন এবং স্বস্তিবচন। হিন্দু সমাজে পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠী বিচার করে দেখার রীতি আছে। পাত্র-পাত্রীর অন্য কোনো বিষয়ে আপত্তি না থাকলেও কোষ্ঠী বিচারে যোটক না মিললে বিবাহের আর অগ্রগতি হয় না। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে মুসলিম সমাজেও পূর্বে কোষ্ঠী বিচার করে ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয়ার রেওয়াজ ছিলো। হিন্দু সমাজে বিয়ের আগে কথা পাকাপাকি করার অনুষ্ঠানকে 'আশীর্বাদ' বলে। পাত্র-পাত্রী পছন্দ হলে সোনার আংটি বা টাকা দিয়ে পাকা কথা হয়ে থাকে। নতুন পাটি, নতুন খাতা, কলম দিয়ে পুরোহিতের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের কর্তা ব্যক্তিরা বিয়ের কথা চূড়ান্ত করেন। এটাকে অনেকে 'পাটিপত্র' বা 'মঙ্গলাচরণ' বলে থাকেন। এতে উল্লেখিত থাকতো বিয়ের দিন-ক্ষণ-লগ্ন এবং দেনা-পাওনার কথাও। বিয়ের আগের দিনকে বলা হয় 'অধিবাস' ঐ দিন বর-কনেকে পূজা করতে হয় এবং মধ্যরাতে নতুন কাপড়, গহনা পরে পাঁচ পদ দিয়ে খাবার খেতে হয়। বর-কনে উভয়ের বাড়িতেই অধিবাসের দিন একই আয়োজন হয়ে থাকে। বিয়ের দিন সাধারণত নির্ধারিত হয়ে থাকে পঞ্জিকা-অনুসারে শুভলগ্ন দেখে এবং পাত্র-পাত্রীর জন্মকোষ্ঠী বিচার করে। বিয়ের দিন বর-কনেকে গিলা, চন্দন, কাঁচা হলুদ, কাঁচা দুধ, ঘি, মধু এবং পুকুরের জল দিয়ে স্নান করানো হয়। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বর ও কনে উভয়কেই না খেয়ে থাকতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মধ্যরাতের পর কন্যাদান সম্পন্ন হয়। বিয়ের পরদিন থাকে বাসিবিবাহ, এদিন নানা আনুষ্ঠানিকতা চলতে থাকে। বাসিবিবাহের দিন উভয়কে পুরোহিত আবার মন্ত্র পড়ান এবং ঐ দিন প্রথা-অনুযায়ী নানা আনুষ্ঠানিকতা চলতে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ছোট পুকুরের মতো কেটে তাতে পানি বা দুধ দিয়ে গোলাপ পাপড়ি ভাসিয়ে আংটি লুকোচুরির খেলা। তার পরের দিনে চলে স্ত্রীর রান্না করা খাবার গ্রহণ, যা সাধারণত বৌভাত বলে পরিচিত। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় হিন্দুসমাজে 'পুনর্বিবাহ' বলে আরেকটি আনুষ্ঠানিকতা প্রচলিত ছিলো। অর্থাৎ যদি বিবাহের পূর্বে কনের ঋতুস্রাব না হয়ে থাকে তাহলে বিবাহোত্তর প্রথম ঋতুস্রাবের পরে পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

উনিশ শতকের পরিবারে দাম্পত্যজীবনে পুরুষের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। পিতৃতন্ত্র দাম্পত্যজীবনের জন্য কতগুলি বিধিনিষেধ নির্ধারণ করে দেয়– যেমন, স্বামী হচ্ছে ইহজগতের প্রভু ও দেবতা, তাঁর প্রতি স্ত্রীর প্রশ্নাতীত ভক্তি প্রদর্শন করতে হবে ইত্যাদি। সনাতন বিয়ে দুটি ব্যক্তির মধ্যেই নয় শুধু, এর পারিবারিক গুরুত্ব ছিলো স্বামী-স্ত্রীর পরিবারের মধ্যে পরিব্যপ্ত। একটি মেয়েকে শুধু স্বামীকেই তৃপ্ত করা যথেষ্ট ছিলো না, পরিবারের সবাইকেই তুষ্ট করতে হত। নারীর দায়িত্ব ছিলো পরিবারের সবাইকে খুশি করা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে একটি নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও ইংরেজি শিক্ষা এবং ব্রাহ্মধর্মের বিকাশের সঙ্গে একটি নতুন নীতি-আদর্শ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নতুন শিক্ষা ও ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির মানসিক জগতে এক পরিবর্তনও সূচনা হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে এক নতুন পবিত্রতা ও ঔচিত্যবোধের দ্বারা উদ্বধিত হয়েছিলেন। যার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পারিবারিক মূল্যবোধ ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকাশের সাথে সাথে শুরু হয় পরিবার, বিবাহ ব্যবস্থা এবং নারী পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রক্রিয়া। এর সাথে যুক্ত হয় নৈতিকতাবোধ। তত্ত্বগতভাবে ইসলামি শরিয়ত আইনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কেউ দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে স্বেচ্ছায় বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত পারস্পরিক

দায় অধিকার সংজ্ঞায়িত হয়েছে যার ফলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে অনেক দায় ও অধিকার আইনী-ভিত্তি লাভ করেছে।[২৯]

২৯. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা পিডিয়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), অধ্যায়- বিবাহ

৩য় পরিচ্ছেদ

বিয়ে ও বিয়ের গুরুত্ব

ইসলামে বিবাহ হলো বিবাহযোগ্য দুইজন নারী ও পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রনয়ণের বৈধ আইনি চুক্তি ও তার স্বীকারোক্তি। একটি আনুষ্ঠানিক এবং দৃঢ় বৈবাহিক চুক্তিকে ইসলামে বিবাহ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা বর ও কনের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা নির্ধারণ করে। ইসলামে কনে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিয়েতে মত বা অমত দিতে পারে।

বিবাহের সংজ্ঞা: বিবাহের আরবী হলো نِكَاح -এর অর্থ মিলানো এবং অনুপ্রবেশ। শরীয়তের পরিভাষায়,

عقد بين الزوجين يحل به الوطء.

অর্থ: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার এমন চুক্তি যার দ্বারা শারীরিক সম্পর্ক হালাল হয়।[৩০]

বিবাহ সম্পর্কে আল্লাহ কুর'আনে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে:

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا •

অর্থ: আর তোমরা যদি আশংকা করো, এতিম-মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে যেসব নারীদের তোমরা পছন্দ করো, তাদের মধ্য থেকে বিয়ে করে নাও দুই, তিন, বা চারজনকে। কিন্তু, যদি আশংকা করো (একাধিক বিয়ে করলে) স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারবেনা, সে ক্ষেত্রে একটি বিয়ে করো, অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত মেয়ে। বেইনসাফি থেকে বাঁচার জন্যে এ ব্যবস্থাই অধিকতর সঠিক।[৩১]

বিবাহের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ •

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করিম সা.-এর সাথে অনেক যুবক ছিলাম। আমাদের সহায় সম্পদ কিছুই ছিলনা। তখন রসূলুল্লাহ সা. বলেন: তোমাদের মধ্যে যারাই বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে দৃষ্টিকে আনত রাখার এবং যৌন জীবনকে সুরক্ষিত রাখার সর্বোত্তম উপায়। আর যাদের বিয়ে করার (এখনো) সামর্থ্য হয়নি তারা যেন রোযা রাখে। কারণ, রোযা তাদের জন্যে খোজা হয়ে থাকার সমতুল্য।[৩২]

---

৩০. ইবন হাজার আসকালানী, বুলুগুল সারাম, *কিতাবুন নিকাহ* (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৯৯), পৃ. ৩০২

৩১. আল কুর'আন, ৪:৩

৩২. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস* (ঢাকা: বর্ণালি বুক সেন্টার, সেপ্টেম্বর ২০১৯), পৃ. ৩৪৯, হাদীস নং-৫২০

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ •

অর্থ: আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে কেউ পুত পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাথে মোলাকাত করতে চায়, সে যেন স্বাধীন (দাসী নয়) মেয়েদের বিয়ে করে।[৩৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيْمَانِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْ •

অর্থ: আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: কোনো ব্যক্তি যখন বিয়ে করলো, সে তার ঈমানের অর্ধেক পূর্ণ করলো। সে বাকি অর্ধেকের পূর্ণতায় আল্লাহকে ভয় করে কাজ করবে।[৩৪]

ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে বিয়েই হচ্ছে একমাত্র বৈধ উপায়, একমাত্র বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা। বিয়ে ছাড়া অন্য কোনো ভাবে- অন্য পথে- নারী-পুরুষের মিলন ও সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিয়ে হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মাঝে সামাজিক পরিবেশে ও সমর্থনে শরীয়ত মুতাবেক অনুষ্ঠিত এমন এক সম্পর্ক স্থাপন, যার ফলে দুজনের ওপর অধিকার আরোপিত হয় এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত এ বিয়েই হচ্ছে ইসলামী সমাজে পরিবার গঠনের প্রথম প্রস্তর। একজন পুরুষ ও এক বা একাধিক স্ত্রী যখন বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস ও স্থায়ী যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত করে, তখনই একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়, হয় পারিবারিক জীবন যাপনের শুভ সূচনা।[৩৫]

কুর'আন মাজীদে এ বিয়ে ও স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থাকে নবী ও রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার এক বিশেষ দান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً •

অর্থ: তোমার আগেও আমরা বহু রসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরও দিয়েছিলাম স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি।[৩৬]

আল কুর'আনে বয়স্ক ছেলেমেয়ে ও দাস-দাসীদের বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায়:

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ •

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী নেই এবং যাদের স্ত্রী নেই, তাদের বিয়ে দিয়ে দাও, আর তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও।[৩৭]

---

৩৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২২

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০, হাদীস নং-৫২৩

৩৫. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১০), পৃ. ৮১

৩৬. আল কুর'আন, ১৩: ৩৮

মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.) বলেন, আমি জনৈক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব করলাম। রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, 'তুমি কি তাকে দেখেছো?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা এতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা জন্মাবে।[৩৮]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ •

অর্থ: জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন কোনো নারীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, তখন সম্ভব হলে সে যেন পাত্রীর এমন কিছু দিক দেখে নেয়, যা তাকে বিয়ের প্রতি আকৃষ্ট করবে।[৩৯]

একটি আনুষ্ঠানিক এবং দৃঢ় বৈবাহিক চুক্তিকে ইসলামে বিবাহ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা বর ও কনের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা নির্ধারণ করে। বিয়েতে অবশ্যই দু'জন মুসলিম সাক্ষী উপস্থিত থাকতে হবে। ইসলামে বিবাহ হলো একটি সুন্নত এবং ঈমানের পূর্ণতার সহায়ক। আদর্শ পরিবার গঠন, মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং মানসিক প্রশান্তি লাভের প্রধান উপকরণ হচ্ছে বিবাহ। যা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা। এ চাহিদা পূরণের জন্যই ইসলামি শরীয়ত বিয়ের গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিবাহ মানুষের জীবনকে পরিশীলিত, মার্জিত এবং পবিত্র করে তোলে।

মহান আল্লাহ আল কুর'আনে বলেন:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ •

অর্থ: তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।[৪০]

এ আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। প্রাপ্ত বয়স্ক ও সামর্থ্যবান হলে কালবিলম্ব না করে বিয়ে করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। বিয়ে শুধু জৈবিক চাহিদাই নয়, বরং একটি মহান ইবাদতও বটে। বিয়ে দ্বারা ইহ ও পরকালীন কল্যাণ সাধিত হয়। বিয়ে মানুষের জীবনকে পরিশীলিত, মার্জিত এবং পবিত্র করে তোলে। আদর্শ পরিবার গঠন, জৈবিক চাহিদা পূরণ, মানসিক প্রশান্তি এবং মানব বংশ বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম হলো বিয়ে।

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া তামীমি (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সংগে ছিলাম। এ সময় উসমান ইবনু আফ্ফান (রা.) এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তখন তিনি তাঁর সংগে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। উসমান (রা.) তাঁকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমরা কি আপনার সংগে এমন একটি যুবতী মেয়ের বিয়ে দেব না, যে হয়তো আপনার অতীতের কিছু স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিবে? রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বললেন, আপনি যদি এ কথা বলেন তবে রাসূল (সা.) আমাদের বলেছেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ

---

৩৭. আল কুর'আন, ২৪: ৩২

৩৮. এম, আফলাতুন কায়সার, *মিশকাত শরীফ* (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৩), হাদীস নং-৩০১৭

৩৯. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১, হাদীস নং-৫২৯

৪০. আল কুর'আন, ২: ১৮৭

করে। কারণ তা (বিবাহ) দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত করে। আর যে সক্ষম নয় তার সিয়াম পালন করা উচিত। কারণ তা তার জন্য যৌন কামনা দানকারী।[৪১]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ •

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী নেই এবং যাদের স্ত্রী নেই, তাদের বিয়ে দিয়ে দাও, আর তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তারা যদি অভাবী হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ্ উদার, জ্ঞানী।[৪২]

এখানে বক্তব্য হচ্ছে, লোকেরা যেন বিয়ের ব্যাপারে খুব বেশি হিসেবী না হয়। মেয়ে পক্ষকেও বলা হচ্ছে তারা যেন শুধু দারিদ্র্যতার জন্য প্রস্তাব না প্রত্যাখ্যান করে। আর যুবকদেরকে বলা হচ্ছে বেশি সচ্ছলতার অপেক্ষায় বিয়ে দেরি না করে। সামান্য আয় হলেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিয়ে করা উচিত।

এখানে বিয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্যে। কারণ বর্তমানে খারাপ অবস্থা থাকলেও ভবিষ্যতে তা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে ভালো অবস্থায়। কাজেই মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসেবী হওয়া উচিত নয়। ইসলামে বৈরাগ্যতা নেই। বৈরাগ্য জীবন যাপন করাকে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। বিয়ের মাধ্যমে দেহ ও মন সুস্থ থাকে। মানসিক প্রশান্তি আসে।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী (সা.) কে 'ইবাদত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য নবী (সা.)-এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসলো। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করলো এবং বললো নবী (সা.)-এর সংগে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য হতে একজন বললো, আমি সারাজীবন রাতভর- সালাত আদায় করতে থাকবো। অপর একজন বললো, আমি নারী সংস্পর্শ ত্যাগ করবো, কখনও বিয়ে করবো না। এরপর রাসূল (সা.) তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ঐসব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছো? আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্কে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি, এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি সওম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও মেয়েদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।"[৪৩]

এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে যে প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে উপেক্ষা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া যাবে না। তাই রাসূল (সা.) আমাদেরকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যাতে আমরা মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করলে দুর্ভোগ ও বিপর্যয় আসবে। যে কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রেই আবেগ তাড়িত হয়ে আমলের

৪১. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, অ. ১৭, হাদীস নং-৩২৬৯

৪২. আল কুর'আন, ২৪: ৩২

৪৩. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং-৫০৬৩

পরিবর্তন করা যাবে না। কেউ যদি সার্বিক দিক দিয়ে সামর্থ্য হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের (সা.) সুন্নাতের প্রতি অনীহা পোষণ করে, তাহলে সে রাসূল (সা.)-এর তরিকা থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। পরিবার গঠন, সংরক্ষণ ও বংশ বিস্তারের জন্য বিয়ে ছাড়া আর কোনো বিধি সম্মত পথ নেই। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন পবিত্র ও কলুষমুক্ত হয়ে নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হতে পারে।

ইসলাম মানবতাবোধ ও চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। তাই বৃহত্তর পরিমন্ডল সৃষ্টি ও সংকীর্ণতা দূর করা এবং মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য তৈরির লক্ষ্যে বিশেষ কিছু বিধান দেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একান্ত আপনজনদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল কুর'আনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۫ وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا •

অর্থ: তোমাদের জন্যে (বিয়ে করা) হারাম করা হলো: তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধ-মা, দুধ বোন, শাশুড়ী। আর তোমাদের স্ত্রীদের যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো তাদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। তবে যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করোনি (অর্থাৎ সহবাস করার পূর্বেই যাদের তালাক দিয়েছো) তাদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করতে বাধা নেই। এছাড়া তোমাদের জন্যে হারাম তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের (তালাক দেয়া) স্ত্রী। হারাম দুই বোনকে একত্রে বিবাহাধীন করা, তবে পূর্বে (জাহেলি যুগে) যা হবার হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান।[৪৪]

যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম বা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ তাদের বলা হয় মাহরাম। রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন সব সময় আপন। তাই একান্ত আপনজনদের সাথে বিবাহবন্ধন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিয়েতে কুফুকে গুরুত্ব দিতে হবে। 'কুফু' মানে اَلْمُسَاوَاةُ وَالْمُمَاثَلَةُ সমতা ও সাদৃশ্য। অন্য কথায়, বর ও কনের 'সমান-সমান হওয়া', একের সাথে অপরজনের সামঞ্জস্য হওয়া। বিয়ের উদ্দেশ্য যখন স্বামী-স্ত্রীর মনের প্রশান্তি লাভ, উভয়ের সতীত্ব ও পরিবত্রতা রক্ষা, তখন উভয়ের মধ্যে যাতে করে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায়, যেন এ মিলমিশ লাভের পথে বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টির সামান্যতম কারণও না ঘটতে পারে, তার ব্যবস্থা করা একান্তই কর্তব্য। কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে:

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا •

৪৪. আল কুর'আন, ৪:২৩

অর্থ: তিনিই সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে মানুষ, তারপর তাদের মাঝে বংশীয় এবং বৈবাহিক বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন। জেনে রাখো, তোমার প্রভু শক্তিমান।[৪৫]

এ আয়াতটির মানে হলো বংশ ও শ্বশুর-জামাতার সম্পর্ক এমন জিনিস, যার সাথে 'কুফু'র ব্যাপারটি সম্পর্কি। 'কুফু'র হিসেব হবে দ্বীনদারীর দৃষ্টিতে। আল কুর'আনে বলা হয়েছে:

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ •

অর্থ: জিনাকারী বিয়ে করে না কোনো জিনাকারিনী কিংবা মুশরিক নারী ছাড়া। আর কোনো জিনাকারিনীও বিয়ে করেনা কোনো জিনাকারী কিংবা মুশরিক ছাড়া। এটা হারাম করে দেয়া হলো মুমিনদের জন্যে।[৪৬]

কনে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জরুরী গুণাবলী সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশনা সম্পর্কিত হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ •

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: পুরো দুনিয়াটাই সম্পদ, আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো সতী-সাধ্বী পুণ্যবতী নারী (স্ত্রী)।[৪৭]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: সাধারণত চারটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রেখে মেয়েদের বিয়ে করা হয়: ১. তার অর্থ সম্পদের প্রতি দৃষ্টি রেখে। ২. তার বংশ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে, ৩. তার রূপ সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং ৪. তার দীনদারির প্রতি দৃষ্টি রেখে। তুমি দীনদার মেয়েদের অগ্রাধিকার দাও, তোমার হাত ধুলোমলিন হোক![৪৮]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যখন তোমাদের কাছে এমন কেউ বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়, যার দীন ও আখলাক সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তখন তার কাছে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তা না করো, তখন জমিনে ফিতনা এবং ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।[৪৯]

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ

৪৫. আল কুর'আন, ২৫:৫৪
৪৬. আল কুর'আন, ২৪:৩
৪৭. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০, হাদীস নং-৫২৪
৪৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২৫
৪৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২৬

خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ •

অর্থ: আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করিম সা.-কে বলতে শুনেছেন: একজন মুমিন তাকওয়া অর্জনের পর পুণ্যবতী স্ত্রীর চাইতে অধিক কল্যাণকর অন্য কিছুই লাভ করতে পারেনা। অর্থাৎ এমন স্ত্রী, ১. যাকে আদেশ করা হলে (আনন্দের সাথে) তা পালন করে, ২. তার দিকে তাকালে সে তাকে আনন্দিত করে তোলে, ৩. যদি তাকে নিয়ে কোনো শপথ করে সে তা নিষ্ঠার সাথে পূর্ণ করে, ৪. স্বামী বাইরে গেলে সে তার নিজের বিষয়ে এবং স্বামীর অর্থ সম্পদের বিষয়ে স্বামীর কল্যাণ কামনা করে (কোনো প্রকার খেয়ানত করেনা)।[৫০]

দ্বীনদার ও ধার্মিক কনেকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত, অন্য কথায় বিয়ের জন্য চেষ্টা চালানো পর্যায়ে কনের খোঁজ-খবর নেয়ার সময় রাসূলে কারীম (সা.)-এর নির্দেশ হলো, কেবল দ্বীনদার কনেই তালাশ করবে। বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে কনে সম্পর্কে প্রথম জানবার বিষয় হলো কনের দ্বীনদারীর ব্যাপার। অন্যান্য গুণ কি আছে তার খোঁজ পরে নিলেও চলবে অর্থাৎ কনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে তার দ্বীনদার হওয়া। ধনী, সদ্বংশজাত ও সুন্দরী রুপসী হওয়াও কনের বিশেষ গুণ বটে; এবং এর যে কোনো একটি গুণ থাকলেই একজন মেয়েকে স্ত্রীরূপে বরণ করে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এসব গুণ মুখ্য ও প্রধান নয়- গৌণ। রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী কেবল ধন-সম্পত্তি, বংশ-মর্যাদা ও রূপ-সৌন্দর্যের কারণেই একটি মেয়েকে বিয়ে করা উচিত নয়। সব চাইতে বেশি মূল্যবান ও অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য গুণ হচ্ছে কনের দ্বীনদারী। বস্তুত রূপ-সৌন্দর্য ও ধন-মাল যেমন স্থায়ী নয়, তেমনি দাম্পত্য জীবনের স্থায়ীত্ব দানে তার ক্রিয়া গভীর ও সুদূরপ্রসারীও নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে এ রূপ-সৌন্দর্য ও ধন-মাল পারিবারিক জীবনে অনেক তিক্ততা ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে থাকে, করতে পারে।

ইসলাম নির্বিশেষে সকল স্ত্রী-পুরুষকেই বিধিসঙ্গত নিয়মে ও শরীয়তসম্মত পন্থায় বিয়ে করার জন্য উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু অনেক সময় যুবক-যুবতীগণ কেবলমাত্র দারিদ্র কিংবা অর্থাভাবের কারণে বিয়ে করতে প্রস্তুত হতে চায় না। তারা মনে করে, বিয়ে করলে আর্থিক দায়িত্ব বেড়ে যাবে, সেই অনুপাতে রোজগার না হলে সে দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অথবা বিয়ে করলে যে আর্থিক দায়িত্ব বাড়বে, তদ্দরুন জীবন মান নিচু হয়ে যাবে।

এসব কারণে তারা বিয়েকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এ মনোভাব-চিন্তার এই ধারা ও প্রকৃতি- আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। একে তো মানুষের রুজি-রোজগারের পরিমাণ কোনো স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় জিনিস নয়। যে আল্লাহ আজ একজনকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন, সে আল্লাহই আগামীকাল তাকে একশত বা এক হাজার টাকা দিতে পারেন। তাই অর্থাভাব যেন কখনোই বিয়ের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে, সে জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই ঘোষণা করেছেন:

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ •

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১, হাদীস নং-৫২৮

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী নেই এবং যাদের স্ত্রী নেই, তাদের বিয়ে দিয়ে দাও, আর তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তারা যদি অভাবী হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ্ উদার, জ্ঞানী।[৫১]

বিয়ের প্রস্তাব আসা ছেলে বা মেয়ের পারস্পরিক বিয়ের পথ দারিদ্র যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কেননা আল্লাহর মেহেরবানীতে রয়েছে অর্থবিমুখতা। এ জন্য যে, আল্লাহ সকাল-সন্ধ্যা যাকে চান অভাবিতপূর্ব উপায়ে রিযিক দান করেন। কিংবা এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াদা করেছেন (দারিদ্রকে) ধনী করে দেয়ার। অবশ্য তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন- আল্লাহর ইচ্ছার শর্তাধীন।[৫২]

ইসলাম হলো মানব কল্যাণের ধর্ম। মানুষের জাগতিক ও পরলৌকিক কল্যাণই ইসলামের উদ্দেশ্য। মানুষের সব প্রাকৃতিক ও সামাজিক চাহিদা সহজ, সুন্দর ও মার্জিত উপায়ে পূরণ করাই ইসলামী শরীয়তের বিধান। বিয়ের মাধ্যমে আদর্শ পরিবার গঠন ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়। এটি চারিত্রিক অবক্ষয় রোধের অনুপম হাতিয়ার।

৫১. আল কুর'আন, ২৪:৩২

৫২. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০, ১০১, ১০৩

বৈবাহিক সম্পর্কীয় আত্মীয়

বৈবাহিক সম্পর্কীয় আত্মীয় বলতে বুঝায় বিয়ের মাধ্যমে যাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। যেমন: শশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকা, দেবর, ননদ, ভাসুর ইত্যাদি।

রাসূল (সা.) বলেন: "নিশ্চয়ই তোমরা অচিরেই মিশর জয় করবে। সেটা এমন একটি ভূমি যেখানে দীনার-দিরহামের প্রাচুর্য রয়েছে। যখন তোমরা সেটা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা তাদের জ্ঞাতি সম্পর্ক রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।"[৫৩]

অর্থাৎ ইসমাঈল (আ.) এর মাতা হাজেরার দিক থেকে বংশীয় বা রক্ত সম্পর্ক এবং রাসূল পত্নী মারিয়া কিবতিয়ার দিক দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক। নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে মানুষের বংশ ধারা। আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে একে অপরের সাথে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیْرًا ۝

অর্থ: তিনিই সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে মানুষ, তারপর তাদের মাঝে বংশীয় এবং বৈবাহিক বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন। জেনে রাখো, তোমার প্রভু শক্তিমান।[৫৪]

মহান আল্লাহ মানুষের একটি নয় বরং দুটি আলাদা আলাদা নমুনা নর ও নারী তৈরি করেছেন। তারা মানবিক গুণাবলীর দিক দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত হলেও দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। তিনি এ জোড়াগুলো মিলিয়ে ভারসাম্য সহকারে দুনিয়ায় পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। তাদের থেকে একদিকে পুত্র ও নাতিদের একটি ধারা চলছে। তারা অন্যের ঘর থেকে বিয়ে করে স্ত্রী নিয়ে আসছে। আবার অন্যদিকে কন্যা ও নাতনীদের একটি ধারা চলছে। তারা স্ত্রী হয়ে অন্যের ঘরে চলে যাচ্ছে। এভাবে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবার মিশে সারা দেশ এক বংশ ও এক সভ্যতা- সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাচ্ছে।[৫৫]

এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে পরিবারের। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অতপর একজনের সান্নিধ্য আরেকজনের জন্য পরমশান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাজনক করে দিয়েছেন। তাদের উভয়ের বৈধ মিলনকে কেন্দ্র করেই সূত্রপাত হয়েছে পরিবারের। এ থেকেই জন্ম লাভ করেছে তাদের বংশধারা, সৃষ্টি হয়েছে আত্মীয়তা।

---

৫৩. এম. আফলাতুন কায়সার, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৯১৬

৫৪. আল কুর'আন, ২৫:৫৪

৫৫. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা*, সম্পাদনা: আব্দুস শহীদ নাসিম (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, আগস্ট ২০০৮), খ. ১০, পৃ. ৩৬

৪র্থ পরিচ্ছেদ

সমাজ কাঠামোর মৌলিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

মানুষের সামগ্রিক রূপটি সমাজ নামে পরিচিত। সমাজ হলো একটি দেহের মতো এবং সমাজের মানুষগুলো এ সমাজ দেহের এক একেকটি অংগ। মানব দেহের অংগ -প্রতংগগুলো পরস্পর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হলে যেমন দেহ ও অংগ দুটোই অকার্যকর হয়ে যাবে, তেমনি সমাজ দেহের অংগগুলোও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে মানুষগুলোও মানুষের মর্যাদায় থাকতে পারে না। সমাজও প্রকৃত সমাজ নামে অবিহিত হওয়ার যোগ্য থাকে না। সমাজের আদর্শ রূপ হবে মানব দেহেরই অনুরূপ। অর্থাৎ দেহের যেমন একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গকে নির্দেশ দেয়া হয়, সিদ্ধান্ত জানানো হয়, প্রয়োজন পূরণ করা হয়, অভাব-অভিযোগ দ্রুত শোনানো হয়, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো সুন্দরভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে আবার যার যার জায়গায় স্বাধীনও বটে আবার অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলোর পরস্পরের মাঝে একটি সুন্দর আদান-প্রদান আছে। তেমনি মানুষের সমাজ পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা থাকতে হবে, যার কাজ হবে সমাজের সমষ্টির ও ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করা। আবার ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা সে সমষ্টির এবং অন্য ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতার পরিপন্থী না হয়। এখানে সমাজ ব্যক্তিদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। ব্যক্তিরা যুগপৎভাবে সমাজের প্রতি এবং পরস্পর একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ এমনি একটা পরিবেশ, এমনি একটি সামাজিক কাঠামোতে সম্ভব হতে পারে।

মানুষ সামাজিক জীব। সঙ্গ প্রিয়তা, জীবিকার সংস্থান ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে মানুষকে সমাজবদ্ধ হতে হয়। সমাজ মানবীয় সংগঠনের একটি সাধারণ রূপ। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সকল ধরনের কাজকর্মই সমাজের আওতাভুক্ত। একজন মানুষ বিভিন্নভাবে অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্কিত। সমাজ মানুষের এ সম্পর্কেরই বাস্তব রূপ। একজন মানুষকে নিয়ে সমাজ তৈরি হতে পারে না। আমার সমাজে কতজন মানুষ থাকবে তারও কোনো সীমারেখা নেই। তবে সমাজে দু'টি জিনিস থাকা আবশ্যক। প্রথমত, পরস্পর সম্পর্কিত মানবগোষ্ঠী এবং দ্বিতীয়ত, এ সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা। সমাজে মানুষের মধ্যে নানাবিধ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, শিক্ষক-ছাত্র, রাজা-প্রজা প্রভৃতি সম্পর্কের জালে সমাজ আবদ্ধ। সমাজে মানুষ জন্ম নেয়া মাত্রই বিভিন্ন রকমের সম্পর্কের জালে জড়িয়ে যায়। এ সম্পর্ক সমাজকে টিকে থাকতে সহায়তা করে। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো ভোগ করা, নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করা, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা। এগুলো সমাজকে স্থায়িত্ব দিয়েছে। সমাজের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। সমাজের শুধু সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বিদ্যমান নয়, পাশাপাশি বিরোধ, অসহযোগিতা ও অনৈক্যও রয়েছে। মানব জীবনের বিচিত্র রূপ দেখা যায় সমাজে। তবে সমাজের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা গড়ে তোলা সুন্দর সমাজ জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

সমাজ হচ্ছে অনেক মানুষের সমন্বয়, যেখানে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান। শুধু কতিপয় মানুষ একত্রিত হওয়াকেই সমাজ বলে না। বরং যেসব উপাদান একটি সমাজকে সংগঠিত করে সেগুলোর উপস্থিতি থাকাটা জরুরী। ব্যক্তি, চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি এবং নিয়ম পদ্ধতিগুলোর সমন্বয়ই সমাজ। কোনো সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে হলে সে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের চিন্তা, অনুভূতি এবং সেখানে প্রচলিত নিয়ম-নীতি, শাসনব্যবস্থার শুদ্ধতা সাধনের মাধ্যমেই

কেবল তা করা সম্ভব। বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি, সমস্যা সমাধানের নিয়ম পদ্ধতিগুলো ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণে সমাজও হয় ভিন্ন ভিন্ন। মানুষ যখন কোথাও দলবদ্ধ হয়ে সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এমন কিছু ধারনা, বিশ্বাস ও আবেগ-অনুভূতি যা তাদের সবার মধ্যে বিদ্যমান। সে সাথে তারা কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাদের চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলো পূরণের পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয় যা তাদের বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তারপর তারা একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে যা বাস্তবে এসব নিয়ম পদ্ধতি প্রয়োগ ও রক্ষা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাসগুলোই সামাজিক চিন্তা ও অনুভূতি হিসেবে প্রকাশ পায়, যা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে কযেকটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসে। এ চিন্তা ও বিশ্বাসগুলো তাদের কাজের মানদন্ড ঠিক করে এবং সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাদের সম্পর্ককেও বিন্যস্ত করে।

সমাজের পরিচয়

'সমাজ' বলতে মূলত এমন এক ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে একাধিক চরিত্র একত্রে কিছু নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করে একত্রে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে। মানুষের ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি একত্র হয়ে লিখিত কিংবা অলিখিত নিয়ম-কানুন তৈরি করে; এরকম একত্রে বসবাসের অবস্থাকে সমাজ বলে। মানুষ ছাড়াও ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায়, তবে সেখানে মানুষের মতো কাঠামোবদ্ধ সমাজের দৃষ্টান্ত নযরে আসে না।[৫৬]

সমাজের মধ্যে যেমন সদস্যদের মধ্যে থাকে পরস্পর সৌহার্দ্য, সহযোগিতা, মমত্ব; তেমনি তৈরি হতে পারে ঘৃণা, লোভ, জিঘাংসা। তাই সমাজের মধ্যে শৃংখলা ধরে রাখার স্বার্থে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অলিখিতভাবে তৈরি হয় কিছু নিয়ম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যার লঙ্ঘন চরম অসম্মানজনক এবং সমাজের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য। তবে নিঃসন্দেহে সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার জন্য সৌহার্দ্য, সহযোগিতা একান্ত দরকার।[৫৭]

সমাজ বলা হয় মানুষের এমন সমষ্টিকে যা একই চিন্তা, একই অনুভূতি এবং একই ব্যবস্থার বন্ধনে আবদ্ধ। সমাজ হচ্ছে অনেক ব্যক্তির এমন সমন্বয়ের নাম, যেখানে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান। শুধু কতিপয় মানুষ একত্রিত হওয়াকেই সমাজ বলে না। কারণ অনেক মানুষ কোথাও একত্রিত হলে তাকে একটি দল বা সমাবেশ বলা যেতে পারে, একে সমাজ বলা যায় না। যে সব উপাদান একটি সমাজকে সংগঠিত করে, সেগুলো হচেছ কতিপয় সম্পর্ক তথা রীতি নীতি। অন্য কথায় বলা যায় সমাজ হচ্ছে ব্যক্তি, চিন্তা, আবেগ অনুভূতি এবং নিয়ম পদ্ধতিগুলোর সমষ্টির নাম। তাই কোনো সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে হলে সে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের চিন্তা, অনুভূতি এবং সেখানে প্রচলিত নিয়ম-নীতি ও শাসনব্যবস্থার শুদ্ধতা সাধনের মাধ্যমেই কেবল তা করা সম্ভব।

সমাজ বলতে একত্রে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে এবং বিভিন্ন প্রথা প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়া পদ্ধতিতে আবদ্ধ হয়ে বসবাসকারী একদল মানুষের সমষ্টিকে বোঝায়। মানুষ তথা জনগোষ্ঠী ও তাদের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক উভয়ই সমাজ গঠনের জন্য জরুরি। আর তাই পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে সমাজ বলা হয়। অর্থাৎ সমাজ হচ্ছে পরস্পরের সহযোগিতায় অবস্থানকারী মানুষের সংঘ।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজেই মানুষের জন্ম, সমাজেই তার লালন-পালন, তার শিক্ষা- দীক্ষা, ধর্ম কর্ম ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়। মানুষের সকল আশা-আকাঙক্ষা সমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সমাজ ও মানুষ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানুষবিহীন সমাজের কথা যেমন আমরা চিন্তা করতে পারি না, আবার সমাজবিহীন মানুষের কথাও আমরা কল্পনা করতে পারি না।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ সমাজে বসবাস করে এবং বিভিন্নভাবে নিজেকে বিকশিত করে। মানুষের কল্যাণ সাধন, সুষ্ঠু, সুশৃংখল এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যেই সমাজ গঠিত হয়। সমাজের মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। সমাজ তার সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। সমাজে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য সমাজে বিভিন্ন রীতিনীতি ও বিধি-বিধান প্রবর্তন করা হয়। এ সব রীতি-নীতি ও বিধি-বিধানের মাধ্যমে সমাজ তার সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ

৫৬. উইকিপিডিয়া, *সমাজ*, http://bn.m.wikipedia.org>wiki

৫৭. প্রাগুক্ত

করে থাকে। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস না করলে মানুষের মানবিক গুণবলীগুলো বিকশিত হয় না। এ ছাড়াও পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্যও সমাজবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

সামাজিক কাঠামো

সাধারণভাবে পুনরাবৃত্ত যে কোনো সামাজিক আচরণ অথবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুশৃংখল আন্তঃসম্পর্ক। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং একটি সমাজের সদস্যদের মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক ভূমিকার সমন্বয়ে একটি সমাজ কাঠামো সংঘঠিত।[৫৮]

সামাজিক কাঠামো হলো, সমাজের প্যাটার্ন সামাজিক ব্যবস্থা যা ব্যক্তিদের কর্মের থেকে উভয় উত্থান করে এবং নির্ধারণ করে। ম্যাক্রো স্কেল, সামাজিক কাঠামো আর্থ-সামাজিক স্তরবিন্যাস (যেমন, বর্গ গঠন), সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা বড় সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্য প্যাটার্ন সম্পর্কের সিস্টেম। মধ্যবর্তী স্কেলের ওপর, এটা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সামাজিক নেটওয়ার্ক সম্পর্কের স্ট্রাকচার। মাইক্রো স্কেলের ওপর, এটা উপায় নিয়ম সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তির আচরণকে আকৃতি হতে পারে। সামাজিক নিয়ম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘুর মধ্যে সম্পর্কে সামাজিক কাঠামো প্রভাবিত।[৫৯]

সমাজকাঠামো বলতে সমাজের গঠন প্রণালিকে বুঝায়। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সংগে বিভিন্ন দল ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে সম্পর্কসহ সব ধরনের সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমাজকাঠামো গড়ে উঠে। মূলত সমাজ কাঠামো হলো সমাজস্থ মানুষের সাথে মানুষের সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক। অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের সমন্বিত রূপ। সমাজ কাঠামোর দু'টি উপাদান। প্রথমত, সমাজবদ্ধ মানুষ। সমাজবদ্ধ মানুষ ছাড়া কোনো সমাজের কথা কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেক মানুষ সমাজে বাস করতে গিয়ে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। সমাজের মানুষ ও তাদের ভূমিকা সমাজ কাঠামোর একটি উপাদান। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রথা প্রতিষ্ঠান। সমাজের মানুষের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং এর মাধ্যমেই মানুষের ভূমিকা প্রতিফলিত হয়। প্রধান প্রধান সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় হলো সামাজিক কাঠামো। সমাজের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কই সমাজ কাঠামোর মূল কথা।

---

৫৮. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩), পৃ. ৪৪

৫৯. উইকিপিডিয়া, *সামাজিক কাঠামো*, http://bn.m.wikipedia.org>wiki

সামাজিক মূল্যবোধ

সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড। অর্থাৎ কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত স্থায়ী বিশ্বাস। এটি মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি। সামাজিক উৎকর্ষতার অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল্যবোধ শিক্ষা ব্যক্তির মানসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। আর এভাবে ব্যক্তি সত্তার বিকাশ সাধন করে এটি সুশাসনের পথকে প্রশস্ত করে এবং সামাজিক অবক্ষয়ের অবসান ঘটায়। মূল্যবোধ শিক্ষা ব্যক্তি জীবনের গাইড লাইন হিসেবে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক মূল্যবোধ হলো, সে বিষয়গুলো যা সমাজকে সুস্থ, সুন্দর ও সম্প্রীতি ভিত্তিক মূল্যবান সোনালী সমাজে রূপান্তরিত করে। যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাই সামাজিক মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের আচরণ বিচারের মানদণ্ড। সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের ন্যায় অন্যায় স্বাচ্ছন্দ ও অস্বাচ্ছন্দ্যবোধের এমন এক অনুভূতিক বিশ্বাস যা পরোক্ষভাবে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে আচরণ সমাজ, ব্যক্তি, দল ও গোষ্ঠীর নিকট প্রত্যাশিত। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সমাজ জীবনের রক্ষা কবচ। বড়দের সম্মান করা, আতিথেয়তা, সহনশীলতা, দানশীলতা প্রভৃতি হলো সামাজিক মূল্যবোধ। সহনশীলতাকে সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজের মধ্যে বসবাস করার প্রধান শর্ত হচ্ছে একে অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা করা এবং একে অপরকে এ অধিকার ভোগ করতে সাহায্য করা। মানুষের বড় সম্পদ হলো মূল্যবোধ। এটি মানুষ পরিবার ও সমাজ থেকে গ্রহণ করে।

সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সমাজ গঠনের প্রথম শর্ত। পরিপূর্ণ শিক্ষা অর্জন তখনই সম্ভব যখন নতুন কিছু পরিবর্তনের চিন্তা আসে। সঠিক উদ্দেশ্য, চিন্তা ও প্রচেষ্টাই পারে নতুন কিছু গঠন করতে। সামাজিক মূল্যবোধই পারে দেশ ও জাতিকে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যেতে। সমাজ গঠনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা' যা টিকিয়ে রাখতে পারে সামাজিক মূল্যবোধ। মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে নৈতিকতা, আর তার আচার আচরণকে পরিমাপ করে মূল্যবোধ। জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মেধাশক্তি, চেতনা, অনুভূতি, উপলব্ধি ও ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে নৈতিকতার উৎস। এ সবের মাধ্যমে ভালো-মন্দের বিচার করার ক্ষমতা দ্বারা মানুষের সামাজিক আচার-আচরণের সমষ্টিই মূল্যবোধ, যা সমাজের নানা ক্ষেত্রে সুন্দর ও পরিপূর্ণ হতে সাহায্য করে। সহজভাবে বলা যায় মূল্যবোধ মানুষের ভালো-মন্দ বিচারের ভিত্তি। মূল্যবোধ শিক্ষা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সুশাসন নিশ্চিত করে।

মানুষ পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্নরকম আচরণ করে যে আচরণগুলোর মাধ্যমে তার সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আর সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে এসব আচরণের সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধ সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন সামাজিক মূল্যবোধের সঠিক চর্চা। সামাজিক মূল্যবোধ চর্চায় শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সুশিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে। মানুষের মাঝে যখন জ্ঞানের আলো থাকে, তখন তার মাঝে থাকে একটি যুক্তিশীল বিবেক, যা দ্বারা সঠিক মূল্যবোধ পরিচালিত হতে পারে।

সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি

আইনের শাসন

সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে আইনের শাসন, নৈতিকতা ও সাম্য। আইনের শাসন হচ্ছে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। আইনের শাসনের মাধ্যমে মৌলিক মানবাধিকার, জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সামাজিক কল্যাণ ও সুশিক্ষার নিশ্চয়তা বিধান হয়। এ নীতিতে সমাজের সকল কাজ আইনের অধীনে পরিচালিত হবে এবং যেখানে আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে। আইনের শাসন তখনই বিদ্যমান থাকে, যখন সরকারী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন সাধারণ আদালতের পর্যালোচনাধীন থাকে, যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সকল নাগরিকের সমান।

সুশাসনের জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের সমপ্রয়োগের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উন্নত ও সভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত রাষ্ট্রে আইন ও ন্যায়বিচার তাদের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ অতীতে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হতে দেখা যেত। তখন ক্ষমতার মূল উৎস ছিলো শক্তি বা বলপ্রয়োগ। এক সময় ধর্ম সমাজ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। অন্যান্য অনেক অঞ্চলের মতো আমাদের এ ভূখণ্ডেও অতীতে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ ও রাজ্য পরিচালিত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের শাসকেরা ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা সমাজ ও রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাজা ছিলেন আইনের অন্যতম উৎস এবং তিনি প্রধান বিচারপতির ভূমিকাও পালন করতেন। কুরআন-সুন্নাহ তথা শরিয়াহ আইন দ্বারা মুসলিম শাসকেরা দীর্ঘকাল বাংলার সমাজ পরিচালনা করেছেন এবং নিজেদের 'আল্লাহর প্রতিনিধি' (খলিফা) হিসেবে বিবেচনা করে দেশ শাসন করতেন। সবার প্রতি সমান আচরণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামের মূলনীতি। ইতিহাসে বেশির ভাগ মুসলিম শাসককে তাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান হতে দেখা গেছে।[৬০]

আইন ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র ব্যর্থ না হলেও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা কমে যায়। এক সময় তা রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। আইনের শাসন এবং সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এ আস্থার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। আইনই সহজে সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে। তবে দুর্বল বা খারাপ আইন দিয়ে কখনো সুন্দর সমাজ নির্মাণ করা যায় না। সমাজ পরিবর্তন ও আধুনিকায়নে আইন গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

আইন নিঃসন্দেহে সমাজের শ্রেণিবৈষম্য দূর করতে এবং দুর্বল ও অসহায় শ্রেণির নিরাপত্তায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সমাজ পুনর্নির্মাণের অর্থ- সমাজের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের পরিবর্তন। তবে সমাজের সব ক্ষেত্রে আইন সমভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না। আইন তখনই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, যখন তা সমাজের সমর্থন লাভে সক্ষম। যে আইন সমাজের সমর্থন লাভে অক্ষম তা ভালো আইন নয়, বরং তা 'কালো' আইন।[৬১]

---

৬০. ড. শেখ আকরাম আলী, *সমাজে আইনের ভূমিকা* (দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৩ ডিসেম্বর ২০১৮), www.dailynayadiganta.com, পৃ. ১

৬১. প্রাগুক্ত

আইন সর্বদা হবে ন্যায়ানুগ এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতি হবে কার্যকর, স্বচ্ছ, সমতাভিত্তিক এবং জনকল্যাণে নিবেদিত।

কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আইনকে ব্যবহার করতে হবে। রাষ্ট্রকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সবার প্রতি আইনের সমব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তী হয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে আইনের প্রয়োগ থেকে রাষ্ট্রকে বিরত থাকতে হবে অবশ্যই। যেকোনো মূল্যে আইনের যথেচ্ছ প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেই সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব।[৬২]

ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন ছাড়া কোনো সমাজ টিকতে পারে না। কিন্তু সমতা ছাড়া সমাজে ন্যায়-বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ন্যায় বিচার ও আইনের শাসনের মূল ভিত্তি হচ্ছে সমতা প্রতিষ্ঠা। আইনের শাসনের অভাব হচ্ছে সব সংকটের মূল। আইনের শাসন না থাকলে পরিবেশ ধ্বংস হতে বাধ্য।

সামাজিক নৈতিকতা

নৈতিকতা এক ধরনের মানসিক অবস্থা যা মানুষকে অপরের মঙ্গল চিন্তা করতে এবং সমাজের জন্য ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা দেয়। যেমন: সত্য বলা, গুরুজনকে মান্য করা, অসহায়কে সাহায্য করা, চুরি, দূর্নীতি থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। এগুলো মানুষের নৈতিকতার প্রমাণ। নৈতিকতার উদ্ভব ঘটে ধর্ম, ঐতিহ্য ও মানব আচরণ থেকে। নৈতিক শিক্ষা মানব জীবনকে যথার্থ সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলে। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণকর বিষয়গুলোর অন্যতম নির্ণায়ক হলো নৈতিকতা।

ব্যক্তির সামাজিক দায় সামাজিক নৈতিকতার সারবস্তু। সামাজিক দায় দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আর যে কোনো কর্মপ্রচেষ্টা অবশ্যই সমস্ত সমাজের জন্য বয়ে নিয়ে আসে অসীম ইতিবাচকতা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমাজসেবা এবং প্রতিবেশের পরিচর্যার জন্যও বিশেষভাবে সামাজিক নৈতিকতার ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা যেকোনো রাষ্ট্র কিংবা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক বিকাশকেও সহায়তা করে। সামাজিক নৈতিকতা একটি সিস্টেমের ওপর ভিত্তি করে তার পথরেখা তৈরি করে। চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাস্তবতা এবং আদর্শ নির্মাণের কলা ও কৌশল এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে বিবেচ্য। যদি কোনো চিন্তা, কর্ম বা সিদ্ধান্ত সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলে তা হবে অনৈতিক কাজ বা দায়িত্বহীনতা। সত্য ও মিথ্যা অথবা সঠিক ও ভুলের মধ্যে যদি কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কারো কোনো ভাবনা তবে ধরে নিতে হবে ঐ ব্যক্তি সামাজিক নৈতিকতা থেকে দূরে অবস্থান করছে। মনে রাখতে হবে, সামাজিক নৈতিকতা সব সময় ঠিক জিনিসটিকেই ইঙ্গিত করে।

সামাজিক নৈতিকতা অবশ্যই মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা, প্রয়োজনীয় ও ভেজালমুক্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্যের সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পোশাক-পরিচ্ছদের অপ্রতুলতা দূর করা, চিকিৎসা সুবিধা হাতের নাগালে নিয়ে আসা, সকল মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং বাস্তবমুখী কিংবা জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা সামাজিক নৈতিকতা নির্মাণের জন্য জরুরি প্রসঙ্গ। পাশাপাশি মানবাধিকার এখন আধুনিক বিশ্বের বিশেষ দাবি। মানুষের চিন্তা প্রকাশের অধিকার, মত

৬২. প্রাগুক্ত

প্রকাশের স্বাধীনতা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও শিক্ষা অনুযায়ী কর্মসংস্থান এবং মানুষের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে কিছুতেই সামাজিক নৈতিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। মানুষ হিসেবে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধেও ভাবতে হবে সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে। খাদ্যের জন্য, চিকিৎসার জন্য, প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য আমাদের যেন আর বিদেশনির্ভর হয়ে থাকতে না হয়, তার নিশ্চয়তা প্রদান করার দায়িত্ব সামাজিক নৈতিকতাবোধ দ্বারা তাড়িত মানুষের উপরে বর্তায়।

সাম্য ও সমতা

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে সাম্য ও সমতা সম্পর্কীয় যে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়, মানব জাতির অতীত কিংবা বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোথাও তা দেখা যায় না। ইসলাম সকলকে অন্যায়-অবিচার, খুন খারাবী, সন্ত্রাস ইত্যাদির উর্দ্ধে উঠে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবার নির্দেশ দিয়েছে। কুর'আন মাজিদে মানব গোষ্ঠীকে জন্মগতভাবে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ •

অর্থ: হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে, তারপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং অবগত।[৬৩]

আইন ও বিচার সকল মানুষের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য হবে। বস্তুত জনসম্পদে সমতা বিধানের ফলেই রাষ্ট্রের জনগণ সন্তোষ এবং নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে। তারা কার্যত দেখতে পায় যে, এখানে কারো প্রতি কোনো রূপ যুলুম বা অবিচার করা হয় না, পক্ষপাতিত্ব করা হয় না। এখানে নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত হয়। তখন তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করে। এ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু এ সাম্য লঙ্ঘিত হয় আর আইন যদি দূর্বলদের ওপর কার্যকর হতে থাকে তখন জনগণের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কোনো আন্তরিকতা থাকে না। তারা এর স্থিতি ও প্রতিরক্ষার জন্য কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত হয় না।

৬৩. আল কুর'আন, ৪৯:১৩

২য় অধ্যায়

কুরআন ও পরিবার

আল্লাহ তা'য়ালার অন্যতম মহান নিয়ামত ও নিদর্শন হলো পরিবার। পরিবারের ছায়াতলে মানবগোষ্ঠী ভালোবাসা ও নিরাপত্তা লাভ করে। অন্তরের সাথে অন্তরের এবং মনের সাথে মনের আলিঙ্গন হয় এ পরিবারের মাধ্যমে। পরিবারের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিস্তার লাভ করে।

কুর'আনে পরিবারকে দূর্গের সংগে তুলনা করা হয়েছে এবং পারিবারিক জীবন যাপনকারী নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েকে বলা হয়েছে 'দুর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত লোকগণ।' দূর্গ যেমন শত্রুর পক্ষে দূর্ভেদ্য, তার ভিতর জীবনযাত্রা যে রকম নিরাপদ, ভয়-ভাবনাহীন, সর্বপ্রকারের আশংকামুক্ত; পরিবারের নারী-পুরুষ ও ছেলেমেয়ে নৈতিকতা বিরোধী পরিবেশ ও অসৎ-অশ্লীল জীবনের হাতছানি বা আক্রমণ থেকে তেমনিই সর্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে। বস্তুত পরিবারস্থ ছেলেমেয়ের পক্ষে পিতামাতা, ভাই বোনের তীব্র শাসন ও নিকটাত্মীয়দের সজাগ দৃষ্টির সামনে পথভ্রষ্ট হওয়া বা নৈতিকতা বিরোধী কোনো কাজ করা খুব সহজ হতে পারে না।[৬৪]

রক্ত সম্পর্কের বন্ধন সবচেয়ে পবিত্র বন্ধন। সবচেয়ে অধিক মর্যাদা ও সম্মানের বন্ধন। এ বন্ধনের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় ঘরের প্রশান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তি। পারিবারিক জীবন বিবর্জিত মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। সমাজের শান্তি, শৃংখলা, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ইত্যাদি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার ওপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। পরিবারই হচ্ছে কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি। আদর্শ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত আদর্শ পরিবার গঠন। প্রত্যেক মুসলমানের সামাজিক দায়িত্ব হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আর এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সৃষ্টি হয় মূলত ইসলামি মূল্যবোধভিত্তিক একটি পরিবার গঠনের মাধ্যমে।

কুর'আনের আলোকে পরিবার শুধু একটি উত্তম সামাজিক প্রতিষ্ঠানই নয় বরং একটি পবিত্র সংস্থা। সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি হয় পরিবারকে কেন্দ্র করেই। পরিবারই হলো পবিত্র কুর'আনে পরিবারের সদস্যদের মুহসিনীন বা প্রাচীর ঘেরা দূর্গে অবস্থানকারী সুরক্ষিত লোকজনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সহীহ হাদীসে এসেছে:

"আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যার চরিত্র ভালো এবং যে নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে দয়াদ্র ব্যবহার করে সে ঈমানের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ মুমিন।"[৬৫]

সঠিক ইসলামী পরিবার গঠনের ওপরই নির্ভর করে আমাদের দুনিয়াবী ও আখেরাতের জীবনের কামিয়াবীর সিংহভাগ। পরিবারের মূল ভিত্তি দাম্পত্য জীবনকে যদি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠন করা যায়, তবে সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে বিস্তৃত বর্ধিত পরিবারকেও ইসলামের আলোকে গঠন করা সহজ হবে। আর যদি দাম্পত্য জীবনে ইসলামী আদর্শের কমতি থেকে যায় তাহলে বর্ধিত পরিবারের ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে যাবে। পারিবারিক জীবনে শান্তি না থাকলে জীবনের কোনো স্তরেই শান্তি থাকতে পারে না। এ জন্য ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে পারিবারিক বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।

---

৬৪. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১০), পৃ. ৭৭

৬৫. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, অনু. মুহাম্মাদ মূসা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭) খ. ৪, পৃ. ৩৭৭, হাদীস নং-২৫৫০

১ম পরিচ্ছেদ

আল কুর'আনের আলোকে পারিবারিক সম্পর্কের বিস্তৃত ধারণা

ব্যক্তি ও পারিবারিক পবিত্রতা ও সুস্থতার ওপরই নির্ভর করে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বময় মানবজাতির পবিত্রতা ও সুস্থতা। পারিবারিক বন্ধন থেকেই মানব বংশ সম্প্রসারিত হয়েছে। যদি সকল জাতি ও গোত্রের লোকেরা বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তবে সে পরিবার সমাজে সর্বোত্তম আদর্শ পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সে পরিবারে বইতে থাকবে শান্তির ফল্গুধারা। পরিবারের সদস্যরা যখন আল্লাহর দেয়া দায়িত্বানুভূতি সম্পর্কে সজাগ থাকবে, স্ত্রী তার পূর্ণাঙ্গ অধিকার পাবে, স্বামী স্ত্রীর নিকট অধিকার পাবে, সন্তান বাবা-মায়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও তাদের অধিকার লাভ করবে, আত্মীয় স্বজন যখন তাদের পরস্পরের মর্যাদা পাবে তখন সে পরিবারে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকবে। ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক জীবন হলো আল্লাহ তা'য়ালার মহা অনুগ্রহ। একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশনা মেনে চলা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী পরিবার গঠন করলে সে পরিবার হবে একটি আদর্শ ও সর্বোত্তম পরিবার।

একটি সমাজ এর প্রথম ভিত্তি পরিবার। দু'জন নারী ও পুরুষের শরীয়তসম্মত পবিত্র এক বন্ধনের মাধ্যমে পরিবার নামক এ বুনিয়াদের গোড়াপত্তন হয়। হযরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়ার পরিবারটি এ পৃথিবীতে শুধু নয় দুনিয়ার প্রথম পরিবার। এরপর যতজন নবী-রাসূল, আম্বিয়া কিরাম এসেছেন সবাই একটি পরিবারবদ্ধ জীবনযাপন করেছেন। পরিবারই ছিলো তাদের মানসিক প্রশান্তি, নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকার শান্তিপূর্ণ আবাসস্থল। পরিবার এবং পরিবারের সুসম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে কুর'আন এবং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে পরিবারকে প্রথম বীজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের সমন্বয়ে গড়ে উঠা একান্নভুক্ত পরিমণ্ডলকে বুঝায়। এদের সমন্বয়ে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অত্যাধিক। ইসলাম পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে দিয়েছে তাদের নিজ নিজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং কর্তব্য। ফলে মাতা-পিতা তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে ইসলামের শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে বড় করে তোলেন। ইসলাম পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও গতিশীল করার জন্য নানাবিধ বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে, যেগুলো পরিবারের প্রতি ইসলামের সীমাহীন গুরুত্বারোপের প্রমাণ বহন করে।

সৎ লোকদের জন্য পারিবারিক জীবন শুধু ইহকালেই সীমাবদ্ধ নয়, এ পারিবারিক জীবন জান্নাতেও বর্তমান থাকবে। এ বিষয়ে কুর'আনে আল্লাহ বলেন:

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا وَ مَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَ اَزۡوَاجِهِمۡ وَ ذُرِّيّٰتِهِمۡ وَ الۡمَلٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُوۡنَ عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ كُلِّ بَابٍ •

অর্থ: তা হলো চিরস্থায়ী জান্নাত, তাতেই তারা দাখিল হবে এবং তাদের বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা নিজেদের এসলাহ (সংশোধন) করেছে তারাও। প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের কাছে দাখিল হবে।[৬৬]

৬৬. আল কুর'আন, ১৩:২৩

আল কুর'আনে মা

মানব জীবনে মায়ের অধিকার এবং প্রভাব সবচেয়ে বেশি। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন মা। প্রসব করেন মা। স্তন্য পান করান মা। পানাহার করান মা। বুকে করে লালন পালন করেন মা। সুন্দর সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করার যাবতীয় কষ্ট স্বীকার করেন মা। খেতে শিখান মা। চলতে শিখান মা। বলতে শিখান মা। সন্তানের জন্যে কী না করেন মা?

কুরআন মাজিদে সন্তানের জন্যে মায়ের সীমাহীন কষ্ট স্বীকার, সন্তানের প্রতি মার অসীম ইহসান আর রক্তে-মাংসে মেশা স্নেহ-মমতার কথা লেখা হয়েছে সোনালি হরফে। মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও লালনগত বাস্তবতার নিরিখে মায়ের প্রতি মনোযোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ •

অর্থ: তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন তোমাদের মায়ের গর্ভে। সৃষ্টি করেন একটির পর একটি করে তিনটি অন্ধকারের গোপন আবরণে (in three veils of darkness)।[৬৭]

এখানে তিনটি পর্দা বলতে পেট, গর্ভথলি এবং ঝিল্লি (যার মধ্যে বাচ্চা জড়িয়ে থাকে) বোঝানো হয়েছে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ •

অর্থ: আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি যত্নশীল হবার এবং উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে দুঃখ কষ্টের পর দুঃখ কষ্ট সহ্য করে গর্ভে বহন করেছে। তারপর দুই বছর লেগেছে তার দুধ ছাড়াতে। (তাই হে মানুষ! তোমরা) আমার প্রতি এবং তোমাদের মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। আর তোমাদের ফিরে আসতে তো হবে আমারই কাছে।[৬৮]

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا •

অর্থ : আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা পিতার প্রতি দয়া পরশ ও কর্তব্য পরায়ণ হতে। তার মা তাকে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে বহন করেছে এবং প্রসব করেছে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করে। গর্ভে ধারণ করা এবং স্তন্য পান করানো সহ তাকে ত্রিশ মাস ধরে বহন করেছে।[৬৯]

এ শব্দগুলো থেকে ইমাম শাফে'ঈ (রহ.), ইমাম আহমদ (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, শিশুর দুধ পান করার মেয়াদ ২ বছরে পূর্ণ হয়ে যায়। এ মেয়াদকালে কোনো শিশু যদি কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করে তাহলে দুধ পান করার "হুরমাত" (অর্থাৎ দুধ পান করার কারণে স্ত্রীলোকটি তার মায়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যাওয়া এবং তার জন্যে তার সাথে বিবাহর হারাম হয়ে যাওয়া) প্রমাণিত হয়ে যাবে। অন্যথায় পরবর্তীকালে কোনো প্রকার দুধ পান করার ফলে কোনো "হুরমাত" প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ

৬৭. আল কুর'আন, ৩৯ : ৬

৬৮. আল কুর'আন, ৩১: ১৪

৬৯. আল কুর'আন, ৪৬: ১৫

উক্তির স্বপক্ষে ইমাম মালেকেরও একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে এ মেয়াদকে বাড়িয়ে আড়াই বছর করার অভিমত ব্যক্ত করেন। এ সংগে ইমাম সাহেব একথাও বলেন, যদি দু'বছর বা এর চেয়ে কম সময়ে শিশুর দুধ ছাড়িয়ে দেয়া হয় এবং খাদ্যের ব্যাপারে শিশু কেবল দুধের ওপর নির্ভরশীল না থাকে, তাহলে এরপর কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করার ফলে কোনো দুধ পান জনিত "হুরমাত" প্রমাণিত হবে না। তবে যদি শিশুর আসল খাদ্য দুধই হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য খাদ্য কম বেশি কিছু খেয়ে নিলেও এ সময়ের মধ্যে দুধ পানের কারণে "হুরমাত" প্রমাণিত হয়ে যাবে। কারণ শিশুকে অপরিহার্যভাবে দু'বছরেই দুধ পান করাতে হবে, আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ •

অর্থ: আর মায়েরা যেনো তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করায়– যে দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় তার জন্যে। জনকদের কর্তব্য হলো প্রচলিত নিয়মে তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করা।[৭০]

ইমাম যুহরী (রা.) সূরা আল বাকারার ২৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সন্তানকে কেন্দ্র করে তার পিতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে সন্তানের মাতাকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন অর্থাৎ (তালাকপ্রাপ্তা) মা তাঁর শিশু সন্তানকে নিজ স্তনের দুধ পান করাতে অস্বীকার করতে পারবে না। তার স্তনের দুধ সন্তানের খাদ্য এবং সে অন্যদের তুলনায় তার প্রতি সর্বাধিক স্নেহময়ী ও দয়ালু। অতএব তার তালাকদাতা স্বামী তাকে আল্লাহ নির্ধারিত প্রাপ্ত প্রদান করলে সে তার সন্তানকে দুধ পান করাতে পারবে না। অপরপক্ষে পিতাও শিশু সন্তানকে কেন্দ্র করে তার জন্মদাত্রীকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারবে না। তাই মাকে বাদ দিয়ে শিশুকে অন্য কোনো নারীর দুধ পান করাতে আল্লাহ তা'য়ালা তালাকদাতা পিতাকে নিষেধ করেছেন। পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তোষের ভিত্তিতে সন্তানকে অন্য নারীর দুধ পান করাতে তাদের কারো অন্যায় হবে না। যদি তারা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন পান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। অর্থাৎ পারস্পরিক পরামর্শ ও সম্মতির ভিত্তিতে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার পর তা করা যাবে।[৭১]

ইবনে আব্বাস (রা.) এ শব্দগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হয়েছেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছ'মাস। কারণ কুর'আনের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে,

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا •

অর্থ: তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার বুকের দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।[৭২]

---

৭০. আল কুর'আন, ২: ২৩৩

৭১. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, অনু. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল: ১৯৮২), খ. ৫, পৃ. ১৬৫

৭২. আল কুর'আন, ৪৬: ১৫

এটি একটি সূক্ষ্ম আইনগত বিধান এবং এর ফলে বৈধ ও অবৈধ গর্ভের অনেক বিতর্কের অবসান ঘটে।[৭৩]

সন্তানদের যদিও মা-বাপ উভয়েরই সেবা করতে হবে কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে মায়ের অধিকার এ কারণে বেশি যে, সে সন্তানের জন্য বেশি কষ্ট স্বীকার করে। এ আয়াত এ দিকেই ইংগিত করে। একটি হাদিস থেকেও এ বিষয়টি জানা যায়। কিছুটা শাব্দিক পার্থক্যসহ হাদিসটি বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ এবং ইমাম বুখারির আদাবুল মুফরাদে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে:

এক ব্যক্তি নবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার ওপর কার খিদমতের হক সবচেয়ে বেশি?' নবী (সা.) বললেন: 'তোমার মার'। সে বললো: 'তারপর কে?' তিনি বললেন: 'তোমার মা।' সে জিজ্ঞেস করলো: 'তারপর কে?' তিনি বললেন: 'তোমার মা।' সে আবারো জিজ্ঞেস করলো: 'তারপর কে?' তিনি বললেন: 'তোমার বাপ।'[৭৪]

নবী (সা.)-এর এ বাণী হুবহু এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা। কারণ, এতেও মায়ের তিনগুণ বেশি অধিকারের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে: ০১. কষ্ট করে মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। ০২. কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং ০৩. গর্ভধারণ ও দুধ পান করাতে ৩০ মাস লেগেছে।

এ আয়াত, সূরা লোকমানের ১৪ নম্বর আয়াত এবং সূরা বাকারার ২৩৩ নম্বর আয়াত থেকে আরো একটি আইনগত বিষয় পাওয়া যায়। একটি মামলায় হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সে বিষয়টিই তুলে ধরেছিলেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে হযরত উসমান (রা.) তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। ঘটনাটা হচ্ছে, হযরত উসমান (রা.) খিলাফত যুগে এক ব্যক্তি জুহায়না গোত্রের একটি মেয়েকে বিয়ে করে এবং বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই তার গর্ভ থেকে একটি সুস্থ ও ত্রুটিহীন শিশু ভুমিষ্ঠ হয়। লোকটি হযরত উসমানের কাছে ঘটনাটা পেশ করে। তিনি উক্ত মহিলাকে ব্যভিচারিনী ঘোষণা করে তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) এ ঘটনা শোনা মাত্র হযরত উসমানের (রা.) কাছে পৌঁছেন এবং বলেন: 'আপনি এ কেএ ফায়সালা করলেন?' জবাবে হযরত উসমান বললেন, 'বিয়ের ছয় মাস পরেই সে জীবিত ও সুস্থ সন্তান প্রসব করেছে। এটা কি তার ব্যভিচারিনী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয়?' হযরত আলী (রা.) বললেন: 'না।' এরপর তিনি কুরআন মজিদের উপরোক্ত আয়াত তিনটি ধারাবাহিকভাবে পাঠ করলেন। সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ •

অর্থ: আর মায়েরা যেনো তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করায়– যে দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় তার জন্যে।[৭৫] সূরা লোকমানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ •

অর্থ: এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে।[৭৬] সূরা আহকাফে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:

---

৭৩. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৪), খ. ১১, পৃ. ১১৯

৭৪. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮৮, হাদীস নং-৫৫৩৮

৭৫. আল কুর'আন, ২: ২৩৩

৭৬. আল কুর'আন, ৩১: ১৪

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا •

অর্থ: তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার বুকের দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।[৭৭]

এখন ত্রিশ মাস থেকে যদি দুধ পানের দুই বছর বাদ দেয়া হয় তাহলে গর্ভ ধারণকাল ছয় মাস মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এ থেকে জানা যায়, গর্ভ ধারণের স্বল্পতম মেয়াদ ছয় মাস। এ সময়ের মধ্যে সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হতে পারে। অতএব, যে মহিলা বিয়ের ছয় মাস পরে সন্তান প্রসব করেছে তাকে ব্যভিচারিনী বলা যায় না। হযরত আলী (রা.) এর যুক্তি প্রমাণ শুনে হযরত উসমান (রা.) বললেন: 'আমার এ-মস্তিষ্কে এ বিষয়টি আদৌ আসেনি।' এরপর তিনি মহিলাটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। একটি বর্ণনাতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)ও এ বিষয়ে হযরত আলীর (রা.) মতকে সমর্থন করেছিলেন এবং তারপর হযরত উসমান তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছিলেন।[৭৮]

এ তিনটি আয়াত একত্রিত করে পাঠ করলে যেসব আইনগত বিধান পাওয়া যায় তা হচ্ছে:

এক. যে মহিলা বিয়ের পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করবে (অর্থাৎ তা যদি গর্ভপাত না হয়, বরং স্বাভাবিক প্রসব হয়) সে ব্যভিচারিনী সাব্যস্ত হবে এবং তার স্বামীর বংশ পরিচয়ে তার সন্তান পরিচিত হবে না।

দুই. যে মহিলা বিয়ের ছয় মাস পর বা তার চেয়ে বেশি সময় পর জীবিত ও সুস্থ সন্তান প্রসব করবে শুধু এ সন্তান প্রসব করার কারণে তাকে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না। তার স্বামীকে তার প্রতি অপবাদ আরোপের অধিকার দেয়া যেতে পারে না এবং তার স্বামী ঐ সন্তানের বংশ পরিচয় অস্বীকার করতে পারে না। সন্তান তারই বলে স্বীকার করা হবে এবং মহিলাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

তিন. দুধপান করানোর সর্বাধিক মেয়াদ দুই বছর। এ বয়সের পর যদি কোনো শিশু কোনো মহিলার দুধ পান করে তাহলে সে তার দুধ মা হবে না এবং সূরা নিসার ২৩ আয়াতে দুধ পানের যে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে তাও এ ধরনের দুধপানের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা অধিক সতর্কতার জন্য দুই বছরের পরিবর্তে আড়াই বছরের মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যাতে দুধপান করানোর কারণে যে সব বিষয় হারাম হয় সে সব নাজুক বিষয়ে ভুল করার সম্ভাবনা না থাকে। এখানে এ বিষয়টির অবগতি বে-ফায়দা হবে না যে, সর্বাধুনিক মেডিকেল গবেষণা অনুসারে একটি শিশুকে পরিপুষ্টি ও পরিবৃদ্ধি লাভ করে জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপযোগী হতে হলে কমপক্ষে ২৮ সপ্তাহ মাতৃগর্ভে অবস্থান প্রয়োজন। এটা সাড়ে ছয় মাস সময়কালের সামান্য বেশি। ইসলামি আইনে আরো প্রায় অর্ধ মাস সুযোগ দেয়া হয়েছে। কারণ, একজন মহিলার ব্যভিচারিনী প্রমাণিত হওয়া এবং একটি শিশুর বংশ পরিচয় থেকে বঞ্চিত হওয়া বড় গুরুতর ব্যাপার। মা ও শিশুকে আইনগত এ কঠিন পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য বিষয়টির নাজুকতা আরো বেশি সুযোগ পাওয়ার দাবী করে। তাছাড়া গর্ভ কোন্ সময় স্থিতি লাভ করেছে তা কোনো ডাক্তার, কোনো বিচারক এবং এমনকি মহিলা নিজে এবং তাকে গর্ভদানকারী পুরুষও সঠিকভাবে জানতে পারে না। এ বিষয়টিও গর্ভধারণের স্বল্পতম আইনগত মেয়াদ নির্ধারণে আরো কয়েক দিনের অবকাশ দাবী করে।[৭৯]

---

৭৭. আল কুর'আন, ৪৬: ১৫

৭৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১২০

৭৯. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১৯৩-১৯৫

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইসরাঈল (অর্থাৎ ইয়াকুব)-এর বংশধর। মূসা আলাইহিস সালাম যখন মিশরে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ফিরাউনরা ইসরাঈল বংশের নবজাতক পুত্র সন্তানদের হত্যা করার অভিযান চালাচ্ছিল। এ হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষার জন্যে হযরত মূসার মা আল্লাহর ইশারায় শিশু মূসাকে একটি বাক্সে করে নদীতে ভাসিয়ে দেন। আর এভাবে মূসা ফিরাউনের ঘরে চলে যান অজ্ঞাত শিশু হিসেবে। হযরত মূসার বোন ভাসিয়ে দেয়া বাক্স অনুসরণ করে ফেরাউনের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। ফিরাউনরা যখন শিশুটির লালন পালনের জন্যে ভালো ধাত্রী খুঁজছিল, তখন মূসার বোন তাদেরকে একজন ভালো ধাত্রীর সন্ধান দেয়। ঐ ধাত্রী ছিলেন আসলে মূসারই মা। শিশু সন্তানকে কোল ছাড়া করার পর মূসার মা চরম পেরেশান ও ব্যাকুল হয়ে পড়েন। অতপর মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মায়ের চক্ষু শীতল করে দেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ •

অর্থ: (হে মূসা!) যখন তোমার বোন (ফেরাউনের ওখানে) এসে বললো: 'আমি কি আপনাদের এমন একজনের কথা বলবো, যিনি ওকে (সুন্দরভাবে) প্রতিপালন (nurse) করতে সক্ষম হবেন?' এভাবে আমি তোমাকে তোমার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে করে সে তার চক্ষু শীতল করতে পারে আর দুঃখ-দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে থাকতে না হয়।[৮০]

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ •

অর্থ: আল্লাহ্ই তোমাদের বের করে এনেছেন তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে। তখন তোমরা কিছুই জানতে না। তারপর তিনিই তোমাদের দান করেছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং হৃদয়-এ (অর্থাৎ দেখে-শুনে জানার ও বুঝার শক্তি), যাতে করে তোমরা (তাঁর প্রতি) কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করো।[৮১]

এ আয়াত গুলোতে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে তার জন্যে তার মায়ের নিদারুণ কষ্টের বিষয়ে। তার চোখের সামনে চিত্রিত করা হয়েছে তার জন্যে তার মা'র কষ্টের জীবন্ত ছবি। তার বিবেককে জাগ্রত করে তোলা হয়েছে তার মায়ের প্রতি মনোযোগী হতে। আয়াত গুলোতে মায়ের যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে তা হলো:

০১. আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি মানুষের সৃষ্টির সূচনা করেন তার মায়ের গর্ভে, তিনটি গোপন স্তরে।
০২. মা সন্তানকে দুঃখ কষ্টের পর দুঃখ কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেন।
০৩. মা নিদারূণ কষ্ট স্বীকার করে সন্তান প্রসব করেন।
০৪. মা চরম কষ্ট স্বীকার করে সন্তানকে দুই বছর দুধ পান করান।
০৫. গর্ভে ধারণ, প্রসব এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত মা তার হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা দিয়ে সন্তানের জন্য যে দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেন, সে দৃস্টান্ত তুলনাহীন। মা ছাড়া তা আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

---

৮০. আল কুর'আন, ২০ : ৪০
৮১. আল কুর'আন, ১৬ : ৭৮

০৬. শিশুকালে সন্তান বেহাত হলে মা ব্যাকুল বেহাল হয়ে পড়েন- যতোক্ষণ না সন্তান আবার কোলে ফিরে পান।

০৭. সন্তানকে মা তার কলিজার টুকরা, হৃদয়ের অংশ এবং বুকের ধন হিসেবে লালন করেন। সন্তান বুকে থাকলেই তাঁর চক্ষু শীতল থাকে। সন্তান কোল হারা হলে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। যেএ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন মূসার মা।

০৮. আল্লাহই মানুষকে মায়ের গর্ভে সৃষ্টি করেন এবং তিনিই তাকে মানুষ বানিয়ে পৃথিবীতে বের করে আনেন।

০৯. তাই মানুষের প্রধান কর্তব্য হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহর শোকর আদায় করা। তারপর মা-বাবার শোকর আদায় করা।

১০. আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন- মাতা-পিতার প্রতি দয়া পরবশ ও কর্তব্য পরায়ণ হতে।

১১. মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসে একেবারে অজ্ঞ, অক্ষম ও অসমর্থ হিসেবে। তারপর মহান আল্লাহই তাকে শ্রবন শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও উপলব্ধি শক্তিসহ যাবতীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি সামর্থ দান করেন। এ জন্যে মানুষের উচিত, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে জীবন যাপন করা।

১২. মানুষ নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়নি, নিজেই জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি সামর্থ অর্জন করেনি। মহান আল্লাহর অসীম কুদরতেই তার সৃষ্টি হয়েছে এবং সে এসব কিছু অর্জন করেছে। আর তাকে গর্ভে ধারণ ও লালন করার জন্যে আল্লাহই তার মায়ের দেহ-একে উর্বর ও অনুকূল করে দিয়েছেন। তাই আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করা আর মায়ের প্রতি কর্তব্য পরায়ণ থাকা মানুষের কর্তব্য।[৮২]

৮২. আবদুস শহীদ নাসিম, *কুরআন ও পরিবার* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ডিসেম্বর-২০০৬), পৃ. ৩৭-৪০

আল কুর'আনে বাবা-মা

পিতার ঔরশ আর মাতার গর্ভেই মানুষের জন্ম। পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি ও বংশ বৃদ্ধির এটাই আল্লাহর প্রদত্ত প্রক্রিয়া। এটাই আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান। এ প্রক্রিয়ায় আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার অন্তরে সন্তান জন্ম দান, সন্তান লালন ও বংশ বৃদ্ধির এক উদগ্র কামনা জাগ্রত করে দেন। ফলে তারা সন্তানের জন্যে সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করেন। মা যে সন্তানের জন্যে কতো কষ্ট স্বীকার করেন সে সম্পর্কে একটু আগেই আমরা আল্লাহর বাণী পড়ে এসেছি। তাছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তো আছেই।

এ ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন পিতা। পিতার প্রতি এ দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ই অর্পণ করেছেন। সন্তান আর সন্তানের প্রসূতি-মায়ের তত্ত্বাবধান করা, কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জন্যে উপার্জন করা, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, তাদের জন্যে ভালো খাবার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে চিকিৎসা করা, সন্তানের পড়ালেখার ব্যবস্থা করাসহ সন্তান প্রতিপালনের যাবতীয় অভিভাকত্বের দায়িত্ব পিতাকেই পালন করতে হয়। আর পিতা এসব দায়িত্ব শুধু দায়িত্বের খাতিরেই পালন করেননা- বরং হৃদয় ভরা স্নেহ-ভালোবাসার টানেই এ দায়িত্ব পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন: পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"[৮৩]

এভাবে পিতা মাতা দু'জনই পরম স্নেহ ভালবাসা দিয়ে সন্তান লালন পালন করেন। সন্তানের জন্যে তারা জীবনের ঝুঁকিসহ সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট এবং ত্যাগ ও কুরবানি অকাতরে সইয়ে যান দিনের পর দিন। হৃদয় উজাড় করা স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন করেন তাদের। সন্তানের সুখের জন্যে দুঃখ কষ্টের পর্বত আরোহন করেন তারা। সন্তানের কোনো দুঃখ কষ্ট, অসুখ বিসুখ কিংবা বিপদাপদ দেখা দিলে তারা চরম ব্যাকুল ও পেরেশান হয়ে উঠেন। নিজ জীবন থেকে সন্তানের জীবনের প্রতি অনেক অনেক বেশি যত্নশীল থাকেন তারা। কারো জীবনকে নিজের জীবনের মতো মূল্য দেয়া, নিজের কল্যাণের মতো অপরের কল্যাণ কাএা করা, নিজের ভালোর মতো অপরের ভালো চাওয়া, নিজের সুখের মতো অপরের সুখ শান্তি চাওয়া, নিজের দুঃখের মতো অপরের দুঃখ অনুভব করা, নিজের সুখের মতো অপরের সুখে খুশি হওয়া সর্ব সম্মতভাবে মানবতার সর্বোচ্চ মান। কিন্তু সন্তানের জন্যে মাতা-পিতার অবস্থান এর চাইতেও অনেক অনেক উপরে।

মা বাবা সন্তানের ভালোর জন্যে, কল্যাণের জন্যে, মঙ্গলের জন্যে, সুখের জন্যে, শান্তির জন্যে, সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে নিজের সুখ শান্তি জলাঞ্জলি দিতে কিছুমাত্র তোয়াক্কা করেন না। বিপদ মুসিবতের দরিয়া পাড়ি দিতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করেন না। সকল ব্যাপারে তারা সন্তানের কল্যাণকে নিজের কল্যাণের চাইতে বড় করে দেখেন। সন্তানের অকল্যাণে নিজের অকল্যাণের চাইতেও অনেক বেশি ব্যথিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়েন। অন্য কারো সাথে এর কোনো তুলনা হয় না। এর কোনো উপমা নেই। সন্তানের জন্যে মা বাবার স্নেহ-ভালোবাসা সীমাহীন।[৮৪]

---

৮৩. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, অনু. মুহাম্মাদ মূসা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭) খ. ৩, পৃ. ৩৬২, হাদীস নং-১৮৪৮

৮৪. আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

মানুষের জন্যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার অবারিত দান ও দয়ার পরই মা-বাবার দান ও দয়ার স্থান। আল্লাহ তা'আলা নিজেই মানুষের পিতা মাতার এ অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এরই প্রেক্ষিতে মা বাবার প্রতি কর্তব্য পরায়ণ হবার নির্দেশ মানুষকে দিয়েছেন:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا •

অর্থ: তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন 'তোমরা শুধুমাত্র তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব-আনুগত্য করো না। তাছাড়া মাতা-পিতার প্রতি সদয় ও কর্তব্য পরায়ণ হও। তোমার জীবদ্দশায় তাদের একজন কিংবা দুজনই যদি বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছে, তবে তাঁদের প্রতি কখনো কোনো অসম্মানজনক কথা উচ্চারণ করো না। তাদের সাথে চীৎকার করে বা ধমকের সুরে কথা বলো না। বরং সম্মানের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলো।'[৮৫]

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا •

অর্থ: আর মাতা-পিতার প্রতি দয়া ও কোমলতার ডানা প্রসারিত করো এবং (আল্লাহর কাছে) বলো: 'আমার প্রভু! তুমি আমার মাতা-পিতা দু'জনের প্রতি দয়া করো, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে পরম দয়া ও কোমলতার সাথে প্রতিপালন করেছেন।'[৮৬]

মানুষ তার পিতা-মাতার মাধ্যএে দুনিয়াতে এসেছে। অতএব তারাই সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার যোগ্য।

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا • إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا •

অর্থ: মানুষের ওপর কি কালের এমন অধ্যায় অতিবাহিত হয়নি, যখন উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না সে? আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত নোতফা (শুক্র বিন্দু) থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। আর এ উদ্দেশ্যেই আমরা তাকে অধিকারী করেছি শ্রবণ শক্তি আর দৃষ্টি শক্তির (অর্থাৎ- জ্ঞান বুদ্ধি বিবেকের)।[৮৭]

আল্লাহর পরে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হক ও অগ্রাধিকার হচ্ছে পিতা-মাতার। সন্তানকে পিতা- মাতার আনুগত্য, সেবা পরায়ণ ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন হতে হবে। সন্তানদের নৈতিকমান এমন পর্যায়ের হতে হবে যেন বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে এমনভাবে খিদমত করে, যেএ করে পিতা-মাতা শিশুকালে তাদের পরিচর্চা ও লালন পালন করেন। যেমন করে পিতা-মাতা সন্তানদের মান-অভিমান বরদাশ্ত করেছেন তেএ করে সন্তানরাও করবে। সর্বোত্তম কাজগুলো সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

"ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! এরপর কোনটি? তিনি বলেন, পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবারো জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর কোনটি? তিনি

৮৫. আল কুর'আন, ১৭ : ২৩
৮৬. আল কুর'আন, ১৭ : ২৪
৮৭. আল কুর'আন, ৭৬: ১-২

বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে কিছু বলা থেকে নীরব থাকেন। আমি যদি তাঁকে আরো জিজ্ঞেস করতাম, তবে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে আরো জানাতেন।"[৮৮]

পিতা মাতার অবাধ্য হওয়াকে মারাত্মক গুনাহ আখ্যায়িত করে রাসূল (সা.) বলেন: "আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (রা.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্নিত। তিনি বলেন: রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলে দিন। তিনি বলেন: আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া। রাবী বলেন: তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসেন ও বলেন এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং মিথ্যা কথা বলা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ কথা অবিরত বলতে থাকেন। আমি (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আহা! তিনি যদি থামতেন, চুপ হতেন!"[৮৯]

এ পৃথিবীর বুকে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে উপরে। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর একমাত্র উপাস্য ও অভিভাবক। আর পিতা-মাতা হলো তার সন্তানদের ইহকালীন জীবনের সাময়িক অভিভাবক। সুতরাং সন্তানদের কাজ হলো, মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'য়ালার যাবতীয় হুকুমের সাথে পিতা-মাতার প্রতি তাদের দায়িত্বগুলো পালন করা। সন্তান জন্মের পর বাল্য, শৈশব বা কৌশোর পর্যন্ত পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানেই থাকে এবং অনুগতও থাকে। অতঃপর যৌবনে বা সংসার জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সংগে তার সন্তানদের মতভিন্নতা দেখা দিতে পারে। তাই মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'য়ালা পিতা-মাতার সাথে তার সন্তানদের বাল্য জীবনের ভালোবাসার মতোই সারা জীবন তা মজবুত ও বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন।

অনেকেই বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। কিন্তু ইসলামে মহান আল্লাহ বাবা-মায়ের মর্যাদা অনেক উপরে দিয়েছেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তাঁর নিজের অধিকারের পরই পিতা-মাতার অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা যেএ অতীব জরুরি তেমনি পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করাও সন্তানের জন্য জরুরি।

পিতা-মাতাকে গালি না দেয়ার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে: "আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো- কোনো লোকের তার পিতা-মাতাকে লানত (অভিসম্পাত) করা। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে একজন লোক তার পিতা-মাতার প্রতি লানত করতে পারে? নবী (সা.) বললেন: এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাকে গালি দেয়। তখন ঐ ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, ফলে অপর ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।[৯০]

প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার কারণেই সে প্রথম ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়। যদি সে গালি না দিতো, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রতি উত্তরে প্রথমোক্ত ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দিতো না। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি নিজেই তার পিতাকে গালি দেয়ার কারণ। অতএব সে নিজেই যেন তার পিতা-মাতাকে গালি দিলো।

---

৮৮. আবু ঈসা তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৮৪৭

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪, হাদীস নং-১৮৫০

৯০. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮৯, হাদীস নং-৫৫৪০

পিতা-মাতার সেবা জিহাদে গমনের চেয়ে উত্তম

কোনো এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে এসে প্রশ্ন করলেন, 'আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি?' রাসূল (সা.) বললেন: 'সময় মতো নামাজ পড়া।' তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়?' রাসূল (সা.) বললেন: 'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।' তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়?' রাসূল (সা.) বললেন: 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।'[৯১]

এতে বোঝা যায় পিতা-মাতার আনুগত্য এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা সন্তানের ওপর অপরিহার্য। বিভিন্ন সময়ে রাসূল (সা.) জিহাদের চেয়েও পিতা-মাতার সেবার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে জিহাদে যাবার অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন: 'তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত?' সে বললো: 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন: 'তাহলে ঐ দু'জনকে নিয়েই জিহাদ করো।' অর্থাৎ পিতা-মাতার সেবা করাই তোমার জিহাদ।

মুসলিম শরীফের আরেক বর্ণনায় হাদিসটা এরকম: এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললো: 'আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদের অংগীকার দিতে চাই এবং এ দ্বারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরষ্কার লাভ করতে চাই।' রাসূল (সা.) বললেন: 'তোমার পিতা-মাতা কেউ কি বেঁচে আছে?' সে বললো: 'বরং দু'জনই বেঁচে আছেন।' রাসূল (সা.) বললেন: 'তুমি কি আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের আশা করো?' সে বললো: 'হ্যাঁ।' রাসূল (সা.) বললেন: 'তাহলে তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার সহকারে জীবন যাপন করো।'[৯২]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললো: 'আমি হিজরতের অংগীকার করার জন্য আপনার কাছে এসেছি এবং পিতা-মাতাকে কাঁদতে দেখে এসেছি।' রাসূল (সা.) বললেন: 'তুমি তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেএ কাঁদিয়ে এসেছ, তেমনি তাদের মুখে হাসি ফুটাও।'[৯৩]

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললো: 'আমি জিহাদে যেতে চাই কিন্তু আমার সে সামর্থ্য নেই।' রাসূল (সা.) বললেন: 'তোমার মা-বাবা কেউ কি বেঁচে আছে?' সে বললো: 'আমার মা আছে।' রাসূল (সা.) বললেন: 'তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণের মধ্যে দিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করো। এটা করলেই তুমি হাজি, ওমরাকারী ও জিহাদকারীরূপে গণ্য হয়ে যাবে।'[৯৪]

তালহা ইবন মুয়াবিয়া সালামি (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললাম: 'হে রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চাই।' তিনি বললেন: 'তোমার

---

৯১. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং-৫৫৩৭

৯২. হাফেজ ইমাম আবু মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন, *আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব*, অনু. হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক (ঢাকা: হাসনা প্রকাশনী, ২০০২), খ. ৩, হাদীস নং-১২৫২

৯৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৫৩

৯৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৫৫

মা কি জীবিত?' আমি বললাম: 'জী, হ্যাঁ।' রাসূল (সা.) বললেন: 'তার পায়ের কাছে সব সময় বসে থাকো। কেননা ওখানেই জান্নাত রয়েছে।'[৯৫]

পিতা-মাতার সেবা সন্তানের জন্য অপরিহার্য

সৃষ্টিকর্তা হিসেবে যেমন আল্লাহর কোনো শরীক নেই, জন্মদাতা হিসেবে পিতা-মাতার কোনো শরীক নেই। পিতা-মাতার সেবা সন্তানের ওপর অপরিহার্য।

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ •

অর্থ: আমরা মানুষকে অসিয়ত (নির্দেশ) করেছি তার বাবা-মার সাথে উত্তম আচরণ করতে। কারণ, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং শোকরগুজার হও আমার প্রতি, আর তোমার বাবা-মার প্রতি। তোমাদের ফিরে আসতে তো হবে আমারই কাছে।[৯৬]

এখানে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সন্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا •

অর্থ: আমি মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছি।[৯৭]

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ •

অর্থ: প্রভু! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও, আমার আব্বা-আম্মাকে ক্ষমা করে দিও আর মুমিনদের ক্ষমা করে দিও।[৯৮]

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ •

অর্থ: আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে মাফ করে দাও।[৯৯]

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ •

অর্থ: আমার কোনো শরীক আছে বলে জানা না থাকা সত্ত্বেও তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শরীক বানাতে পীড়াপীড়ি করে তবে তুমি তাদের সে কথা মেনে নিও না। অবশ্য পৃথিবীর জীবনে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে যেয়ো। আর অনুসরণ করো তাদের পথ যারা আমার অভিমুখী হয়েছে।[১০০]

---

৯৫. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৫৬
৯৬. আল কুর'আন, ৩১: ১৪
৯৭. আল কুর'আন, ২৯: ৮
৯৮. আল কুর'আন, ১৪: ৪১
৯৯. আল কুর'আন, ৭১: ২৮
১০০. আল কুর'আন, ৩১: ১৫

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ •

অর্থ: সে বলে: আমার প্রভু! আমাকে তৌফিক দাও, আমি যেনো তোমার সে সব নিআমতের শুকরিয়া আদায় করি, যা তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে দান করেছো। আর আমাকে এমন শুদ্ধ-সুন্দর আমল করার তৌফিক দাও– যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আমার জন্যে আমার সন্তানদের কর্তব্য পরায়ণ বানিয়ে দাও। আমি তোমারই দিকে এসেছি আর আমি তোমার প্রতি আত্মসমর্পণ কারীদেরই একজন।[১০১]

অর্থাৎ আমাকে এমন সৎ কাজ করার তৌফিক দান করো যা তোমার বিধান অনুযায়ী হবে এবং তোমার কাছে গৃহিত হবে। কোনো কাজ যদি দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে খুব ভালোও হয়, কিন্তু তাতে যদি আল্লাহর আনুগত্য না করা হয়, তাতে কোনো লাভ নেই। অপরদিকে কোনো কাজ যদি শরিয়াহ অনুযায়ী হয় এবং তার বাহ্যিক রূপ তাকে ভেতর থেকে শূণ্য করে দেয়, তা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে গৃহিত হবে না।

পিতা মাতার মৃত্যুর পর করণীয়

পিতা মাতা সন্তান লালন-পালন এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রচুর কষ্ট করেন এবং দিন রাত্রি তত্ত্বাবধান করেন। পিতা মাতা এ শব্দ দু'টির সাথে অনেক আদর স্নেহ ও ভালোবাসা জড়িয়ে রয়েছে। যাদের পিতা মাতা ইন্তেকাল করেছেন তারাই বুঝেন পিতা মাতা কতো বড় সম্পদ। পিতা মাতার মৃত্যুর পরও সন্তানের কিছু করণীয় রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মৃত মা-বাবার জন্য কী ধরনের আমল করা যাবে এবং যে আমলের সওয়াব তাদের নিকট পৌঁছবে তা উল্লেখ করা হলো:

বেশী বেশী দু'আ করা: মা বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সন্তান মা বাবার জন্য বেশি বেশি দু'আ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কী দু'আ করতে হবে তাও শিখিয়ে দিয়েছেন। আল কুর'আনে মহান আল্লাহ বলেন:

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا •

অর্থ: আমার প্রভু! তাদের প্রতি রহম করো, যেভাবে শৈশবে তারা (দয়া, মায়া ও কোমলতার পরশে) আমাকে লালন পালন করেছে।[১০২]

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ •

অর্থ: আমাদের প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও আর আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে সেইদিন, যেদিন অনুষ্ঠিত হবে হিসাব।[১০৩]

এছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার বিশেষ নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا •

১০১. আল কুর'আন, ৪৬: ১৫

১০২. আল কুর'আন, ১৭:২৪

১০৩. আল কুর'আন, ১৪:৪১

অর্থ: আমার প্রভু! তুমি ক্ষমা করে দাও আমাকে, আমার বাবা-মাকে আর মুমিন হয়ে যারা আমার ঘরে প্রবেশ করবে তাদেরকে এবং সব মুমিন পুরুষ ও নারীকে। যালিমদের তুমি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বাড়িয়ে দিয়োনা।[১০৪]

মা-বাবা এমন সন্তান রেখে যাবেন যারা তাদের জন্য দু'আ করবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩ টি আমল বন্ধ হয় না:
ক. সদকায়ে জারিয়া
খ. এমন জ্ঞান-যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়
গ. এমন নেক সন্তান- যে তার জন্য দু'আ করে।[১০৫]

দান-সাদকাহ করা: আয়েশা (রা.) বলেন: ''জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার মা হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেছেন। তাই কোনো অসিয়ত করতে পারেন নি। আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে দান-সাদকা করতেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকা করলে তিনি কি এর সাওয়াব পাবেন? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই পাবেন।''[১০৬]

মা-বাবার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন: মা বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি তাদের কোনো মানতের সিয়াম কাযা থাকে, সন্তানরা তাদের পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করলে তা আদায় হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ''যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমতাবস্থায় যে তার ওপর রোজা ওয়াজিব ছিল। তবে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিসগণ রোযা রাখবে।''[১০৭]

অধিকাংশ আলেমগণ এ হাদীসটি শুধুমাত্র ওয়াজিব রোযা বা মানতের রোযার বিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাদের পক্ষ থেকে নফল সিয়াম রাখার পক্ষে দলীল নেই।

হজ্জ বা উমরাহ করা: মা বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ বা উমরাহ করলে তা আদায় হবে এবং তারা এতে উপকৃত হবেন। জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আগমণ করে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন কিন্তু তিনি হজ্জ সম্পাদন না করেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ''তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ কর। তোমার কি ধারণা যদি তোমার মার ওপর ঋণ থাকতো তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? সুতরাং আল্লাহর জন্য তা আদায় কর। কেননা আল্লাহর দাবী পরিশোধ করার অধিক উপযোগী''[১০৮]

তবে মা-বাবার পক্ষ থেকে যে লোক হজ্জ বা উমরাহ করতে চায় তার জন্য শর্ত হলো সে আগে নিজের হজ্জ-ওমরাহ করতে হবে।

মা-বাবার পক্ষ থেকে কুরবানী করা: আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এমন একটি শিংযুক্ত দুম্বা উপস্থিত করতে নির্দেশ দিলেন, যার পা কালো, চোখের চতুর্দিক কালো এবং পেট কালো।

---

১০৪. আল কুর'আন, ৭১:২৮
১০৫. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০১৭), পৃ. ৪৯, হাদীস নং-৩৮
১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯, হাদীস নং-৩৯
১০৭. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৫২
১০৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৮৫২

অতঃপর তা কুরবানীর জন্য আনা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আয়েশা (রা.) কে বললেন, হে আয়েশা! ছুরি নিয়ে আস, তারপর বললেন, তুমি একটি পাথর নিয়ে তা দ্বারা এটাকে ধারালো কর। তিনি তাই করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ছুরি হাতে নিয়ে দুম্বাটিকে শুইয়ে দিলেন। পশুটি যবেহ্ করার সময় বললেন, বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ তুমি এটি মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর এবং সকল উম্মাতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে কবুল কর"। এভাবে তিনি তা দ্বারা কুরবানী করলেন।[১০৯]

মা-বাবার অসিয়ত পূর্ণ করা: মা বাবা জীবিত অবস্থায় অনেক লোকের সংগে বিভিন্ন ব্যাপারে ওয়াদা করে থাকতে পারেন। মৃত্যুর সময় কিছু অসিয়ত করতে পারেন। তাঁদের ইন্তেকালের পর সন্তানদেরকে তাঁদের কৃত ওয়াদাসমূহ ও অসিয়ত পূরণ করতে হবে। রাশীদ ইবন সুয়াইদ আসসাকাফী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললাম হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা একজন দাসমুক্ত করার জন্য অসিয়ত করে গেছেন। আর আমার নিকট কালো একজন দাসী আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাকে ডাকো, সে আসলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার রব কে? উত্তরে সে বলল, আমার রব আল্লাহ। আবার প্রশ্ন করলেন আমি কে? উত্তরে সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসুল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও; কেন না সে মু'মিনা।[১১০]

মা-বাবার বন্ধুদের সম্মান করা: পিতা মাতার মৃত্যুর পর পিতা মাতার বন্ধুদের সাথে সুন্দর আচরণ করা কর্তব্য। তাঁদের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করতে হবে। বিভিন্ন প্রশ্নের পরামর্শ সময় তাঁদেরকে শরীক করা এবং সবসময় শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁদের সুন্দর আচরণ করা আবশ্যক। আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একবার মক্কার পথে চলার সময় আব্দুল্লাহ (রা.) এর এক বেদুঈন এর সাথে দেখা হলে তিনি তাকে সালাম দিলেন এবং তাকে সে গাধায় চড়ালেন, যে গাধায় আব্দুল্লাহ (রা.) উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর (আব্দুল্লাহ) মাথায় যে পাগড়িটি পড়া ছিলো তা তাকে প্রদান করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (রহ.) বললেন, তখন আমরা আব্দুল্লাহকে বললাম: আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক! এরা গ্রাম্য মানুষ: সামান্য কিছু পেলেই এরা সন্তুষ্ট হয়ে যায়–(এতসব করার কি প্রয়োজন ছিলো?) উত্তরে আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, তার পিতা, (আমার পিতা) উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) এর বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি "পুত্রের জন্য পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভাল ব্যবহার করা সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ।"[১১১]

মা-বাবার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা: হযরত আবু উসাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমরা রাসূল (সা.) এর কাছে বসেছিলাম। এমতাবস্থায় বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এলো। সে বললো, হে রাসূলুল্লাহ! আমার মা বাবার মৃত্যুর পর কি তাদের সেবা করার কোনো সুযোগ অবশিষ্ট থাকে? রাসূল (সা.) বললেন: হ্যাঁ। মা বাবার জন্য দু'আ করা, তাঁদের মাগফিরাত (গুনাহ মাফ চাওয়া), তাঁদের কৃত ওয়াদা পালন করা, যে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের

১০৯. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২০৩

১১০. সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস নং-১৮৯

১১১. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০, হাদীস নং-৪০

সাথে তারা সুসম্পর্ক রক্ষা করতেন, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাঁদের বন্ধু বান্ধবের প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা।[১১২]

ঋণ পরিশোধ করাঃ মা-বাবার কোন ঋণ থাকলে তা দ্রুত পরিশোধ করা সন্তানদের ওপর বিশেষভাবে কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঋণের পরিশোধ করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ''মুমিনন ব্যক্তির আত্মা তার ঋণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যায়; যতক্ষণ না তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়।"[১১৩]

কাফফারা আদায় করাঃ মা-বাবার কোনো শপথের কাফফারা, ভুলকৃত হত্যাসহ কোনো কাফফারা বাকী থাকলে সন্তান তা পূরণ করবে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কসম খেয়ে শপথ করার পর তার থেকে উত্তম কিছু করলেও তার কাফফারা অদায় করবে।"[১১৪]

এ বিধান জীবিত ও মৃত সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। দুনিয়ার বুকে কেউ অন্যায় করলে তার কাফফারা দিতে হবে। অনুরূপভাবে কেউ অন্যায় করে মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফফারা প্রদান করবেন।

ক্ষমা প্রার্থনা করাঃ মা-বাবার জন্য আল্লাহর নিকট বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করা গুরুত্বপূর্ণ আমল। সন্তান মা-বাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর পর কোনো বান্দাহর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে হে আমার রব! আমি তো এতো মর্যাদার আমল করিনি, কিভাবে এ আমল আসলো? তখন বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় এ মর্যাদা তুমি পেয়েছো।[১১৫]

মা-বাবার ভাল কাজসমূহ জারী রাখাঃ মা-বাবা যেসব ভাল কাজ অর্থাৎ মসজিদ তৈরী করা, মাদরাসা তৈরী করা, দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী সহ, কাউকে মাসিক বা বছরে নির্দিষ্ট দান করে যেতেন, এই ধরনের কাজগুলো সন্তান হিসাবে তা যাতে অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থা করা। কেননা এসব ভাল কাজের সওয়াব তাদের আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে। যে ব্যক্তি ইসলামের ভাল কাজ শুরু করল, সে এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে। অথচ তাদেরও সওয়াব থেকে কোনো কমতি হবে না।

কবর যিয়ারত করাঃ সন্তান তার মা-বাবার কবর যিয়ারত করবে। এর মাধ্যমে সন্তান এবং মা-বাবা উভয়ই উপকৃত হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, অতঃপর মুহাম্মাদের মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর, কেননা তা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[১১৬]

কবর যিয়ারত কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করে করা যাবে না।

---

১১২. হাফেজ ইমাম আবু মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন, *আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব*, অনু. হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক (ঢাকা: হাসনা প্রকাশনী, ২০০২), খ. ৩, পৃ. ৯, হাদীস নং-১২৬৭

১১৩. আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, সুনান ইবনে মাজা, অনু. মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০), হাদীস নং-২৪১৩

১১৪. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৩৬০

১১৫. আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-৩৬

১১৬. আবু ঈসা তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং-১০৫৪

ওয়াদা করে গেলে তা বাস্তবায়ন করাঃ মা-বাবা কারো সাথে কোনো ভাল কাজের ওয়াদা করে গেলে বা এমন ওয়াদা যা তারা বেঁচে থাকলে করে যেতেন, সন্তান যথাসম্ভব তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে।

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا •

অর্থ: অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, কারণ অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত চাওয়া হবে।[১১৭]

কোনো গুনাহের কাজ করে গেলে তা বন্ধ করাঃ মা-বাবা বেচে থাকতে কোনো গুনাহের কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তা বন্ধ করবে বা শরীয়াহ সম্মতভাবে সংশোধন করে দিবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এবং যে মানুষকে গুনাহের দিকে আহবান করবে, এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ গুনাহ তার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। অথচ তাদের গুনাহ থেকে কোনো কমতি হবে না।[১১৮]

মা-বাবার পক্ষ থেকে মাফ চাওয়াঃ মা বাবা বেঁচে থাকতে কারো সাথে খারাপ আচরণ করে থাকলে বা কারো ওপর যুলুম করে থাকলে বা কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে সন্তানরা মা বাবার পক্ষ থেকে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিবে অথবা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিবে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা কি জান নিঃস্ব ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নাই সে হলো গরীব লোক। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো গরীব যে, কিয়ামতের দিন সালাত, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে লোকের মাল খেয়েছে, সে লোকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে সেদিন তার নেক আমল নামা দিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১১৯]

সুতরাং এ ধরনের নিঃস্ব ব্যক্তিকে মুক্ত করার জন্য তার হকদারদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া সন্তানের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

---

১১৭. আল কুর'আন, ১৭:৩৪

১১৮. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৯৮০

১১৯. আবু ঈসা তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪২৮

আল কুর'আনে সন্তান সন্ততি

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের যেএ কর্তব্য আছে, তেমনি সন্তানের প্রতিও পিতা-মাতার কর্তব্য আছে। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্যের ব্যাপারে ইসলামে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। পিতা-মাতা হলেন সন্তানের প্রথম অভিভাবক, প্রথম শিক্ষক। আর পরিবার তার প্রথম বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয় থেকে সে যা শিখবে, সেটার ওপর নির্ভর করবে তার ভবিষ্যৎ সুন্দর হওয়া না হওয়া। তাই এ ব্যাপারে পিতা-মাতাকে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে হবে। পিতা-মাতার অবহেলায় অনেক সন্তানকে অকালে ঝরে পড়তে দেখা যায়। অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায় তাদের জীবন বৃক্ষ। সন্তানের সুন্দর জীবন গঠনে মা-বাবার সচেতনতা ও আন্তরিকতার বিকল্প নেই। শুধু সন্তান জন্ম দিয়েই পিতা-মাতা হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং হতে হবে দায়িত্বশীল পিতা-মাতা। অন্যথায় দুনিয়াতে যেএ রয়েছে ভোগান্তি তেমনি আখেরাতেও রয়েছে অশান্তি ও জবাবদিহিতা। কারণ, সন্তান হলো পিতা-মাতার কাছে আল্লাহর আমানত। প্রতিটি জিনিসেরই পরিচর্চা প্রাথমিক পর্যায়েই করতে হয়। পিতা-মাতাই সন্তানকে ভালো বা মন্দের যে কোনোটির দিকে ধাবিত করেন।

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন: "প্রতিটি শিশু ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদি বানায়, খ্রিষ্টান বানায় অথবা অগ্নিপূজক বানায়।"[১২০]

সন্তানদের লালন-পালন বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সমাজের উন্নতি ও জাতির ভবিষ্যত শিশুদের শিক্ষা ও লালন পালনের ওপর নির্ভর করে। শিশুরা মানব সমাজের সম্পদ। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। আর শিক্ষার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় শৈশব। শিশুরা যে কোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। গবেষকগণ বলেছেন, 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।'[১২১]

উমর ইবনে আবু সালামা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিপালনে ছিলাম। একবার (বড় পাত্রে) খাবার সময় আমার হাত পাত্রে এদিক ওদিক ঘুরছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে বাছা! খাবার সময় বিসমিল্লাহ পড়বে। ডান হাতে খাবে। নিজের দিক থেকে খাবে।' রাবি বলেন, 'এরপর থেকে এটি আমার স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।'[১২২]

শিশুদের ধ্যান-ধারণা পবিত্র। অনুভূতি কোমল ও স্বচ্ছ। সুতরাং শৈশব থেকেই শিশুর আকিদা-বিশ্বাস ও আখলাক-চরিত্রকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করতে হবে। ইসলাম মমত্ববোধ, দায়িত্ববোধ ও পরকাল অবলম্বন-এ তিনভাবে পিতা-মাতাকে সন্তানের সহিহ তারবিয়াতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। এ তিন চিন্তার সম্মিলনে যদি সন্তানকে লালন-পালন করা হয় তাহলে সন্তানের জীবন হবে অতুলনীয়।

প্রাচীন কাল থেকে নিয়ে এ আধুনিক কাল পর্যন্ত সন্তানের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা বশত দুটি পরস্পর বিরোধী চরম নীতির অনুসৃতি দেখা যায়। একটি হলো সন্তান হত্যার নীতি। আর অপরটি হলো সন্তানের প্রতি সীমাহীন প্রীতি। এ দুইটিই প্রান্তিকতা।

---

১২০. ইমাম বুখারী, সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৫৮

১২১. মুহাম্মদ আবদুর রহমান, *সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা: পিতা-মাতার আকুলতা ও ব্যাকুলতা* (মাসিক আল কাউসার, অক্টোবর ২০১৫), লিংক: https://www.alkawsar.com>article

১২২. ইমাম বুখারী, সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং-৫৩৭৬

প্রথমটির মধ্যে মাত্রাগত তারতম্য অনুযায়ী নিম্নোক্ত কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত:

০১. সন্তান হত্যা করা, বলি দেয়া, উৎসর্গ করা।
০২. কন্যা সন্তান হত্যা করা, জীবন্ত কবর দেয়া।
০৩. গর্ভপাত করা।
০৪. সন্তান বিক্রি করে দেয়া।
০৫. অনাবশ্যক জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা।
০৬. সন্তানের প্রতিপালনে যত্নশীল না হওয়া।
০৭. রোগ ব্যাধিতে চিকিৎসা না করা। সুস্থ রাখার ব্যবস্থা না করা।
০৮. শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখা।

দ্বিতীয় প্রকার চরম পন্থার মধ্যে রয়েছে:

০১. সন্তানের বৈষয়িক (উন্নতির) চিন্তায় স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনে গাফিল হয়ে যাওয়া।
০২. সন্তানের পরকালীন নাজাতের ব্যবস্থা না করে দুনিয়া গড়ার চিন্তায় বিভোর থাকা।
০৩. সন্তানকে প্রকৃত মুসলিম এবং আল্লাহর দাস না বানিয়ে দুনিয়ার গোলাম এবং অর্থ-সম্পদের দাস বানানো।
০৪. আল্লাহর পথে চললে এবং কাজ করলে বিপদ মুসিবত আসতে পারে, এ ভয়ে সন্তানকে আল্লাহর কাজ থেকে এবং আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখা, বিরত রাখা।
০৫. সন্তানের দুনিয়াবী কল্যাণ চিন্তায় পরকালীন কল্যাণের কথা ভুলে থাকা। সন্তানের প্রকৃত কল্যাণ চিন্তা না করা।[১২৩]

মূলত এ দুটি চরম পন্থার মাঝখানেই রয়েছে সন্তানের প্রকৃত কল্যাণ। সন্তানের ব্যাপারে একজন মুসলিমের কী নীতি অবলম্বন করা উচিত, সে সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশনা নিম্নরূপ:

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا •

অর্থ: ধন সম্পদ আর সন্তান সন্ততি তো এ দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য মাত্র। কিন্তু তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে উত্তম পুরস্কার এবং উত্তম প্রত্যাশা যোগ্য জিনিস হিসেবে টিকে থাকবে কেবল শুদ্ধ-সৎ কর্মসমূহ।[১২৪]

কুর'আনের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যা

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করে আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেন। আর আদম (আ.) এর একাকীত্ব দূর করতে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করেন। হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করার আরেকটি বিশেষ কারণ ছিলো তা হলো, মহান আল্লাহ তাঁদের ঔরসজাত সন্তান দ্বারা সমগ্র পৃথিবী কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে দিতে চেয়েছেন। আর সমস্ত মানব আল্লাহর একত্ব ঘোষণাপূর্বক দাসত্ব করবে। এ হলো আদম ও হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টির একান্ত উদ্দেশ্য।[১২৫]

অভাবের আশংকায় অনাগত সন্তানকে হত্যা করতে আল্লাহ স্পষ্ট নিষেধ করেছেন। কেননা, অনাগত সন্তানদের রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর তাঁর খাদ্য ভান্ডারে খাবারের হিসাব

১২৩. আবদুস শহীদ নাসিম, *কুরআন ও পরিবার* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৬) পৃ. ৪৪-৪৫
১২৪. আল কুর'আন, ১৮: ৪৬
১২৫. মিরাজ রহমান, *জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কী বলে ইসলাম* (প্রিয়.কম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮)

অকল্পণীয়। সন্তান-সন্ততি হচ্ছে মানব প্রজাতি-রক্ষার মাধ্যম। খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির অভাবের কারণে সংসারকে সচ্ছল করার নিয়তে, দৈহিক সৌন্দর্য রক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা কন্যা সন্তান জন্ম নেয়ার ভয়ে সন্তান হত্যা বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। তাহলে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

তবে বিশেষ প্রয়োজনে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জায়িয হতে পারে। একটি প্রয়োজন হচ্ছে, মায়ের জীবন বা স্বাস্থ্যের ওপর যদি রোগ বা প্রসবকালীন সংকটের দরুন হুমকি দেখা দেয়, তাহলে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সংকট বা হুমকির কথা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানা যাবে বা কোনো বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাবিদ তা বলে দেবে। আল্লাহ বলেছেন,

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ •

অর্থ: তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে হালাক হবার (ধ্বংসের) দিকে নিক্ষেপ করো না। ভালো কাজ করো, যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।[১২৬]

আরেকটি প্রয়োজন হচ্ছে, সন্তানদের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া কিংবা তাদের সঠিক লালন পালনের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হওয়ার আশংকা। যেএ, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের আবার গর্ভসঞ্চার হলে শিশুর পক্ষে তা ক্ষতিকর হতে পারে। তখন মায়ের দুধের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ফলে শিশু দূর্বল হয়ে পড়ে।

কুর'আন সন্তানদের হত্যা করা কবীরা বা বড় গুনাহ হিসেবে বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا •

অর্থ: তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। তাদের জীবিকার ব্যবস্থা আমি করবো, আর সে সাথে তোমাদেরও। তাদের হত্যা করা এক মহাপাপ।[১২৭]

ইসলাম এ মারাত্মক পাপ নির্মূল করার জন্য একদিকে মাতা-পিতার অন্তরে মানব জীবনের মর্যাদার গভীর অনুভূতি এবং সন্তানের কদর ও মূল্য সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে সন্তান হত্যাকে শিরকের মতো জঘণ্য গুনাহ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যেসব অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধেছে, এ আয়াতটি তার ভিত পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন যুগে দারিদ্র্য ভীতি শিশু হত্যা ও গর্ভপাতের কারণ হতো। আর আজ তা দুনিয়াবাসীকে তৃতীয় আরেকটি কৌশল অর্থাৎ গর্ভনিরোধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাটি তাকে অন্ন গ্রহণকারীদের সংখ্যা কমাবার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এমন সব গঠনমূলক কাজে নিজের শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োগ করার নির্দেশ দিচ্ছে সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী রিযিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ ধারাটির দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের স্বল্পতার আশংকায় মানুষের বারবার সন্তান উৎপাদনের সিলসিলা

১২৬. আল কুর'আন, ০২: ১৯৫

১২৭. আল কুর'আন, ১৭ : ৩১

বন্ধ করে দিতে উদ্যত হওয়া তার বৃহত্তম ভুলগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ ধারাটি মানুষকে এ বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, রিযিক পৌঁছবার ব্যবস্থাপনা তোমার আয়ত্বাধীন নয় বরং এটি এমন এক আল্লাহর আয়ত্বাধীন যিনি তোমাকে এ যমিনে আবাদ করেছেন। পূর্বে আগএকারীদেরকে তিনি যেভাবে রুজি দিয়ে এসেছেন তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দেবেন। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও একথাই বলে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা যতোই বৃদ্ধি হতে থেকেছে ঠিক সে পরিমাণে বরং বহুসময় তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ বেড়ে গিয়েছে। কাজেই আল্লাহর সৃষ্টি ব্যবস্থাপনায় মানুষের অযথা হস্তক্ষেপ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।[১২৮]

• قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থ: যারা বোকামি এবং অজ্ঞতার মধ্যে থেকে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে, তারা নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে পড়েছে।[১২৯]

সন্তান-সন্ততি আল্লাহর পরীক্ষা

সন্তান-সন্ততিকে ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

• إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্যে একটা পরীক্ষা। আর আল্লাহ এমন সত্তা– যাঁর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার।[১৩০]

সন্তান সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের অর্থ হলো, মানুষ তাদের ভালোবাসায় এমনভাবে যেন আবদ্ধ হয়ে না পড়ে যাতে সে দ্বীন ও ঈমানের দাবীসমূহ থেকে গাফিল হয়ে পড়ে। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা যদি দ্বীনের রাস্তায় অগ্রসর হওয়া এবং দ্বীনের খাতিরে কুরবানী প্রদানে বাধা প্রদান করে তাহলে তা হবে শত্রুতা। এ জন্য মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো সময়ই যেন তাদের প্রতি ভালোবাসা দ্বীনের প্রতি ভালোবাসার ওপর বিজয়ী না হতে পারে। আর তাদের কারণে মানুষ দ্বীনি ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে না পড়ে। হিজরতের পূর্বে কিছু মানুষ মক্কায় ঈমান এনেছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ সত্ত্বেও হিজরতকারী মুসলিমদের সাথে মদীনায় হিজরত করতে পারেননি। মুমিন হওয়া সত্ত্বেও হিজরতের সৌভাগ্য থেকে শুধুমাত্র এ জন্য বঞ্চিত ছিলেন যে, তারা স্ত্রী- সন্তানদের প্রতি অহেতুক ভালোবাসায় ফেঁসে গিয়েছিলেন এবং তা তাদেরকে মদীন গম থেকে বিরত রেখেছিলো এ সকল মুসলমান। হিজরতের মতো সৌভাগ্য থেকে এ জন্য বঞ্চিত ছিলেন যে, তারা সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রশ্নে সতর্ক ছিলেন না এবং সন্তানের ভালোবাসায় এমন মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যে, দ্বীনের ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পবিত্র করআন এ অর্থে সন্তানকে ফিতনা ও পরীক্ষা বলেও অভিহিত করেছে। একদিকে তাদের প্রতি প্রকৃতগত ভালোবাসার আবেগ অন্যদিকে দ্বীন ও ঈমানের দায়ী। তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন এবং তাদের অধিকার আদায়ের প্রতিও তাকিদ দেয়া হয়েছে। আবার সাথে সাথে এ সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছে যে, সন্তান পরীক্ষার মাধ্যম।[১৩১]

---

১২৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৭, পৃ. ১৩১-১৩২

১২৯. আল কুর'আন, ৬ : ১৪০

১৩০. আল কুর'আন, ৬৪ : ১৫

১৩১. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, *মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯৬) পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৪

যদি অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ফিতনা থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায় এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে তাদের প্রতি ভালোবাসার ওপর প্রাধাণ্য দেয়া যায়, তাহলে আল্লাহর কাছে রয়েছে বিরাট পুরস্কার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ •

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের অর্থ সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন (divert) না করে। যারা এমনটি করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত (losers)।[১৩২]

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ • إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ •

অর্থ: সেদিন (বিচারের দিন) অর্থ সম্পদ কাজে আসবে না, সন্তান-সন্ততিও নয়। সেদিন কল্যাণ লাভ করবে কেবলমাত্র সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে পারবে একটি পরিশুদ্ধ আত্মা (clean heart) নিয়ে।[১৩৩]

অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষের জন্য বিরাট একটি পরীক্ষা। এসব স্বার্থের জন্যেই অনেক ক্ষেত্রে ঈমানের দাবী পূরণ হয় না। এগুলোর জন্য মানুষের মাঝে ঈমানের দূর্বলতা প্রকাশ পায়। তারা পাপাচার ও নাফরমানিতে লিপ্ত হতেও দ্বিধা করে না। মানুষ এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়ে যে সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যায়। আর আল্লাহর স্বরণ থেকে গাফিল হয়ে যাওয়াটাই সমস্ত অকল্যাণের উৎস।

কিয়ামতের দিন মানুষের ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। বরং কাজে আসবে এমন প্রশান্ত চিত্ত একটি অন্তর যা কুফরি, শিরক ও নাফরমানি থেকে মুক্ত। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও প্রশান্ত অন্তরের সাথেই উপকারী হতে পারে। ধন শুধু তখনই উপকারী হবে যখন তা ঈমান ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে ব্যয় হবে। আর সন্তান-সন্ততিও তখনই উপকারী হবে যখন সন্তানরা ঈমান ও সৎ কর্মের শিক্ষা পাবে এবং তা কাজে লাগাবে।

অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা-আভা। সঠিক ও যথাযথভাবে এগুলোর ব্যবহার হলে পরকালে কল্যাণ লাভ হবে। না হয় এগুলোই ডেকে নিয়ে আসবে চূড়ান্ত বিপদ। কিছু সৎ কাজ মানুষের মৃত্যুর পরও চালু থাকে। যেএ, সুশিক্ষা প্রাপ্ত সৎ সন্তান, জ্ঞান বিতরণ ও জনকল্যাণমূলক কাজ। এসব কাজের সুফল পাওয়া যায় অনন্তকাল। মৃত্যুর পরও এর প্রতিফল চলমান থাকে। রাসূল (সা.) বলেছেন:

"আদম সন্তান যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার সব আমলে সমাপ্তি ঘটে, কেবল তিনটি আমল ছাড়া। সেগুলো হচ্ছে: ০১. সাদকায়ে জারিয়া বা চলমান দান। ০২. এমন জ্ঞান, যা থেকে লোকেরা উপকৃত হতে থাকে এবং ০৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে।"[১৩৪]

একজন মানুষের জন্য দীন পালন ও আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার মধ্যে অর্থ লোভ ও সন্তানদের মায়া-মমতা-ভালোবাসা অন্যতম। এ দুটোকে কেন্দ্র করেই

---

১৩২. আল কুর'আন, ৬৩ : ৯

১৩৩. আল কুর'আন, ২৬ : ৮৮-৮৯

১৩৪. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অনু: আ.স.ম. নূরুজ্জামান (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জানুয়ারি ২০১১) খ. , পৃ. হাদিস নং-১৬৩১

মানুষ বেশির ভাগ অপরাধ করে। সম্পদ ও সন্তানের ভালোবাসা যদি আল্লাহর আনুগত্যের সংগে হয়, তবে সেটা শুধু জায়িজই নয় বরং সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে এ ভালোবাসা যদি মানুষকে অন্যায় অসত্যের পথে নিয়ে যায়, তবেই তা পাপের কারণ হয়। তাই সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির চেয়েও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধকে প্রাধান্য দেয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

যার সন্তান হয় না সে জানে সন্তান আল্লাহর কাছে কত বড় নিয়ামত। নিঃসন্তান মায়ের ব্যাকুলতা অথবা সন্তান হারা মায়ের শোক কতই না কষ্টের। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে এ নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ • أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ •

অর্থ: মহাবিশ্ব এবং এ পৃথিবীর শাসন-কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনি তাই সৃষ্টি করেন, যা তিনি চান। তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে চান দান করেন পুত্র সন্তান। যাকে চান তিনি পুত্র-কন্যা উভয় সন্তানই দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা করে রাখেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান।[১৩৫]

শিশুরা কাদামাটির মতো। তাকে যে ছাঁচে ঢালা হবে, সে তাই হবে। ছোট বেলা থেকেই সন্তানদের সঠিক আদব ও তারবিয়াত প্রদানের প্রচেষ্টা চালানো পিতা-মাতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাসূল (সা.) বলেছেন: "উত্তম তারবিয়াত প্রদানের চেয়ে বড় আর কিছু নেই, যা মাতা-পিতা সন্তানের জন্য করতে পারে।" তিনি আরো বলেছেন: "তোমাদের সন্তানদের সম্মানিত করো। তাদের সুন্দর আদবসমূহ শিখিয়ে দাও।"[১৩৬]

এর বিপরীতে সন্তানদের গড়ে তুললে আল্লাহর আমানতের খিয়ানত হবে। আখিরাতে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সন্তানদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ না পালন করলে এবং সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে না তুললে শুধুমাত্র তাদের দু'আ থেকে বঞ্চিত হওয়া নয় বরং তাদের পথভ্রষ্টতার দায়দায়িত্বের অনেকাংশও এসে পড়বে পিতা-মাতার ওপর।

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন: কতক স্ত্রী তাদের স্বামীদেরকে এবং কতক সন্তান তাদের পিতা-মাতাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নেক আমল হতে দূরে সরিয়ে রাখে যা প্রকৃতপক্ষে শত্রুতাই বটে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, মক্কাবাসী কতক লোক ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল, কিন্তু স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের প্রেমে পড়ে হিজরত করেনি। অতঃপর যখন ইসলামের খুব বেশি প্রকাশ ঘটে তখন তারা হিজরত করে আল্লাহর নবী (সা.)-এর নিকট চলে যায়। গিয়ে দেখে যে, যাঁরা পূর্বে হিজরত করেছিলেন তাঁরা বহু কিছুর জ্ঞান লাভ করেছেন। তখন এ লোকদের মনে হলো যে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের শাস্তি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করলেন: তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা করো, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদেরকে ক্ষমা করো তবে জেনে রেখো

---

১৩৫. আল কুর'আন, ৪২: ৪৯-৫০

১৩৬. হাফেজ ইমাম আবু মুহাম্মদ ফকিউদ্দিন, *আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব*, অনু. হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক (ঢাকা: হাসনা প্রকাশনী, ২০০২), খ. ২, পৃ. ৩২০, হাদীস নং-১০৮৮

যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ এখন তোমরা তোমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ক্ষমা করে দাও, ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক থাকবে।[১৩৭]

আল্লাহ তা'য়ালা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন যে, এগুলো পেয়ে কে নাফরমানিতে জড়িয়ে পড়ছে এবং কে আনুগত্য করছে। আল্লাহ তা'য়ালার নিকট যে মহাপুরস্কার রয়েছে সেদিকে মানুষের খেয়াল রাখা উচিত। হযরত আবু বুরাইদাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) খুৎবাহ দিচ্ছিলেন এমন সময় হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হুসাইন (রা.) লম্বা লম্বা জামা পরিহিত হয়ে এসে পড়লেন। তাঁরা জামার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে বাধা লেগে লেগে পড়ছিলেন ও উঠছিলেন, এভাবে আসছিলেন। তাঁরা তো তখন শিশু! জামাগুলো লাল রঙয়ের ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টি তাঁদের ওপর পড়া মাত্রই তিনি মিম্বর হতে নেমে গিয়ে তাঁদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসলেন এবং নিজের সামনে বসিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল (সা.)-ও সত্য কথা বলেছেন, তা হলো: 'তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে পরীক্ষা।' এ দুই শিশুকে পড়ে উঠে আসতে দেখে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। তাই খুৎবাহ ছেড়ে এদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে হলো।"[১৩৮]

হযরত আশআস ইবনে কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: কিনদাহ গোত্রের প্রতিনিধি দলের মধ্যে শামিল হয়ে আমিও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে হাযির হলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার সন্তান-সন্ততি আছে কি?" আমি উত্তরে বললাম: "জী হ্যাঁ, আপনার খিদমতে হাযির হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হবার সময় আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। যদি তার স্থলে একটি বন্য জন্তু হতো তবে ওটাই আমার জন্যে ভালো ছিলো।" তিনি একথা শুনে বললেন: "না, না, এরূপ কথা বলো না। এরাই হলো চক্ষু ঠাণ্ডাকারী এবং এরা মারা গেলেও পুণ্য রয়েছে।" তারপর তিনি বললেন: "তবে হ্যাঁ, এরা আবার ভিরুতা ও দুঃখেরও কারণ হয়ে থাকে।"[১৩৯]

হযরত আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "সন্তান অন্তরের ফল বটে, কিন্তু আবার সন্তানই কাপুরুষতা, কৃপণতা ও দুঃখেরও কারণ হয়।" হযরত আবু মালিক আশআরি (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "শুধু ঐ ব্যক্তি তোমার শত্রু নয় যে, (সে কাফির বলে) তুমি (যুদ্ধে) তাকে হত্যা করো তবে ওটা হবে তোমার জন্যে সফলতা, আর যদি তুমি নিহত হও তবে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। বরং সম্ভবত: তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তোমার সন্তান, যে তোমার পৃষ্ঠ হতে বের হয়েছে। অতঃপর তোমার আর একটি চরম শত্রু হলো তোমার মাল, যার মালিক হয়েছে তোমার দক্ষিণ হস্ত।[১৪০]

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ • لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ •

---

১৩৭. ইমাদুদ্দীন ইব্নু কাসীর (র.), *তাফসীর ইব্নে কাসীর*, অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ২০০১), খ. ১৭, পৃ. ৫২৮

১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৯

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৯

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০

অর্থ: (হে নবী!) তাদের বলো: প্রকৃত ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত লোক তারা, যারা কিয়ামতের দিনের জন্যে নিজেদেরও ব্যর্থ করেছে এবং নিজেদের পরিবার বর্গকেও ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। জেনে রাখো, সেদিনের ধ্বংস আর ব্যর্থতাই চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট ধ্বংস আর ব্যর্থতা। সেদিন আগুন ওপর থেকে তাদের ছাতার মতো ঢেকে রাখবে, আর নিচে থেকেও। এ ভয়াবহ পরিণতি থেকে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করছেন: হে আমার দাসেরা! এ চূড়ান্ত ধ্বংস ও ব্যর্থতা থেকে নিজেদের বাঁচাও।[১৪১]

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ •

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানের ভিত্তিতে তাদের অনুগামী হয়েছে। আমি তাদের সন্তানদেরকে (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্রিত করে দেবো এবং তাদের আমল কিছুমাত্র হ্রাস করবো না।[১৪২]

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ •

অর্থ: আমার প্রভু! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তানদেরকেও। প্রভু, আমার দু'আ কবুল করো।[১৪৩]

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا •

অর্থ: আর যারা বলে, প্রভু! আমাদের স্ত্রী/স্বামী এবং আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দাও, আর আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের জন্যে অনুসরণযোগ্য বানিয়ে দাও।[১৪৪]

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন নাযিল করেছেন। তাতে সন্তানের তালীম-তারবিয়াত বিষয়েও পর্যাপ্ত নির্দেশনা রয়েছে। সে সঙ্গে রয়েছে আল্লাহর কিছু বিশিষ্ট বান্দার সন্তান-তারবিয়াতের বিস্ময়কর উদাহরণ। আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহপূর্বক এগুলো বর্ণনা করেছেন, যাতে সন্তানের ঈমান ও চরিত্রের ব্যাপারে তাঁদের মনে যে ব্যাকুলতা ও দায়িত্বসচেতনতা ছিলো, সবাই তা উপলব্ধি করতে পারে এবং কলিজার টুকরার জন্য নিজেদের মনেও সেটা ধারণ করতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দেখুন:

এক. হযরত লুকমান অত্যন্ত জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদের সূরা লুকমানে সে উপদেশগুলো বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ • يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ

১৪১. আল কুর'আন, ৩৯, ১৫-১৬
১৪২. আল কুর'আন, ৫২ : ২১
১৪৩. আল কুর'আন, ১৪ : ৪০
১৪৪. আল কুর'আন, ২৫ : ৭৪

يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ • يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ • وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ • وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ •

অর্থ: স্মরণ করো, লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল: "হে আমার পুত্র! শির্ক করো না আল্লাহ্‌র সাথে। কারণ, শির্ক তো একটা বিরাট যুলুম।" (লুকমান আরো বলেছিল:) "হে আমার পুত্র! কোনো ক্ষুদ্র বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় আর তা যদি থাকে কোনো পাথর খণ্ডের ভেতরে, কিংবা যদি থাকে মহাকাশে, অথবা যদি থাকে ভূ-গর্ভে, আল্লাহ্ তাও এনে হাজির করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব সূক্ষ্মদর্শী, গভীরভাবে অবহিত।" হে আমার পুত্র! "কায়িম করবে সালাত, আদেশ করবে ভালো কাজের, নিষেধ করবে মন্দ কাজ করতে এবং ধৈর্য ধারণ করবে বিপদ-মসিবতে। নিশ্চয়ই এটা মজবুত সংকল্পের কাজ। দম্ভ করে মানুষকে অবজ্ঞা করবে না, যমিনে ঔদ্ধত্যের সাথে চলাফেরা করবে না, কারণ আল্লাহ্ উদ্ধত দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর রাখবে সংযত। নিশ্চয়ই সবচাইতে অস্বস্তিকর আওয়ায হলো গাধার ধ্বনি।"[১৪৫]

দুই. হযরত নূহ (আ.) প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত তাঁর কাওমকে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। আস্তে জোরে, প্রকাশ্যে-গোপনে, জনতায়–নির্জনতায় বিভিন্নভাবে তাদের বুঝিয়েছেন। তবু অল্পসংখ্যক ছাড়া কেউ ঈমান আনেনি। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর কঠিন শাস্তি নেমে আসে- মহাপ্লাবন। আল্লাহর হুকুমে ঈমানদার সঙ্গীদের নিয়ে তিনি নৌকায় আরোহণ করলেন। আল্লাহ বলেন:

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ • وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ •

অর্থ: সে বলেছিল: 'তোমরা এতে আরোহণ করো। আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) এর চলতি এবং এর স্থিতি। আমার প্রভু অবশ্যি পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।' নৌযানটি তাদের নিয়ে চলছিল তরঙ্গের মধ্যে পর্বতের মতো। আর নূহ তার ছেলেকে ডেকে বলেছিল, যে (নৌযানে আরোহন না করে) পৃথক ছিলো: 'হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ করো, কাফিরদের সাথি হয়ে থেকে যেয়ো না।'[১৪৬]

অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ • قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ •

১৪৫. আল কুর'আন, ৩১: ১৩, ১৬-১৯

১৪৬. আল কুর'আন, ১১: ৪১-৪২

অর্থ: নূহ তার প্রভুকে ডেকে বলেছিল: 'আমার প্রভু! আমার ছেলে তো আমার পরিবারেরই একজন আর তোমার ওয়াদা তো সত্য এবং তুমি তো সব বিচারকের বড় ন্যায় বিচারক।' তিনি বলেছিলেন: 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারের সদস্য নয়। সে তো এক অসৎকর্ম। ফলে এমন বিষয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করো না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি যেনো জাহিলদের মতো কথা না বলো।'[১৪৭]

ছেলেকে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করার কী ঐকান্তিক চেষ্টা! অথচ তাঁকে ওহীর মাধ্যমে আগেই জানানো হয়েছিল যে, এ পর্যন্ত যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কাওমের আর কেউ ঈমান আনবে না। তবু শেষ চেষ্টাটা তিনি করেছেন। কেননা তাঁর নিশ্চিত জানা ছিলো, এ আযাবে যে ধ্বংস হবে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

তিন. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেছেন:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ • وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ • أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ •

অর্থ: যখন তার প্রভু তাকে বলেছিল: 'আত্মসমর্পণ করো।' সে বলেছিল: 'আমি আত্মসমর্পণ করলাম রাব্বুল আলামিনের উদ্দেশ্যে।' এ একই বিষয়ের অসিয়ত করেছিল ইবরাহিম তার সন্তানদের এবং (তার নাতি) ইয়াকুব (নিজের সন্তানদের)। (তারা বলেছিল:) 'হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন 'আদ্ দীন'। সুতরাং আমৃত্যু তোমরা মুসলিম (আল্লাহ্র অনুগত) হয়ে থাকবে।' তোমরা কি সাক্ষী (উপস্থিত) ছিলে, যখন হাজির হয়েছিল ইয়াকুবের মৃত্যু (সময়)? যখন সে তার সন্তানদের বলেছিল: 'আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে?' তারা বলেছিল: 'আমরা ইবাদত করবো আপনার ইলাহ্র এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাঈল আর ইসহাকের ইলাহ্র। তিনিই একমাত্র ইলাহ্। আমরা তাঁর প্রতি 'মুসলিম' (অনুগত-আত্মসমর্পিত) হয়ে থাকবো।'[১৪৮]

ইয়াকুব (আ.) নিজেও নবী। তাঁর পিতা হযরত ইসহাক (আ.)। চাচা হযরত ইসমাইল (আ.)। দাদা হযরত ইবরাহীম (আ.)। এটি নবী পরিবার এবং সকলেই বড় বড় নবী। এ থেকেই অনুমান করা যায়, তাঁর ছেলেদের ঈমান কী শক্তিশালী ছিলো এবং জীবনাচরণে সেটার কী গভীর প্রভাব পড়েছিল। এ সত্ত্বেও তিনি তাদের থেকে তাঁর মৃত্যুর পর ঈমানে অবিচল থাকার অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর এ তিনি কখন করেছেন? মৃত্যুক্ষণে যখন সাধারণ মানুষ হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কিংবা পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সেসময় তিনি ছেলেদের ভবিষ্যত-ঈমান নিয়ে ব্যস্ত। কারণ তাঁর কাছে ঈমানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই মৃত্যুর আগে (নিজের সাধ্য অনুযায়ী) আবারো তাকিদ করছেন।

ইয়াকুব (আ.) এর একে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল কোন প্রেরণাটি; দায়িত্ববোধ না মমত্ববোধ? নিঃসন্দেহে দুটোই। কারণ নবীর মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ আলাদা ধারায় প্রবাহিত হয় না।

---

১৪৭. আল কুর'আন, ১১: ৪৫-৪৬

১৪৮. আল কুর'আন, ২: ১৩১-১৩৩

সুতরাং পিতা-মাতার মনে সন্তানের শারীরিক প্রতিপালনের জন্য যে মমত্ব জাগে, চারিত্রিক ও ঈমানিক প্রতিপালনের জন্যও সেরকম মমত্ব জাগুক। সন্তানকে আগুন থেকে বাঁচাতে তারা যেএ ব্যাকুল হন, অন্যায় ও গোনাহ থেকে বিরত রাখতেও তেমনি ব্যাকুল হোক।[১৪৯]

১৪৯. মুহাম্মদ আবদুর রহমান, সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা: পিতা-মাতার আকুলতা ও ব্যকুলতা, প্রাগুক্ত।

একজন স্ত্রী যেমন স্বামী ছাড়া পরিপূর্ণ নন তেমনি একজন স্বামীও স্ত্রী ছাড়া পরিপূর্ণ নন। সৃষ্টিগতভাবেই মহান আল্লাহ এদের একজনকে অপরজনের সহায়ক এবং মুখাপেক্ষী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। একজন স্ত্রীর দায়িত্বে স্বামীর যেমন কিছু অধিকার আছে, তেমনি স্বামীর দায়িত্বেও স্ত্রীর কিছু অধিকার আছে।

একজন নর ও একজন নারীর বিবাহ সূত্রে একত্রিত হয়ে সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন যাপনেই বলা হয় দাম্পত্য জীবন। বিবাহের মাধ্যমে যে দাম্পত্য সম্পর্কের সূচনা হয় তা অটুট থাকা এবং আজীবন স্থায়ীত্ব লাভ করা ইসলামের কাম্য। যে সকল কারণে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয় সেগুলো দূর করার জন্য ইসলামি শরীয়ত বিভিন্ন বিধান ও নির্দেশনা দিয়েছে।

সাধারণত বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছন্ন হওয়ার পিছনে মৌলিক যে কারণগুলো থাকে সেগুলো হলো,

ক. স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হক যথাযথ আদায় না করা।
খ. একজন অন্যজনকে গুরুত্ব না দেওয়া।
গ. কথায়-কাজে দ্বিমত পোষণ করা।
ঘ. একে অন্যের প্রতি আস্থা না রাখা।

এ সকল কারণে এক সময় তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ চরমে পৌঁছে এবং দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং উভয়ের কর্তব্য হলো পরস্পরের হকগুলো যথাযথভাবে জানা এবং তা আদায় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।[১৫০]

দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও স্থায়িত্ব ও গভীরতা দানের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর একাত্মবোধ জাগ্রত হওয়ার জন্যে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীকে কতগুলো জরুরি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে। নির্দিষ্ট করে দিয়েছে উভয়ের জন্য কিছু কিছু অধিকার। সে অধিকারগুলো যেএ স্বামীর জন্য প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য স্ত্রীর জন্যও।

এখানে কতিপয় বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, সফল সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্যে যেগুলো একান্তই অপরিহার্য।

০১. সঠিক সাথী নির্বাচন

ইসলামে বিবাহের একটি বিশেষ লক্ষ্য হলো, নিরাপদ পারিবারিক বন্ধন গড়ে তোলা। তাই ইসলাম সঠিক সাথী নির্বাচনের জন্য বিশেষভাবে তাগাদা দিয়েছে। কারণ বিবাহের ভিত্তিটি যদি সঠিক হয় তাহলে পারিবারিক বন্ধনটিও সঠিক হবে।

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ •

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী নেই এবং যাদের স্ত্রী নেই, তাদের বিয়ে দিয়ে দাও, আর তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তারা যদি অভাবী হয়ে থাকে, তবে

১৫০. মাওলানা হাসিবুর রহমান, *দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও তিক্ততা* (মাসিক আল কাউসার, নভেম্বর ২০০৮), www.alkawsar.com/bn/article/1476, পৃ. ১

আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ্ উদার, জ্ঞানী।[১৫১] স্ত্রী পুরুষের জীবনের অর্ধাংশ। স্ত্রী যেএ নিয়ামতের উৎস হতে পারে আবার হতে পারে দুর্ভাগ্যের উৎস।

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: মহিলাদেরকে তাদের দ্বীনদারী, ধ্বনসম্পদ ও সৌন্দর্য দেখে বিবাহ করা হয়। তুমি দ্বীনদার পাত্রীকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিবে, তোমার হাত কল্যাণে পরিপূর্ণ হবে।[১৫২]

হাদীসে এসেছে: রাসূল (সা.) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।[১৫৩]

০২. বিবাহের মোহরানা

মোহরানা হলো বিবাহের জন্য স্বামীর প্রতি ফরয বিনিময় এবং বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার একটি জরুরী শর্ত। বিয়েতে মোহরানা অবশ্য দেয় হিসেবে ধার্য করার এবং তা যথারীতি আদায় করার জন্য ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'এায়া' গ্রন্থে মোহরানা বলতে কী বুঝায় তার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, "দেন মোহর বলতে এমন অর্থ-সম্পদ বুঝায়, যা বিয়ের বন্ধনে স্ত্রীর ওপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়। হয় বিয়ের সময়ই তা ধার্য হবে, নয় বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব হবে।"[১৫৪]

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا •

অর্থ: তাছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ সব নারীই তোমাদের জন্যে হারাম। তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের বিয়ে করতে পারো। এগুলো তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র দেয়া অবশ্য মান্য বিধান। উল্লেখিত নারীদের বাইরে যতো নারী আছে নিজেদের অর্থ-সম্পদের (মোহরানার) বিনিময়ে তাদের (যাকে চাও) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হলো। তবে বিবাহ বহির্ভূত যৌন লালসা তৃপ্ত করার জন্যে কিছুতেই নয়। (বিয়ে করে) তাদের থেকে তোমরা যে যৌন স্বাদ আস্বাদন করো, তার বিনিময়ে তাদের মোহরানা ফরয হিসেবে পরিশোধ করে দাও। মোহরানা নির্ধারণের পর তোমরা যদি কোনো বিষয়ে (নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে বেশি প্রদান করতে) রাজি হয়ে যাও, তাতে তোমাদের কোনো দোষ হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।[১৫৫]

ইসলাম নারী জাতির মর্যাদা উচ্চ করেছে। তাদেরকে মালিকানা লাভের অধিকার দিয়েছে। মোহরানা নারীর একটি অধিকার যা দ্বারা পুরুষ তাকে সম্মানিত করে। জাহেলিয়াতের যুগে

---

১৫১. আল কুর'আন, ২৪: ৩২

১৫২. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অনু. মুহাম্মাদ মূসা (ঢাকা বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৬), খ. ২, পৃ. ২৭২, হাদীস নং-১০২৪

১৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭, হাদীস নং-১১০০

১৫৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৩) পৃ.-১৪৬

১৫৫. আল কুর'আন, ৪: ২৪

মোহরানা ছাড়াই মেয়েদের বিয়ে সম্পন্ন হতো অথবা যদিও কিছু আদায় হতো মেয়েদের অভিভাবকরাই তা নিয়ে যেতো। ইসলামে যেএ মোহরানা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি এটি শুধু মেয়েদের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে অন্য কারো হক নেই।

সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি বিবাহ কর, মোহরানা হিসেবে একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও।[১৫৬]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে (মোহরানা দিয়ে) এক মহিলাকে বিয়ে করেন। নবী (সা.) তাকে বললেন: একটি বকরী জবাই করে হলেও ওয়ালীমার আয়োজন কর।[১৫৭]

শাফেয়ী মাযহাবের আলিমগণ মোহরানার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: বিয়ে হবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিনিময়মূলক একটি বন্ধন। বিয়ের পর একজন অপরজনের থেকে যেটুকু ফায়দা লাভ করে, তাই হচ্ছে অপরজনের ফায়দার বিনিময় বদল। আর মোহরানা হচ্ছে এক অতিরিক্ত ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'য়ালা তা স্বামীর ওপর অবশ্য দেয়া- ফরয করে দিয়েছেন এজন্য যে, বিয়ের সাহায্যে সে স্ত্রীর ওপর খানিকটা অধিকারসম্পন্ন মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে। অতএব বিয়ের আকদ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ই মোহরানা নির্ধারণ এবং তার পরিমাণের উল্লেখ একান্তই কর্তব্য।[১৫৮]

দেন মোহরের পরিমাণ কি হওয়া উচিত, ইসলামি শরীয়তে এ সম্পর্কে কোনো অকাট্য নির্দেশ দেয়া হয়নি, নির্দিষ্টভাবে কোনো পরিমাণও ঠিক করে বলা হয়নি। তবে একথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক স্বামীর-ই কর্তব্য হচ্ছে তার আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রীর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে উভয় পক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে শরীয়ত উভয় পক্ষকে পূর্ণ আযাদি দিয়েছে বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী যা লিখেছেন, তা নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে: রসূলুল্লাহ (সা.) মোহরানার কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেননি এ কারণে যে, এ ব্যাপারে লোকদের আগ্রহ-উৎসাহ ও ঔদার্য প্রকাশ করার মান কখনো এক হতে পারে না। বরং বিভিন্ন যুগে, দুনিয়ার বিভিন্ন স্তরের লোকদের আর্থিক অবস্থা এবং লোকদের রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, কার্পণ্য ও উদারতার ভাবধারায় আকাশ ছোঁয়া পার্থক্য হয়ে থাকে। বর্তমানেও এ পার্থক্য বিদ্যমান। এ জন্যে সর্বকাল যুগ-সমাজ স্তর, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রুচি-উৎসাহ নির্বিশেষে প্রযোজ্য হিসেবে একটি পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া বাস্তব দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেএ করে কোনো সুরুচিপূর্ণ দ্রব্যের মূল্য সর্বকালের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া যায় না- দেয়া অবৈজ্ঞানিক ও হাস্যকর। কাজেই এর পরিমাণ সমাজ, লোক ও আর্থিক মানের পার্থক্যের কারণে বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। তবে শুধু শুধু এবং পারিবারিক আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে এর পরিমাণ নির্ধারণে বাড়াবাড়ি ও দর কষাকষি করাও আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। তার পরিমাণ এমন সামান্য ও নগণ্যও হওয়া উচিত নয়, যা স্বামীর মনের ওপর কোনো শুভ প্রভাবই বিস্তার করতে সমর্থ হবে না। যা দেখে মনে হবে যে, মোহরানা আদায় করতে গিয়ে স্বামীকে কিছুমাত্র ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি, সেজন্য তাকে কোনো ত্যাগও স্বীকার করতে হয়নি। শাহ দেহলভীর মতে,

---

১৫৬. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৫, হাদীস-৪৭৭০

১৫৭. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অনু. মাওলানা মোজাম্মেল হক, মাওলানা আফলাতুন কায়সার (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২), খ. ৫, পৃ. ৪৫, হাদীস নং-৩৩৫৫

১৫৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

দেন-মোহরের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে এবং সেজন্য সে রীতিমত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে তার পরিমাণ এমনও হওয়া উচিত নয়, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।[১৫৯]

০৩. স্ত্রীর খোরপোশ সরবরাহের দায়িত্ব স্বামীর

স্ত্রীর শোভনীয় মান অনুপাতে খোরপোশ নিয়মিত সরবরাহ করা স্বামীরই কর্তব্য, যেন সে নির্লিপ্তভাবে স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে পারে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

অর্থ: সামর্থবানরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী নফকা দেবে, আর যার জীবিকা সীমিত, সে ব্যয় করবে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা থেকেই। আল্লাহ্ যা দান করেছেন তার চেয়ে বেশি বোঝা তিনি কোনো ব্যক্তির ওপর চাপান না। আল্লাহ্ কাঠিন্যের পর সহজতা দান করেন।[১৬০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেন:

"এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে যে, তারা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীদের জন্যে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য অনুপাতে বহন করবে। আর যাদের রিযিক নিম্নতর প্রয়োজন মতো কিংবা সংকীর্ণ, সচ্ছল নয়, তারা আল্লাহর দেয়া রিযিক অনুযায়ীই খরচ করবে। তার বেশি করার কোনো দায়িত্ব তাদের নেই।"

স্ত্রীদের জন্য খরচ বহনের কোনো পরিমাণ শরীয়তে নির্দিষ্ট আছে কিনা- এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বলেছেন:

"স্ত্রী ব্যয়ভারের কোনো পরিমাণ শরীয়তে নির্দিষ্ট নয়, বরং তা বিচার-বিবেচনার ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অবস্থা বিবেচনীয়। সচ্ছল অবস্থার স্ত্রীর জন্য সচ্ছল অবস্থার স্বামী সচ্ছল লোকদের উপযোগী ব্যয় বহন করবে। অনুরূপভাবে অভাবগ্রস্থ স্ত্রীর জন্য অভাবগ্রস্ত স্বামী ভরণ পোষণের নিম্নতম দায়িত্ব পালন করবে।"[১৬১]

হাদীসে এসেছে, "সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যাই খরচ করবে তার প্রতিদান দেয়া হবে, এমনকি যে গ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারাও।"[১৬২]

০৪. অধিকার সাম্য

স্বামী-স্ত্রীর মিলিত দাম্পত্য জীবনে পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও ইসলাম স্ত্রীকে পুরুষের দাসী-বাঁদী বানিয়ে দেয়নি। যদি কেউ তা মনে করে, তবে সে মারাত্মক ভুল করে।

---

১৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

১৬০. আল কুর'আন, ৬৫: ৭

১৬১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২

১৬২. ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আন নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, অনু. মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা, মাওলানা শামছুল আলম খান (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১), খ. ১, পৃ. ২২৩, হাদীস নং-২৯২

এ সম্পর্কে ইসলামের ব্যাপক আদর্শ হচ্ছে এ যে, মুসলিম জীবনের সকল সামাজিক সামগ্রিক ক্ষেত্রেই পারস্পরিক পরামর্শ ও যথাসম্ভব ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। এ পরামর্শ নেয়া-দেয়া কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই নয়, পারিবারিক জীবনের গণ্ডীতেও অপরিহার্য। আর তাতে পরামর্শ দেয়ার অধিকার রয়েছে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই এবং এ পরামর্শের ব্যাপারেও যার মত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হবে, তারই মত মেনে নেয়া হলো পরামর্শ ভিত্তিক সংস্থার লক্ষ্য। কুর'আন মাজিদে এ পর্যায়ে বলা হয়েছে:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ •

অর্থ: (স্বামীর) ওপর নারীর তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তার ওপর (তার স্বামীর)।[১৬৩]

এ আয়াতে পারিবারিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ও নিয়ম উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে এ যে, সকল ব্যাপারে ও বিষয়ে নারী পুরুষের সমান মর্যাদাসম্পন্ন। সকল মানবীয় অধিকারে নারী পুরুষেরই সমান, প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকের নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।[১৬৪]

০৫. পরস্পরকে সঠিক উপলব্ধি করা

দাম্পত্য জীবনে এটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিয়ের পর স্ত্রীর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর মেজাজ এবং স্বভাব প্রকৃতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা। একজন নারী সারাটি জীবনের জন্যে যাকে আপন করে নিয়েছে, যার সাথে সারাটি জীবন একত্রে কাটাতে হবে, যার সুখ হবে তার সুখ, যার দুঃখ হবে তার দুঃখ, যার সন্তোষ বিধান এবং মনোবাসনা পূরণ তার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব, সে ব্যক্তিটিকে সঠিকভাবে জানা এবং তার রুচি, তার মেজাজ তার স্বাভাব প্রকৃতি যথার্থভাবে উপলব্ধি করা তার জন্যে অপরিহার্য। কারণ স্বামীকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে, তার রুচি ও স্বভাব প্রকৃতি বুঝতে না পারলে তাকে সন্তুষ্ট করা, তার মনের মতো করে নিজেকে গড়ে তোলা এবং নিজের কর্মতৎপরতায় তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো কোনো নারীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে যদি কোনো নারী ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, তবে তাদের দাম্পত্য জীবনে ঘুণে ধরা অসম্ভব কিছু নয়।

স্বামীকে উপলব্ধি করার জন্যে স্ত্রীকে সদা সচেতন থাকতে হবে। এ সচেতনতা সবসময় অব্যাহত রাখতে হবে। স্বামীর রুচি ও মেজাজ প্রকৃতি সম্পর্কে স্ত্রী যখন যতোঁকু উপলব্ধি করবে, তখনই নিজের রুচি ও মেজাজকে পরিবর্তন করে স্বামীর রুচি ও মেজাজের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর এ কাজ অব্যাহতভাবে করে যেতে হবে এবং ধীরে ধীরে নিজেকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করতে হবে যে, স্বামীর ইচ্ছাই হবে তার ইচ্ছা, স্বামীর রুচিই হবে তার রুচি।

স্বামীর স্বভাব ও রুচিতে যদি এমন কিছু থাকে, যা তার অপছন্দনীয়, তবে সরাসরি তার প্রতিবাদ করা ঠিক নয়। হাঁ স্বামীর মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যা ইসলামের দৃষ্টিতে অসমর্থনীয় ও অপছন্দীয়, তবে স্ত্রীকে অতিশয় হিকমত ও কৌশলের সাথে তা সংশোধন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর উভয়ের মধ্যে যদি প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক হয় অতি নিবিড় মধুময়, তবে একজন দীনদার মহিলার পক্ষে তার স্বামীকে সংশোধন করা মোটেও কঠিন নয়।

---

১৬৩. আল কুর'আন, ২: ২২৮

১৬৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০২

এমনকি স্বামীর কুরুচি এবং কুস্বভাবের সংশোধন করাও তখন স্ত্রীর জন্যে কোনো কঠিন কাজ হয়না।

স্ত্রীকে তার স্বামীর নিকট মুক্ত ও খোলা হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। স্বামী ও তার মধ্যে কোনো বিষয়ে কোনো প্রকার আড়াল থাকবে না। স্বামীর নিকট তাকে হতে হবে আয়নার মতো। স্বামী যেনো তার আন্তরিকতা, সততা, নেক নিয়্যত ও নিষ্কলুষ জীবনকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই স্ত্রীর চিন্তা, কথা ও কাজ দ্বারা এমন কিছু প্রকাশ পেতে পারবে না যার দ্বারা স্বামীর অন্তরে সামান্যতম সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হতে পারে।

ঠিক স্বামীর ওপরও এ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে যে, তিনি স্ত্রীকে পুরোপুরি উপলব্ধি করবেন। ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রীর স্বভাব চরিত্রে কোনো কিছু ধরা পড়লে স্বামীর উচিত তাকে নসীহত করা। স্বামী আন্তরিকভাবে নসীহত করলে স্ত্রী সংশোধন হয়ে যেতে পারে।

মোটকথা, স্বামী স্ত্রী উভয়েই একে অপরকে ভালোভাবে জানতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে একে অপরের হৃদয় একে। একজনকে আরেকজনের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে স্ত্রীর দায়িত্ব একটু বেশী। আর এ ব্যাপারে সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে ত্যাগ বা উৎসর্গ। অর্থাৎ- একে অপরের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপারে পরস্পরের মেজাজ ও ইচ্ছা অভিরুচির কতোঁা গ্রহণ বর্জন করতে পারলেন সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মনে রাখবেন, এ বিষয়টির সফলতা দাম্পত্য জীবনের সফলতার ভিত্তি। আর এ বিষয়টির ব্যর্থতা জীবনের ব্যর্থতার সূত্র।

০৬. নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বরণ করা

দাম্পত্য জীবনের সফলতার আরেকটি শর্ত হচ্ছে, একে অপরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বরণ করা। স্বামী স্ত্রীকে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নেবে। স্ত্রীও স্বামীকে বরণ করে নেবে তার হৃদয় ভরে।

মানুষ হিসেবে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কিছু দোষ ত্রুটি থাকতে পারে। অথবা স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে যা স্বামীর পছন্দনীয় নয় এবং স্বামীর মধ্যেও এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে যা স্ত্রীর পছন্দনীয় নয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছেন। এরকম দুর্বলতা সাধারণত নারীদের মধ্যেই একটু বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার সাথে সাথে তাদের মধ্যে কিছু গুণ যে পাওয়া যায় না তা নয়। আল্লাহ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি উপেক্ষা (over look) করার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ একমাত্র এ নীতির মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا •

অর্থ: তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সুন্দর চমৎকার আচরণ করো। ভালোভাবে বসবাস করো। যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করো না, কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[১৬৫]

১৬৫. আল কুর'আন, ৪:১৯

অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয় অথবা তার মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকে যে জন্য স্বামী তাকে অপছন্দ করে তাহলে এক্ষেত্রে স্বামীর তৎক্ষণাৎ হতাশ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হওয়া উচিত নয়। স্বামীকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা, অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী সুন্দর না কিন্তু তার মধ্যে অন্যান্য এমন কিছু গুনাবলী থাকে, যা দাম্পত্য জীবনে সুন্দর সুখের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

অন্য একটি হাদিসে এসেছে,

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপর অংশের হাড়। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তা বাঁকা হতেই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।[১৬৬] অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও স্বামীর খুঁটিনাটি দুর্বলতা উপক্ষো করা উচিত এবং তার অন্যান্য গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

এভাবে দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রী উভয়ই একে অপরের সামান্য দোষত্রুটি উপেক্ষা করে সৎ গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। একজনের অন্তরে আরেকজনের জন্যে কোনো প্রকার ঘৃণা, জিদ ও উপেক্ষা থাকা কোনো অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তাতে দাম্পত্য জীবন দুঃখ ও বিষাদে ভরে উঠে।

দাম্পত্য জীবনকে মধুময় করার জন্যে উভয়েরই দায়িত্ব হচ্ছে একে অপরকে একান্ত আপন করে নেয়া। তাদের সম্পর্ক হবে একান্ত আন্তরিক ও একনিষ্ঠ। একের অন্তরে অপরের প্রতি কোনো প্রকার বিতৃষ্ণা থাকবে না। থাকবে কেবল ভালোবাসার আবেগ আর হৃদয়ের টান।

০৭. পারস্পরিক সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য এটাও একটি জরুরি শর্ত। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর যে দাম্পত্য জীবন এবং যে ছোট্ট সংসার গড়ে উঠে, তাতে তাদের দু'জনের মধ্যে সমঝোতা অপরিহার্য। দুটি ভিন্ন পরিবেশের দু'জন লোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে জীবন যাপন শুরু করে। দুটি ভিন্ন পরিবেশে তারা গড়ে উঠেছে, লালিত পালিত হয়েছে এবং শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছে। সুতরাং উভয়ের মেজাজ প্রকৃতি ও আচরণে কিছুটা পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ দু'জন লোককে একই ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হয়নি। তাছাড়া পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিগত ভিন্নতা একটি সত্য ও বাস্তব জিনিস। সুতরাং একজনের জন্যে আরেকজনের কিছুটা ত্যাগ ও কুরবানী/তীতিক্ষা করা উচিত। একজনের রুচি প্রকৃতি ও আচার আচরণ আরেকজনের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং তারটা মেনে নেয়ার মতো মানসিকতা রাখতে হবে। একজনের চিন্তা আরেকজনের চিন্তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। এভাবে কিছুটা 'লেনদেন' নীতির ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে একটি স্থায়ী নিঃস্বার্থ সমঝোতা গড়ে নিতে হবে। এ ব্যাপারে স্ত্রীকে অধিক ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ স্বামীর সঙ্গে মিলে মিশে সমঝোতা করে থাকার ব্যাপারে স্ত্রীর দায়িত্বই অধিক। তবে স্বামীরও অনেক কর্তব্য রয়েছে। মোটকথা, উভয়েরই এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করা উচিত।

---

১৬৬. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, অনু. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮২), খ. ৫, পৃ. ৭৭, হাদীস নং-৪৮০৪

কিন্তু সমঝোতার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। স্বামী স্ত্রী উভয়কেই পরস্পরের ব্যাপারে পরম ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হওয়া উচিত। একে অপরের রুচি ও প্রকৃতির ব্যাপারে সহনশীল হওয়া প্রয়োজন। আচার আচরণ ও চাল চলনের ব্যাপারে সহনশীল হওয়া উচিত। কথাবর্তার ধরন এবং জ্ঞান বুদ্ধির দুর্বলতার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা কর্তব্য এবং যৌন ব্যাপারে সংযত ও ধৈর্যশীল হওয়া উচিত। মোটকথা, এমন প্রতিটি ব্যাপারেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রয়োজন যেসব ব্যাপারে অসুবিধা, বিরক্তি, মনোকষ্ট, রাগ এবং অন্যান্য সঙ্কট সৃষ্টি হবার আশঙ্কা থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ কষাকষি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর এ সুযোগ শয়তান পরস্পরের মনে নানারূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে কম চেষ্টা করে না। আর এরই ফলে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরতে কিছু বিলম্ব হয় না। বিশেষ করে এ জন্যেও অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মেয়েরা সাধারণতই নাজুক স্বভাবের হয়ে থাকে। অল্পতেই রেগে যাওয়া, অভিমানে ক্ষুদ্ধ হওয়া এবং স্বভাবগত অস্থিরতায় চঞ্চলা হয়ে ওঠা নারী চরিত্রের বিশেষ দিক। মেয়েদের এ স্বাভাবিক দুর্বলতা কিংবা বৈশিষ্ট্যই বলুন- আল্লাহর খুব ভালোভাবেই জানা ছিলো। তাই তিনি স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا •

অর্থ: তাদের সাথে ভদ্রোচিত ও সম্মানজনকভাবে বাস করো। তোমরা যদি তাদের (স্ত্রীদের) অপছন্দ করো, তবে এমনো হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করছো, অথচ আল্লাহ্ তাতে দান করবেন প্রভূত কল্যাণ।[১৬৭]

মাওলানা সানাউল্লাহ পানিপথী এ আয়াতের তাফসির লিখেছেন: 'স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার ও তাকে নিয়ে ভালোভাবে বসবাস করার মানে হচ্ছে কার্যত তাদের প্রতি ইনসাফ করা, তাদের হক-হকুক রীতিমত আদায় করা এবং কথাবার্তায় ও আলাপ-ব্যবহারে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা প্রদর্শন। আর তারা তাদের কুশ্রীতা কিংবা খারাপ স্বভাব-চরিত্রের কারণে যদি তোমাদের অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের জন্য ধৈর্য ধারণ করো, তাদের না বিচ্ছিন্ন করে দেবে, না তাদের কষ্ট দেবে, না তাদের কোনো ক্ষতি করবে।' স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ আয়াতে স্বামীদেরকে এক ব্যাপক হেদায়েত দেয়া হয়েছে। স্বামীদের প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশ হচ্ছে: তোমরা যাকে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিলে, যাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে তার প্রতি সব সময়ই খুব ভালো ব্যবহার করবে, তাদের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় আদায় করবে। আর প্রথমে যদি এমন কিছু দেখতে পাও যার দরুন তোমার স্ত্রী তোমার কাছে ঘৃণার্হ হয়ে পড়ে এবং যার কারণে তার প্রতি তোমার মনে প্রেম-ভালোবাসা জাগার বদলে ঘৃণ্য জেগে উঠে, তাহলেই তুমি তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করো না। বুদ্ধির স্থিরতা ও সজাগ বিচক্ষণতা সহকারে শান্ত থাকতে পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে চেষ্টিত হবে। তোমাকে বুঝতে হবে যে, কোনো বিশেষ কারণে তোমার স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার মনে ঘৃণা জেগে থাকে, তবে এখানেই চূড়ান্ত নৈরাশ্যের ও চিরবিচ্ছেদের কারণ হয়ে গেলো না। কেননা হতে পারে, প্রথমবারে হঠাৎ এক অপরিচিতা মেয়েকে তোমার সমগ্র এ দিয়ে তুমি গ্রহণ করতে পারোনি। তার ফলেই এ ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে কিংবা তুমি হয়তো একটি দিক দিয়েই তাকে বিচার করেছ এবং সেদিক দিয়ে তাকে এ মতো না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছ। অথচ তোমার বোঝা উচিত যে, সে বিশেষ দিক ছাড়া আরো সহস্র দিক এমন থাকতে পারে, যার জন্য তোমার মনের আকাশ থেকে ঘৃণতর এ পুঞ্জিত ঘনঘটা দূরীভূত হয়ে যাবে এবং তুমি

১৬৭. আল কুর'আন, ৪:১৯

তোমার সমগ্র অন্তর দিয়ে তাকে আপনার করে নিতে পারবে। সে সংগে একথাও বোঝা উচিত যে, কোনো নারীই সমগ্রভাবে ঘৃণার্হ হয় না। যার একটি দিক ঘৃণার্হ, তার এমন আরো সহস্র গুণ থাকতে পারে, যা এখনো তোমার সামনে উদ্ঘাটিত হতে পারেনি। তার বিকাশ লাভের জন্য একান্তই কর্তব্য।

কেননা, কোনো নারীই সম্পূর্ণভাবে খারাবীর প্রতিমূর্তি হয় না। কিছু দোষ থাকলে অনেকগুলো গুণও তার থাকতে পারে। সে কারণে কোনো কিছু খারাপ লাগলে অমনি অস্থির, চঞ্চল ও দিশেহারা হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার অপরাপর ভালো দিকের উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া এবং সে জন্য অপেক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য।

নারীরা খুব কষ্টসহিষ্ণু, অল্পে সন্তুষ্ট, স্বামীর জন্যে জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করতে সতত প্রস্তুত। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান লালন-পালনের কাজ নারীরা- মায়েরা যে কতখানি কষ্ট সহ্য করে থাকে, পুরুষদের পক্ষে তার অনুমান পর্যন্ত করা সহজ নয়। এ কাজ একমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব। ঘর সংসারের কাজ করায় ও ব্যবস্থাপনায় তারা অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত, একান্ত বিশ্বাসভাজন ও একনিষ্ঠ। তাই বলা যায়, তাদের মধ্যে দোষের দিকের তুলনায় গুণের দিক অনেক গুণ বেশি। একজন ইউরোপিয় চিন্তাবিদ পুরুষদের লক্ষ্য করে বলেছেন: "গর্ভ ধারণ ও সন্তান-প্রসবজনিত কঠিন ও দুঃসহ যন্ত্রণার কথা একবার চিন্তা করো। দেখো, নারী জাতি দুনিয়ায় কত শত কষ্ট ব্যথা- বেদনা ও বিপদের ঝুঁকি নিজেদের মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকে। তারা যদি পুরুষের ন্যায় ধৈর্যহীনা হতো, তাহলে এতো সব কষ্ট তারা কি করে বরদাশত করতে পারত? প্রকৃত পক্ষে বিশ্বমানবতার এ এক বিরাট সৌভাগ্য যে, মায়ের জাতি স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু, তাদের অনুভূতি পুরুষদের মতো নাজুক ও স্পর্শকাতর নয়। অন্যথায় মানুষের এসব নাজুক ও কঠিন কষ্টকর কাজের দায়িত্ব পালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিলো।"[১৬৮]

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্থায়িত্বের জন্য একান্তই অপরিহার্য। যে স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারে না, ক্ষমা করতে জানে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যে স্বামীর স্বভাব, শাসন ও ভীতি প্রদর্শনই যার কথার ধরন, তার পক্ষে কোনো নারীকে স্ত্রী হিসেবে সংগে নিয়ে স্থায়ীভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব হতে পারে না। স্ত্রীদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করার সংগে সংগে তাদের প্রতি ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রয়োগেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াতে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ •

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আর যদি তাদের মাফ করে দাও, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদের ক্ষমা করে দাও তবে অবশ্যি আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান।[১৬৯]

স্ত্রীদের পীড়ন ও বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করা, তাদের দোষ-ত্রুটির প্রতি বেশি গুরুত্ব না দেয়া এবং স্বামীর অধিকারের পর্যায়ে তাদের যা কিছু অপরাধ বা পদস্খলন হয়, তা ক্ষমা করে দেয়া স্বামীর একান্তই কর্তব্য। তবে আল্লাহর হক আদায় না করলে সেখানে ক্ষমা করা যেতে পারে না।

---

১৬৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৮

১৬৯. আল কুর'আন, ৬৪:১৪

০৮. পারস্পরিক পরামর্শ

দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক পরামর্শ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরামর্শ ভিত্তিক কাজ সুন্দর হয়। এর ফল হয় ভালো। এতে কারো বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ থাকে না এবং অভিযোগ সৃষ্টিও হয় না। সংসারের যে কোনো কাজ করবেন উভয়ে পরামর্শ করে করুন। ব্যক্তিগত ব্যাপারেও পারস্পরিক পরামর্শ নেয়া উচিত।

পারিবারিক এমনকি সামাজিক ও জাতীয়-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুতর ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা এবং তার নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করার রেওয়াজ চালু করা দাম্পত্য জীবনে মাধুর্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের যাবতীয় বিষয়ে ঘরোয়া পরামর্শ অনেক সময়ই সার্বিকভাবে কল্যাণকর হয়ে থাকে। আর তাতে করে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ঐকান্তিক আস্থা-বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রমাণিত হয়। আর স্বামীর প্রতিও স্ত্রীর মনে ভালোবাসা ও আন্তরিক আনুগত্যমূলক ভাবধারা গভীরতম হয়। শুধু তা-ই নয়, ঘরের মেয়েলোকদের নিকটও যে অনেক সময় ভালো ভালো বুদ্ধি পাওয়া যায়, পাওয়া যায় জটিল বিষয়াদির সুষ্ঠু সমাধানের শুভ পরামর্শ, তাও তার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়ে পড়ে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মতের ভিত্তিতে গুরুতর কাজসমূহ সম্পন্ন করাও সম্ভব হয় অতি সহজে এবং অনায়াসে। কুরআন মাজিদে এ কারণেই স্ত্রীর সাথে সর্ব ব্যাপারেই পরামর্শ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার বড় প্রমাণ এ যে, সন্তানকে কতদিন দুধ পান করানো হবে তা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا •

অর্থ: কিন্তু তারা উভয় পক্ষ যদি পারস্পারিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ করতে চায়, তবে তাতে তাদের কোনো অপরাধ হবে না।[১৭০]

আল্লামা আহমাদুল মুস্তফা আল-মারাগি এ আয়াতের ভিত্তিতে লিখেছেন:

কুরআন মজিদ সন্তান পালনের মতো অতি সাধারণ ব্যাপারেও পরামর্শ প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পিতামাতার একজনকে অপর জনের ওপর জোর- জবরদস্তি করার অনুমতি দেয়া হয়নি। এ কথা যদি তোমরা চিন্তা ও লক্ষ্য করো, তাহলে গুরুতর বিপজ্জনক ও বিরাট কল্যাণময় কাজ-কর্ম ও ব্যাপারসমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারবে। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে এ পর্যায়ের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্ব প্রথম অহি লাভ করার পর তাঁর হৃদয়ে যে ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল, তার অপনোদনের জন্যে তিনি ঘরে গিয়ে স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-এর নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান করেন। বলেছিলেন:

لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ •

অর্থ: আমি এ ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে বড় ভীত হয়ে পড়েছি। এ কথা শুনে জীবন সংগিনী খাদিজা (রা.) তাঁকে বলেন: "আল্লাহ আপনাকে কখ্খনই এবং কোনোদিনই লজ্জিত করবেন না। কেননা আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, মেহমানদারী রক্ষা করেন, লোকদের বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করে থাকেন, এ জন্য আল্লাহ কখনই শয়তানদের আপনার উপরে জয়ি বা প্রভাবশালী করে দেবেন না। কোনো অমূলক চিন্তা-ভাবনাও আপনার ওপর চাপিয়ে

১৭০. আল কুর'আন, ২: ২৩৩

দেবেন না। আর এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার জাতির লোকজনের হিদায়াতের কার্যের জন্যই বাছাই করে নিয়েছেন।"[১৭১]

খাদিজা (রা.) এর এ সান্তনা বাণী রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মনের ভার অনেকখানি লাঘব করে দেয়। আর এ ধরনের অবস্থায় প্রত্যেক স্বামীর জন্য তার প্রিয়তমা ও সহানুভূতিসম্পন্না স্ত্রীর আন্তরিক সান্তনাপূর্ণ কথাবার্তা অনেক কল্যাণ সাধন করে থাকে।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন মক্কা গমন ও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা সম্ভব হলো না, তখন রাসূলের সংগে অবস্থিত চৌদ্দশ সাহাবি নানা কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময়ে রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে এখানেই কুরবানি করতে আদেশ করেন। কিন্তু সাহাবিদের মধ্যে তাঁর এ নির্দেশ পালনের কোনো আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ (সা.) বিস্মিত ও অত্যন্ত মর্মাহত হন। তখন তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাঁর সংগে অবস্থানরতা স্ত্রী উম্মে সালমা (রা.) এর কাছে সব কথা খুলে বললেন। তিনি সব কথা শুনে সাহাবাদের এ অবস্থার এস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং যে কাজ আপনি করতে চান তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন, আপনাকে সে কাজ করতে দেখে সাহাবিগণ নিজ থেকেই আপনার অনুসরণ করবেন এবং সে কাজ করতে লেগে যাবেন।"

এহেন গুরুতর পরিস্থিতিতে বাস্তবিকই উম্মে সালমা (রা.) এর পরামর্শ বিরাট ও অচিন্তনীয় কাজ করেছিল। এমনিভাবে সব স্বামীই তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে এ ধরনের কল্যাণময় পরামর্শ লাভ করতে পারে তাদের সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে।[১৭২]

১৭১. মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

১৭২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বঃ কুর'আনি দৃষ্টিকোণ

আল্লাহ প্রত্যেক মাতাপিতার অন্তরে সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানব শিশু অন্য সকল জন্তুর তুলনা সবচেয়ে বেশি অসহায়, দুর্বল এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। মাতা-পিতার অন্তরে যদি তার জন্য স্নেহ ও ভালোবাসার সীমাহীন আবেগ না হতো তাহলে তার লালন-পালনই হতো না। মাতা-পিতার নজিরবিহীন স্নেহ-ভালোবাসা এবং অসাধারণ ত্যাগ কুরবানীর বদৌলতেই সে বড় হয়ে উঠে এবং যোগ্য হয়। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর রহমাত ও হিকমাতের নিদর্শন এবং তার রব ও প্রতিপালক হবার প্রকাশ্য দলিল। সন্তান জীবনের শোভন ও সৌন্দর্য। সুসন্তান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সন্তানের চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন মা-বাবা। আদর্শ সন্তানের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে কাদের সম্মান বৃদ্ধি হয়। মৃত্যুর পরও তার সুফল পেতে থাকেন অনন্তকাল। পবিত্র কুর'আনে সন্তানকে জীবনের সৌন্দর্য আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে:

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا •

অর্থ: ধনমাল এবং সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের একটি সৌন্দর্য মাত্র, আর তোমার প্রভুর কাছে পুরস্কার আর প্রত্যাশিত বস্তু হিসেবে উত্তম হলো স্থায়ী ও চলমান পুণ্যকাজ।[১৭৩]

পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব একটি বহুমাত্রিক সংবেদনশীল বিষয়। পরিবারে শিশুর যথাযথ শিক্ষণের জন্য অভিভাবক হিসেবে বাবা-মায়ের দায়িত্ব অপরিসীম। সন্তানের বেড়ে উঠা নির্ভর করে মা-বাবা, বৃহত্তর পরিবার, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিদ্যমান মূল্যবোধসহ নানাবিধ অনুঘটকের ওপর। বর্তমান সময়ে আমাদের ভাবনার ও প্রচেষ্টার বড় অংশ জুড়ে আছে সন্তানদের বেড়ে উঠা। পারিবারিক জীবনের সন্তান লালন- পালনে বাবা-মায়ের দায়িত্ব অপরিসীম। কুর'আনের শিক্ষা অনুযায়ী মানব সন্তানকে সুস্থ, সবল ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে সন্তানকে গড়ে তোলা বাবা-মায়ের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কোনো সমাজকে সংস্কার ও পরিশুদ্ধ করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপটি নিতে হবে তা হচ্ছে শিশুদের লালন পালন ও তাদেরকে সার্বিকভাবে খারাপ কর্মকান্ড থেকে হেফাজত করা। পরিবারে শিশুর যথাযথ শিক্ষণের জন্য অভিভাবক হিসেবে বাবা- মায়ের দায়িত্ব অপরিসীম। কুর'আনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ •

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো জাহান্নাম থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর (ভাস্কর্য, মূর্তি), তার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রয়েছে এমন সব ফেরেশতা, যারা শক্ত হৃদয় আর কঠোর স্বভাবের। তারা অমান্য করেনা তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়। যা নির্দেশ দেয়া হয় তারা তাই করে।[১৭৪]

---

১৭৩. আল কুর'আন, ১৮:৪৬

১৭৪. আল কুর'আন, ৬৬:৬

সন্তান সন্ততি আল্লাহর বিশেষ দান ও অনুগ্রহ। এটি যে কত বড় দান, তা কেবল সে দম্পত্তি জানে। যার কোলে ও যার ঘরে এ নিয়ামতের আগমন ঘটবে সে সৌভাগ্যবান।

সন্তান হচ্ছে সুসংবাদ ও সৌভাগ্যের পরম প্রাপ্তি। পবিত্র কুর'আনে হযরত যাকারিয়া (আ.) ও তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান ইয়াহইয়া (আ.) এর প্রসংগ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায়।

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا •

অর্থ: (তার দু'আ কবুল করে আল্লাহ্ বললেন:) 'হে যাকারিয়া! আমরা তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহিয়া। আগে আমরা এ নামে কারো নামকরণ করিনি।'[১৭৫]

পারিবারিক জীবনের পূর্ণতা আসে সন্তানের জন্ম ও লালন পালনের মাধ্যমে। সন্তান জন্মের পর সুন্দর নাম রাখতে হবে। হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন তোমাদের নাম ও তোমাদের বাবার নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমরা তোমাদের ভালো নাম রাখো।[১৭৬]

আল্লাহ তা'য়ালা পারিবারিক জীবনকে সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় করেছেন। যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সন্তান দান করেছেন তাদের ওপর এক মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। প্রতিটি মানব সন্তানই আল্লাহু তা'য়ালার অলংঘণীয় ফিতরাত তথা ইসলামের ওপর জন্ম গ্রহণ করে। সন্তানকে আদর্শবান ও সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলা বাবা-মার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত ও অন্যতম দায়িত্ব। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا •

অর্থ: আর (এটি নাযিল করেছেন) তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে, যারা বলে: 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।'[১৭৭]

মানুষ ভুমিষ্ট হয় একটি নিষ্পাপ এ নিয়ে। কিন্তু তার এ স্বচ্ছ মনের উপরে দাগ পড়ে পড়ে অভিজ্ঞতার আলোকে সে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়। আবার পশুত্ব (Animality) ও এুষ্যত্ব (Rationality) এর সংমিশ্রণেই মানুষ তৈরি- তবে মানুষের বিবেক বুদ্ধিই মানুষকে গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে। তাই জন্ম মুহূর্তের স্বচ্ছ এটিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে তার সুন্দর গুণগুলির উন্মেষই বাঞ্ছনীয়। এ সুন্দরের বিকাশ সম্ভব সুকুমার বৃত্তির লালনে। সুন্দর বাগান সৃষ্টি করতে হলে যেএ ভালো ভালো ফুল ও ফলের গাছকে সযত্নে লালন করে আগাছার মূল উৎপাটন করা হয়, ঠিক তেমনি এরূপ বাগানের কুপ্রবৃত্তির আগাছার মূল উৎপাটন করে সুপ্রকৃতির সযত্ন লালনই সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করে। সুকুমার বৃত্তির লালন বা চর্চা সুপ্রকৃতি গঠনে সহায়ক।[১৭৮]

---

১৭৫. আল কুর'আন, ১৯:৭

১৭৬. হাফেজ ইমাম আবু মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন, *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব*, অনু. হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক (ঢাকা: হাসনা প্রকাশনী, ২০০২), খ. ২, পৃ. ৩১৯, হাদীস নং-১০৮৪

১৭৭. আল কুর'আন, ১৮:৪

১৭৮. সুলতানা রাজিয়া বেগম, *মানুষের পরিচয়* (রাজশাহী, কানিজ হাসনিন জেটা, ২০০৩) পৃ.-৬০

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। বনি আদমের বংশধারা সুরক্ষার জন্য দাম্পত্য জীবনের ফসল হচ্ছে মানব শিশু। এ শিশুরাই মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ, মানব প্রজন্মের ভবিষ্যৎ এবং উম্মাহর সমৃদ্ধ জীবনের আশার আলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তান অনেক বড় এক নিয়ামত। সন্তানদের পরিচর্যা এবং আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা তথা অভিভাবকের ভূমিকার বিষয়ে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে। সন্তান-সন্ততি নিঃসন্দেহে আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। বাবা-মার গাফলতির কারণে সন্তানের বেড়ে উঠা যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখাটা খুব জরুরী।

আদর্শ পরিবার গঠনে মহান আল্লাহর সাহায্য ও প্রার্থনার বাণী মহান আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন।

• وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ: তারা দু'আ করে এভাবে: আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদের আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানাও। আর আমাদের বানাও মুত্তাকিদের অগ্রগামী।[১৭৯]

রাসূল (সা.) বলেছেন, "মানুষ যখন মারা যায়, তখন তিনটি কাজ ছাড়া সব সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সাদকায়ে জারিয়াহ, এমন জ্ঞান যা মানুষের উপকারে আসে এবং সৎকর্মশীল সন্তান; যে তাদের জন্য দু'আ করে।"[১৮০]

একটি দেশ যেএ মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার ছাড়া সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না, একটি পরিবারের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। পিতা-মাতা একটি পরিবার পরিচালনা করে। পিতা-মাতা পরিবারে সুন্দরভাবে কার্য নির্বাহ সন্তানরা সঠিক জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করতে পারবে এবং ন্যায়বোধ ক্ষমতা নিয়ে গড়ে উঠবে। সন্তানের সুন্দর জীবন গঠনে বাবা-মার সচেতনতা ও আন্তরিকতার বিকল্প নাই।

আল্লাহ তা'য়ালা পারিবারিক জীবনকে সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় করেছেন। যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলাএি সন্তান দান করেছেন তাদের ওপর এক মহা দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। প্রতিটি মানব সন্তানই আল্লাহ তা'য়ালার অলংঘণীয় ফিতরাত তথা ইসলামের ওপর জন্ম গ্রহণ করে। সন্তানকে আদর্শবান ও সচ্চরিত্রবান মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা মাতা-পিতার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত ও অন্যতম দায়িত্ব। সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে বাবা-মা যেসব ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

০১. সন্তান প্রতিপালন

সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে নিতান্তই অক্ষম অসহায় থাকে। ঐ অবস্থায় সে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে সম্পূর্ণই অন্যের মুখাপেক্ষী থাকে। কেউ যদি নবজাত শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ না করে তাহলে ঐ শিশুর বেঁচে থাকা বাহ্যত দুরূহ ব্যাপার। আল্লাহ তা'য়ালা সন্তানের পিতা-মাতা তাদের অবর্তমানে পর্যায়ক্রমে আল-ওয়ারিশদের প্রতি নবজাত শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সন্তান জন্মের পরপরই পিতা মাতার দায়িত্ব হলো কানে আযান দেয়া এবং তার আকীকার ব্যবস্থা করা। এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো,

---

১৭৯. আল কুর'আন, ২৫:৭৪

১৮০. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অনু. মাওলানা আফলাতুন কায়সার, সম্পাদনা: মাওলানা মো: মুসা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২), খ. ৬, হাদীস নং-৪০৭৬

উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রা.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু রাফে) বলেন, ফাতিমা (রা.) হাসান ইবনে আলী (রা.) কে প্রসব করলে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হাসানের কানে নামাজের আযানের অনুরূপ আযান দিতে দেখেছি।[১৮১]

দুনিয়াবী কোনো আওয়াজ তার কানে পৌঁছার পূর্বেই যেন সে আল্লাহর মহত্ব শুনতে পায়, তাই সন্তান জন্মের পরই তার কানে আযান দিতে হবে। আযানের শব্দগুলো তাকে শোনানোর অর্থ হচ্ছে সে যেন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সাক্ষ্য দেয় এবং এ বিষয়গুলো যেন তার ওপর প্রভাব ফেলে।

শিশুর জন্মের পরই আকীকা দেয়ার বিধান ইসলামে আছে। যিনি শিশুর ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেন তার ওপর আকীকা দেয়া দায়িত্ব হয়ে পড়ে। সন্তান জন্ম লাভের খুশিতে আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ামত লাভের কৃতজ্ঞতা আদায় করে আকীকা করতে হবে।

সালমান ইবনে আমের আদ-দাব্বী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক শিশুর পক্ষ থেকে আকীকা করা প্রয়োজন। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর (পশু জবেহ কর) এবং তার থেকে ময়লা দূর করো।[১৮২]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক শিশু তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) থাকে। জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে জবেহ করতে হবে এবং তার মাথা কামাতে হবে।[১৮৩]

দয়াময় আল্লাহ পিতা-মাতার অন্তরে সন্তানের জন্য অপরিসীম দয়া মায়া ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাই পিতা-মাতা হাজার কষ্ট করে হলেও সন্তানকে উত্তমভাবে লালন-পালন করে থাকেন। সন্তান প্রতিপালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ •

অর্থ: এ উদ্দেশ্যে আমরা মূসার মা'কে অহি (ইশারা) করে নির্দেশ দিয়েছিলাম: "ওকে (মূসাকে) বুকের দুধ পান করাতে থাকো। যখন তার (জীবনের) ব্যাপারে আশংকা করবে, তখন তাকে (বাক্সে করে) দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে। এ ক্ষেত্রে তুমি ভয়ও করোনা, দুশ্চিন্তাও করোনা। ওকে আমরা তোমার কোলেই ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে আমরা বানাবো রসূলদের একজন।"[১৮৪]

অন্যত্র এসেছে,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

---

১৮১. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ১৩১, হাদীস নং-১৪৫৮

১৮২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৪৫৭

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫, হাদীস নং-১৪৬৪

১৮৪. আল কুর'আন, ২৮:৭

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ •

অর্থ: মায়েরা তাদের বাচ্চাদের বুকের দুধ পান করাবে পূর্ণ দুই বছর। এ বিধান তার জন্যে যে পিতা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। এক্ষেত্রে বাচ্চাদের পিতার দায়িত্ব হবে বাচ্চাদের মায়ের খাওয়া পরার ব্যয় ভার বহন করা ন্যায়সংগত পরিমাণে। কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো ঠিক নয়। কোনো মাকে তার বাচ্চার কারণে কষ্ট দেয়া যাবেনা, কোনো পিতাকেও তার বাচ্চার কারণে কষ্ট দেয়া যাবেনা। (বাচ্চার পিতার অবর্তমানে স্তন্যদানকারী মায়ের প্রতি) ওয়ারিশদের দায়িত্ব কর্তব্য তার (পিতার) অনুরূপ। কিন্তু তারা উভয় পক্ষ যদি পারস্পারিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ করতে চায়, তবে তাতে তাদের কোনো অপরাধ হবেনা। আর তোমরা যদি দুধ মা দ্বারা তোমাদের বাচ্চাদের দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোনো দোষ হবেনা। তবে শর্ত হলো, পরস্পর সম্মত বিনিময় ন্যায়সংগতভাবে তাকে পরিশোধ করতে হবে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং জেনে রাখো, অবশ্যি আল্লাহ তোমাদের কর্মের ওপর দৃষ্টি রাখেন।[১৮৫]

সন্তান প্রতিপালন একটি দীনি দায়িত্ব। পিতা-মাতার ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত।

০২. আলোকিত জীবনের পাথেয় কুর'আন

কুর'আন মানবসমাজকে অজ্ঞতার অন্ধতা থেকে বের করে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে। এ প্রসংগে কুর'আনের বক্তব্য:

الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ •

অর্থ: আলিফ লাম রা। এ কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানব সমাজকে বের করে আনো অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে মহাপরাক্রমশালী সপ্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথে।[১৮৬]

হাদীসে এসেছে, উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুর'আন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়, সে-ই তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাবান।[১৮৭]

মহানবী (সা.) বলেন: "যে ঘরে কুর'আন চর্চা হয় না, সেটি পোড়াবাড়ির মতো।"[১৮৮]

পোড়াবাড়িতে যেএ লোক সমাগম হয় না, ধুলো ময়লার পাহাড় জমে, সাপ-বিচ্ছুর আবাসে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি কুর'আনহীন গৃহ নিষ্প্রাণ দেহের মতো, ছন্নছাড়া জীবনের মতো। কুর'আনের সাথে বেড়ে উঠতে হলে সাধ্যমতো মুখস্থ করা এবং অর্থ বুঝার জন্য সাধনার প্রয়োজন।

---

১৮৫. আল কুর'আন, ২:২৩৩

১৮৬. আল কুর'আন, ১৪:১

১৮৭. আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা*, অনু. মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০) খ. ১, পৃ. ১৩০, হাদীস নং-২১২

১৮৮. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৯১৩

এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের অনুসরণীয় কাজ হতে পারে চারটি:

- কুর'আন তিলাওয়াত করা।
- কুর'আন বুঝা।
- কুর'আন মানা।
- কুর'আন শেখানো।

প্রথমে কুর'আন তিলাওয়াতের বিষয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

اَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ •

অর্থ: আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তা তিলাওয়াত করে তিলাওয়াতের হক আদায় করে। এরাই তার (অর্থাৎ কিতাবের) প্রতি ঈমান রাখে। আর যারা এটির (কুর'আনের) প্রতি কুফুরি করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[১৮৯]

হাদীসে এসেছে, আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুর'আন তিলাওয়াত করে এবং তা কণ্ঠস্থ করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজন লোকের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন যাদের সকলের জন্য দোযখ অবধারিত হয়ে গিয়েছে।[১৯০]

সন্তানকে যদি মা-বাবা কুর'আন শিক্ষা দেন তাহলে আখিরাতে তারা অশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

"হযরত মুআয জুহানী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুর'আন পড়বে এবং এর ওপর আমল করবে তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন এক মুকুট পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলো হতেও উজ্জ্বল হবে; যদি সে সূর্য তোমাদের ঘরের ভিতর হয়। (তবে তা যে পরিমাণ আলো ছড়াবে সে মুকুটের আলো উহা হতেও অধিক হবে।) তাহলে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা যে স্বয়ং কুর'আনের ওপর আমল করেছে।[১৯১]

কুর'আন বুঝার শর্ত হচ্ছে:

- হিকমাহ
- কুর'আনের মূল অপরিহার্য বিষয় বুঝা (তাযাক্কুর) এবং
- কুর'আনের শব্দ, আয়াত, সূরা নাজিলের পটভূমি জেনে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়া।

এখন বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে কুর'আন বুঝার অনেক সহজলভ্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নিরন্তর সাধনা থাকলে কুর'আনের অনন্যতা, সর্বজনীন, অমীয়তায় অবগাহনের স্বর্ণদ্বার উন্মোচনও সহজ হতে পারে।

---

১৮৯. আল কুর'আন, ২:১২১

১৯০. আবু ঈসা তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩১, হাদীস নং-২১৬

১৯১. আবু দাউদ সিজাস্তানি, *সুনানু আবী দাউদ* (বৈরুত: লেবানন, দারু ইহইয়াতিত তুরাছিল আরাবী, ১৯৭৫), খ. ১, হাদীস নং-১৪৪৮

০৩. ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সাথে পরিচিতি

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। কালেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্জ্ব। সন্তানকে দুনিয়ার প্রস্তুতির সাথে সাথে আখিরাতের প্রস্তুতির শিক্ষা দিতে হবে। পরলৌকিক জ্ঞান দিতে হবে। শরীয়তের যাবতীয় হুকুমের ইলম শেখাতে হবে। মৌলিক দীনি জ্ঞান ও আমল- ইবাদত শেখাতে হবে। শিক্ষা দিতে হবে সালাত আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইলম। কুর'আন মজিদে এসেছে:

اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ •

অর্থ: তিলাওয়াত করো কিতাব যা তোমার প্রতি অহি করা হয়েছে এবং কায়েম করো সালাত। নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে ফাহেশা এবং মুনকার (মন্দকর্ম) থেকে। আল্লাহ্‌র যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা করো।[১৯২]

হাদীসে এসেছে, জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন: কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।[১৯৩]

সালাতের অপরিসীম গুরুত্বের জন্য রাসূল (সা.) শৈশব কৈশর থেকেই সন্তানকে সালাতের অভ্যস্ত করাতে বলেছেন। সন্তানকে বুঝিয়ে দিতে হবে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মতো অপরাধ। রাসূল (সা.) সাত বছর বয়সে নামাজের কথা বলতে বলেছেন এবং দশ বছর বয়সে নামাজ নিশ্চিত করতে বলেছেন। আবু সুরাইয়্যা সাবরা ইবনে মাবাদ আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: "বাচ্চাকে সালাত শিক্ষা দাও যখন সে সাত বছর বয়সী হয় এবং এর জন্য তাকে প্রহার করো যখন সে দশ বছর বয়সী হয়।[১৯৪]

সালাত হলো আত্মার পরিচর্যার সর্বোত্তম মাধ্যম। এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা দিন রাতে আমাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যাতে রুহের সাথে তার রবের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং তা দূর্বল না হয়ে পড়ে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যে পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে সালাত শিক্ষা দিবেন এবং সালাত আদায়ে অভ্যস্ত করাবেন।

সালাত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা দ্বীনের সাথে মানুষকে সম্পর্কযুক্ত রাখে। সালাত দ্বীনকে হেফাজতও করে। আবার দ্বীনের প্রতি আকর্ষণও করে থাকে। দ্বীনদার জীবন অতিবাহিত করার জন্য মানুষকে প্রস্তুতও করে। শুরু থেকেই শিশুদেরকে নিয়মিত সালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে অহেতুক স্নেহ-প্রীতি এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী নরম প্রদর্শন খুবই ক্ষতিকর।[১৯৫]

---

১৯২. আল কুর'আন, ২৯: ৪৫

১৯৩. আবু ঈসা তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৮২, হাদীস নং-২৫৫৬

১৯৪. ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী (র.), *রিয়াদুস সালিহীন*, অনু. সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১), খ. ১, হাদীস নং-৩০২

১৯৫. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, *মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার*, অনু. আবদুল কাদের (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯৬), পৃ. ১৮০

ছোট থেকে সন্তানকে রোযার গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে হবে। কুর'আনে এসেছে। সূরা বাকারায় ১৮৩-১৮৭ নম্বর আয়াতে রমজানে রোযার হুকুম এবং রোযা সম্পর্কিত অন্যান্য বিধান বর্ণিত হয়েছে। একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে সন্তানকে গড়ে তুলতে হলে ইসলামের মৌলিক বিধান সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও তার বাস্তবায়ন জরুরী।

০৪. সঠিক বিশ্বাসে সন্তানের বেড়ে উঠা

মানুষের প্রকৃতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সফলতা ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি।

সঠিক বিশ্বাসে সন্তানদের গড়ে তোলা মা-বাবার প্রধান দায়িত্ব। বিশ্বাস হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সেভাবে জীবন পরিচালনা করা। বিশ্বাসে গোলমাল থাকলে এ জীবন ব্যর্থ। এ জন্য প্রান্তিকতাবর্জিত মধ্যম পন্থায় সন্তানদের গড়ে তুলতে হবে।[১৯৬]

ইসলাম ও বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়। মহান আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ •

অর্থ: পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে (প্রকৃত পক্ষে) কোনো পুণ্য নেই। বরং পুণ্য তো হলো: মানুষ ঈমান আনবে এক আল্লাহ্‌র প্রতি, শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং নবীদের প্রতি; আর তাঁর (আল্লাহ্‌র) ভালোবাসায় মাল-সম্পদ দান করবে আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতিমদের, মিসকিনদের, পথিক-পর্যটকদের, সাহায্যপ্রার্থীদের এবং মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির কাজে; আর সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান (পরিশোধ) করবে; তাছাড়া প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণকারী হবে এবং অর্থসংকট, দুঃখ-কষ্ট ও সত্য মিথ্যার সংগ্রামে সবর অবলম্বনকারী হবে। -মূলত এরাই (তাদের ঈমান ও ইসলামের দিক থেকে) সত্যবাদী এবং এরাই (প্রকৃত) মুত্তাকি।[১৯৭]

কুর'আনে আরো বলা হয়েছে,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ •

অর্থ: এভাবে আমরা তোমাদের বানিয়েছি একটি 'মধ্যপন্থী উম্মাহ'- যাতে করে তোমরা বিশ্ববাসীর জন্যে সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারে তোমাদের জন্যে সাক্ষী। তুমি এ যাবত যেটিকে কিবলা বানিয়ে সালাত আদায় করে আসছিলে, সেটিকে তো আমরা এজন্যে

১৯৬. নেসার আতিক, *গুড প্যারেন্টিং* (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৯), পৃ. ৩১
১৯৭. আল কুর'আন, ২:১৭৭

কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, যাতে করে আমরা জানতে পারি, কে আমার রসূলের অনুসরণ করে, আর কে তার থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে? নি:সন্দেহে এটা (পরিবর্তিত কিবলা মেনে নেয়া) ছিলো একটা বড় কঠিন কাজ; কিন্তু তাদের জন্যে (মোটেও কঠিন) ছিলনা, আল্লাহ যাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। অবশ্যি আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু।[১৯৮]

সন্তানকে শিরক ও বিদআতমুক্ত জীবনের শিক্ষা দিতে হবে। রব ও ইলাহ হিসেবে আর কাউকে শরীক (অংশীদার) সাব্যস্ত করার নাএ শিরক। যেমন আল্লাহর সাথে অন্য কারো নিকট দু'আ করা কিংবা বিভিন্ন প্রকার ইবাদত যবেহ, মান্নাত, ভয়, কুরবানী, ভরসা ইত্যাদি কোনো কিছু গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। আল্লাহকে ডাকার মতো করে অন্যকে ডাকা, আল্লাহকে ভয় করার মতো অন্যকে ভয় করা, অন্যের কাছেও তেএ কাএা করা বা আল্লাহর মতো করেই কাউকে ভালোবাসা শিরক। আর বিদআত হলো যা কিছু আল্লাহর দ্বীনে নতুন সৃষ্টি করা হয় অথচ এর সমর্থনে কোনো বিশেষ দলিল প্রমাণ নেই। এ সকল প্রকার বিদআত গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। সন্তানের মনে শিরক ও বিদআতের ধারণা স্পষ্ট করা জরুরী।

মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে থাকতে হবে সঠিক বিশ্বাস। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ রোকন। দুনিয়া ও পরকালের সফলতা উল্লেখিত দুটি বিশ্বাসের প্রতি নির্ভরশীল। কুর'আনে আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا •

অর্থ: যখন তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে আসবে, তখন তোমরা হয় প্রচলিত উত্তম পন্থায় তাদের রেখে দেবে, নতুবা প্রচলিত উত্তম পন্থায় তাদের বিদায় করে দেবে। আর এ সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে সঠিক সাক্ষ্য দেবে। এর মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তোমাদের যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে। যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, তিনি তার জন্যে বের হবার পথ খোলাসা করে দেবেন।

০৫. শিশুর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ

ইসলামে সন্তানদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে জন্মের পর থেকেই। সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

শিশু যদিও জীবনের প্রথম দিনগুলোতে কথা বলতে পারে না, তবুও অনুভব করতে পারে এবং শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থাকে। পরিবারের সদস্যদের চাল-চলন তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে।

শিকাগোর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ফ্রান্সিস উইলিন্ডার পার্কার একবার শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে একজন মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো: 'আমি আমার শিশুর শিক্ষা

১৯৮. আল কুর'আন, ২:১৪৩

কখন থেকে শুরু করবো?' উইলিন্ডার পার্কার বলেন, 'আপনার শিশু কবে জন্ম নেবে?' মহিলা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো, 'জনাব তার বয়সতো পাঁচ বছর হয়ে গেছে।'[১৯৯]

শিশু জন্ম গ্রহণের সাথে সাথে তার শিক্ষা-দীক্ষার চিন্তা করা উচিত। প্রথম কয়েক বছর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসে এসেছে, 'যখন তোমাদের শিশুরা কথা বলতে শিখে তখন তাদেরকে কালেমাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিক্ষা দাও।'[২০০]

প্রকৃতপক্ষে এ শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে তাওহীদের শিক্ষা দানের কথা বলা হয়েছে। সন্তান মা-বাবার হাতে আল্লাহর আমানত, তাঁর দেয়া নিয়ামত। সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে কিয়ামতের দিন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। তাই প্রত্যেক বাবা-মাকেই সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে সজাগ থাকা অত্যন্ত জরুরী। সন্তানের দ্বীনি শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের হক আদায় করা প্রত্যেক বাবা-মার কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে সন্তানের অধিকারসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হিকমাত, ধৈর্য, কর্তব্য সচেতনতা, উদারতা ও একাগ্রতার সাথে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আর তাহলেই সন্তান বাবা-মার শান্তির কারণ হতে পারবে। সমাজের জন্য রাহমাতের মাধ্যম এবং দ্বীনের জন্য সম্পদ হতে পারবে। তাই সন্তানের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে পিতা-মাতার কোনো ধরনের গাফলতি যেন না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অসাধারণ মনোযোগ দিতে হবে। এর বদৌলতে দুনিয়াতেও রয়েছে মান-মর্যাদা ও সুনাম এবং আখেরাতেও রয়েছে বিরাট মর্যাদা। আল্লাহর রাসূল (সা.) এর দৃষ্টিতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে উত্তম তোহফা হলো সন্তানকে উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সুসজ্জিত করা।[২০১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'পিতা নিজের সন্তানকে যা কিছু প্রদান করেন তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।'[২০২]

কঠোরতা নয়, শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার কোমলতা অবলম্বন করতে হবে। শৈশব-কৈশরই হচ্ছে শিক্ষার ভিত্তিকাল। স্বচ্ছ মেধা, সুস্থ বুদ্ধি, সরল চিন্তা ও স্পষ্ট মনোযোগের কারণে শিশুরা সহজই সবকিছু আয়ত্ত্ব করতে পারে, তাদেরকে শিক্ষা দান করতে হবে স্নেহ মমতা দিয়ে। ধমক ও কঠোরতা পরিহার করে নম্রতা ও কোমলতার সাথে শিক্ষা দান করতে হবে।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা কোমল আচরণকারী, তিনি সর্বক্ষেত্রে কোমলতাকে ভালোবাসেন।'[২০৩]

চারিত্রিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন: নিজের সন্তানকে শিষ্ঠাচার ও আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া এক 'সা' পরিমাণ বস্তু দান খয়রাত করার চেয়েও উত্তম।[২০৪]

সন্তানের বুদ্ধির উন্মেষ লক্ষ্য করা মাত্রই পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করতে শুরু করা।

---

১৯৯. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

২০০. ইমাম বায়হাকী, *শুয়াবুল ঈমান* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার), হাদীস নং-৮৬৪৯

২০১. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

২০২. হাফেজ ইমাম আবু মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২০, হাদীস নং-১০৮৮

২০৩. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী* (ঢাকা: হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ২০১১), হাদীস নং-৬০২৪

২০৪. আবু ঈসা তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৯, হাদীস নং-১৯০১

০৬. সন্তানকে ভালোবাসা ও তাদের মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দান

মা-বাবার অন্তরের প্রকোষ্ঠে সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতার অনুভূতি তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভালো করে গঠন করার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। মা-বাবা সন্তানকে রক্ষা করে, দয়া করে এবং তাদের সকল বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। সন্তান বাবা-মায়ের হৃদয়ের দরদ ও পরম স্নেহ-যত্নের দাবীদার। আদর-স্নেহ হতে বঞ্চিত সন্তানদের স্বভাব চরিত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে। স্নেহের পরশ না পেলে তারা নিজেদেরকে অসহায় মনে করবে। নবী (সা.) এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার দুটি মেয়েকে সাথে নিয়ে কিছু চাইতে আমার কাছে আসলো। একটি মাত্র খেজুর ছাড়া সে আমার কাছে কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই মেয়েকে ভাগ করে দিলো এবং চলে গেল। অতপর নবী (সা.) আসলেন। আমি তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, যার ওপর এ মেয়েদের দায়িত্ব চাপিয়ে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে, সে যদি তাদের প্রতি ইনসান করে তবে তারা তার জন্য দোযখের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।[২০৫]

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল (সা.) হাসান ইবনে আলী (রা.) কে চুমু দিলেন। তখন আক্‌রা ইবনে হাবিস তামিমী (রা.) তাঁর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। আক্‌রা ইবনে হাবিস বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে চুমু দেইনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না সে অনুগ্রীহিত হয় না।[২০৬]

প্রত্যেক পিতা-মাতাকেই সন্তানের মান মর্যাদার প্রতি চরমভাবে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের সাথে এমন আচরণ বা কথা বলা যাবে না যাতে তাদের অহংবোধে আঘাত লাগে এবং তারা নিজেদেরকে নীচু ভাবতে থাকে। সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সময়ই এ ধরনের অবহেলা প্রদর্শন করা হয় এবং শিশুর মর্যাদা ও অহংবোধের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। প্রকৃতপক্ষে শৈশবকালই উত্তম সময় যখন শিশুর মস্তিষ্ক ও অন্তরের ভেতর যে ধরনের ইচ্ছা সে ধরনের ছবি আঁকা যায়। এ ছবি বা চিত্র আজীবন চরিত্র ও কাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিশুর ভাঙ্গা-গড়ার প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষার মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে।[২০৭]

তাই সন্তানের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা ও তাকে যথাযথভাবে ভালোবাসা প্রত্যেক বাবা-মারই একান্ত কর্তব্য। এ দয়া ও ভালোবাসা সন্তানের জীবনের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে।

০৭. হালাল-হারামের সচেতনতা

ইবাদত কবুলের শর্ত হলো হালাল আয়। সুস্থ দেহ আর প্রশান্ত মনের জন্য হালাল রুজি আবশ্যক। হালাল উপার্জনের ওপর নির্ভর করা এবং হারাম উপার্জন বর্জন করা মুসলিমের জন্য অন্যতম ফরজ ইবাদত।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ •

২০৫. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৯৮, হাদীস নং-৫৫৬০

২০৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৫৬২

২০৭. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭৪

অর্থ: তোমরা নিজেদের একে অপরের মাল-সম্পদ খেয়োনা বাতিল (অন্যায়-অবৈধ) প্রক্রিয়ায় এবং জেনে বুঝে মানুষের মাল সম্পদের কিছু অংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে শাসকদের সামনে উত্থাপন করোনা।[২০৮]

রাসূল (সা.) নিজে কর্ম করে জীবিকা উপার্জন করেছেন। তিনি ছিলেন হালাল রিজিকের উপার্জক। রাসূল (সা.) হারাম উপার্জন করার ভয়াবহতা বর্ণনা করে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। অবৈধ পন্থায় উপার্জনের মাধ্যমে সম্পদের প্রাচুর্যতা যেমন দুনিয়ায় অশান্তির কারণ হয়, তেমনি আখিরাতেও রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। হারাম উপার্জনের কোনো দানও আল্লাহ গ্রহণ করেন না।

পবিত্র কুর'আনের আলোকে যা কিছু মানুষের জন্য উপকারী ও বৈধ সেসব খাদ্যের ব্যাপারে ইসলামের বিধান হচ্ছে হালাল ও বৈধ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ •

অর্থ: আমরা অবশ্য অবশ্যি সাহায্য করবো আমাদের রসূলদের এবং মুমিনদের, দুনিয়ার জীবনেও এবং সেদিনও, যেদিন দাঁড়াবে সাক্ষীরা।[২০৯]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ •

অর্থ: হে নবী! বলো: 'কেউ যা খেতে চায়, আমার প্রতি প্রেরিত অহিতে তার মধ্যে মৃত (প্রাণী), কিংবা প্রবাহিত রক্ত, অথবা শুয়োরের গোশ্ত ছাড়া আর কিছুই হারাম পাইনা। এগুলো নোংরা এবং (খাওয়া) পাপ। আর যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে তাও হারাম। কেউ যদি বিদ্রোহ এবং সীমালংঘন না করে নিরূপায় হয়ে পড়ার কারণে এগুলো থেকে কিছু খেয়ে নেয়, (তার ব্যাপারে) অবশ্যি তোমার প্রভু পরম ক্ষমাশীল দয়াময়।'[২১০]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যেসব খাদ্যের ব্যাপারে হারামের কোনো দলিল নেই, তা হালাল ও বৈধ।

সন্তানকে শৈশবকাল থেকেই হালাল হারামের ব্যাপারে সচেতন করতে হবে। ব্যক্তি ও সমাজের ওপর হারাম উপার্জনের প্রভাব খুবই মারাত্মক। হারাম উপার্জনে মানব জীবনে সব ধরনের বরকত উঠে যায়। আর পিতা-মাতাকেও হালাল রিজিকে তৎপর থাকতে হবে। সন্তানদের শান্তি নিশ্চিন্ত করতে গিয়ে তাদের মুখে হারাম খাবার পোশাক দেওয়া তাদের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করারই নামান্তর।

ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত না রাখলে এ সন্তানগণই কিয়ামতে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

---

২০৮. আল কুর'আন, ২:১৮৮

২০৯. আল কুর'আন, ৪০:৫১

২১০. আল কুর'আন, ৬:১৪৫

০৮. সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করা

মা-বাবাদের তাদের প্রত্যেকটি সন্তানের প্রতি সমান, নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সন্তানগণ পিতা-মাতার কাছ থেকে ইনসাফ আশা করে এবং তাদের মাঝে ইনসাফ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে বলেছেন,

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো।"[২১১]

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ •

অর্থ: আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আদল (ন্যায়বিচার) ও ইহসান (উপকার) করার, আত্মীয়-স্বজনকে দান করার। আর নিষেধ করছেন ফাহেশা কাজ, অন্যায় কাজ এবং সীমালংঘন থেকে। তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।[২১২]

সকল মানুষের সাথেই ন্যায় পরায়ণতা করা আবশ্যক। বিশেষ করে সন্তানদের ব্যাপারে সর্বদা ন্যায় বিচার এবং সমতা রক্ষা করতে হবে।

"নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা আমাকে একটি গোলাম দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমর বিনতে রাওয়াহা (রা.) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সাক্ষী না রাখলে আমি এতে সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললেন, আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এরকম দান করেছো? আমি বললাম, না। রাসূল (সা.) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো। তিনি আরো বললেন, তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও। ইমাম শা'বী (রহ.) সূত্রে: তিনি বলেছেন, আমি অন্যায় কাজে সাক্ষী হতে পারি না।[২১৩]

সন্তানদের মধ্যে সমান আচরণ না করার প্রতিফল নিম্নরূপ হতে পারে:

০১. সন্তানেরা তাদের অভিভাবকদের কাছে এমন অন্যায় আচরণ শিখতে পারে এবং ভবিষ্যতে অন্যদের সাথে একই আচরণ করতে পারে।
০২. যে সকল সন্তানেরা এরকম অন্যায়ের শিকার হয়েছে, ভবিষ্যতে তাদের পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য বা বিদ্রোহী হয়ে উঠার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।
০৩. ভাই-বোনদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা বা শত্রুতা জন্মানোর মারাত্মক ঝুঁকি থাকে যা এমন পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে যে তারা একে অপরের ক্ষতি করারও চিন্তা করতে পারে।
০৪. এরকম অবিচার দ্বারা উপকৃত সন্তানগুলোর মনে আত্মবিধ্বংসী গর্ব ও অহংকার তৈরি হতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মনে নিরাশা ও নিপীড়ণের অনুভূতি এবং মানসিক সমস্যা গড়ে উঠতে পারে।

---

২১১. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং-৪০৩৬
২১২. আল কুর'আন, ১৬:৯০
২১৩. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৪৯, হাদীস নং-২৩৯৯

০৯. সন্তানের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা

সন্তানদের জন্য পিতা-মাতার দু'আর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে, আল্লাহর নেক বান্দা তারাই যারা বলে,

• وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ: তারা দু'আ করে এভাবে: আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদের আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানাও। আর আমাদের বানাও মুত্তাকিদের অগ্রগামী।[২১৪]

যাকারিয়া (আ.) আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন,

• هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

অর্থ: ওখানেই যাকারিয়া তার প্রভুর কাছে দু'আ করলো: 'আমার প্রভু! তোমার পক্ষ থেকে তুমি আমাকে একটি উত্তম বংশধর দাও। নিশ্চয়ই তুমি দু'আ শুনে (কবুল করে) থাকো।'[২১৫]

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন প্রাণপ্রিয় সন্তান ও স্ত্রীকে জনমানবহীন মরুভূমি মক্কার সাফা-মারওয়া পাহাড়ের উপত্যকায় রেখে যান, তখন তিনি তাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করেছিলেন। দু'আটি মহান আল্লাহ কবুল করেন এবং পছন্দ করেন।

কুর'আনুল কারীমে দু'আটি উল্লেখ করা আছে। যাতে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের জন্য এভাবে দু'আ করেন।

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ •

অর্থ: আমাদের প্রভু! আমি তো আমার বংশধরদের একটি অংশের বসবাসের ব্যবস্থা করেছি এ অনুর্বর উপত্যকায় তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে। হে আমার প্রভু! এ জন্যে করেছি, যেনো তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং তুমি মানুষের হৃদয় তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিও, আর তাদের জীবিকা দিও ফলফলারি দিয়ে, যাতে করে তারা তোমার শোকর আদায় করে।[২১৬]

সন্তানদের বদ-দু'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: তিনটি দু'আ অবশ্যই কবুল হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। নির্যাতিত ব্যক্তির দু'আ মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের ওপর পিতার বদ-দু'আ।[২১৭]

ইসলাম সন্তানের প্রতি ভালোবাসার আবেগকে খাটো করেও দেখে না এবং তাতে বাধাও প্রদান করে না বরং তাকে উদ্দেশ্যপূর্ণ আখ্যায়িত করে তাতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম এ ব্যাপারে আবশ্যিকভাবে তাকিদ দেয় যে, মুসলিমগণ নিজেদের সন্তানকে দ্বীনের আলোকে ভালোবাসবে।

বস্তুত সন্তানের ভালো নাম না রাখা, কুর'আন ও ইসলামের শিক্ষা দান না করা এবং পূর্ণ বয়সের কালে তার বিয়ের ব্যবস্থা না করা মাতাপিতার অপরাধের মধ্যে গণ্য। এসব কাজ না করলে পিতামাতার পারিবারিক দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। ভবিষ্যত সমাজও ইসলামী আদর্শ

২১৪. আল কুর'আন, ২৫:৭৪
২১৫. আল কুর'আন, ৩:৩৮
২১৬. আল কুর'আন, ১৪:৩৭
২১৭. আবু ঈসা তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৬, হাদীস নং-১৮৫৫

মুতাবিক গড়ে উঠতে পারে না। এ পর্যায়ে একটি ঘটনা উল্লেখ্য: একটি লোক হযরত উমর ফারুকের কাছে একটি ছেলেকে সঙ্গে করে উপস্থিত হয়ে বললো: এ আমার ছেলে, কিন্তু সে আমার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তখন হযরত উমর (রা.) ছেলেটিকে বললেন, তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না? পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বড়ই গুনাহের কাজ তা কি জানো না? সন্তানের উপর পিতামাতার যে অনেক হক রয়েছে তা তুমি কিভাবে অস্বীকার করতে পারো? ছেলেটি বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন, পিতামাতার উপরও কি সন্তানের কোনো হক আছে? হযরত উমর (রা.) বললেন, নিশ্চয়ই এবং সেই হক হচ্ছে এগুলো: ০১. পিতা নিজে সৎ ও ভদ্র মেয়ে বিয়ে করবে, যেনো তার সন্তানের মা এমন কোনো নারী না হয়, যার দরুন সন্তানের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হতে পারে বা লজ্জা অপমানের কারণ হতে পারে। ০২. সন্তানের ভালো কোনো নাম রাখা। ০৩. সন্তানকে আল্লাহর কিতাব ও দ্বীন-ইসলাম শিক্ষা দেয়া। তখন ছেলেটি বললো: আল্লাহর শপথ! আমার এ পিতামাতা আমার এ হকগুলোর একটিও আদায় করেননি। তখন হযরত উমর (রা.) সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন: তুমি বলছো, তোমার ছেলে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, আসলে তো তোমার থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আগে তুমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছো (তার হক নষ্ট করেছো)। উঠো এখান থেকে চলে যাও। তার মানে পিতা মাতা যদি বাস্তবিকেই চান যে, তাদের সন্তান তাদের হক আদায় করুক, তাহলে তাদের কর্তব্য, সর্বাগ্রে সন্তানদের হক আদায় করা এবং তাতে কোনো গাফিলতির প্রশ্রয় না দেয়া।[২১৮]

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা দিন দিন যেভাবে অপসংস্কৃতি, অনৈতিকতা, বেহায়াপনা এবং চরিত্র বিধ্বংসী পরিবেশের দিকে ধাবিত হচ্ছে সেখানে আমাদের সন্তানদের ওপর পিতা-মাতার যেসব দায়িত্ব আছে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় সন্তানকে লালন পালন করা ঈমানের অন্যতম দাবী।

২১৮. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১০), পৃ. ৩৩৪

৩য় অধ্যায়

কুর'আন ও সমাজ

পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকা মানুষের জন্মগত স্বভাব। সমাজকে বাদ দিয়ে মানুষের জীবন যাপন কল্পনা করা যায় না। কুর'আন বিশ্ব মানবতার সামনে একটি সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল সামাজিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে। এ সামাজিক ব্যবস্থা ইসলামী জীবন দর্শনের নির্দেশনা এবং ঐক্য, সংহতি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক দায়িত্ব কর্তব্যর ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

মানুষের মধ্যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ভিত্তিক আকীদার পর সামাজিক আচরণ গুরুত্বপূর্ণ। কুর'আনের এক বিরাট অংশ জুড়ে সামাজিক ইবাদতের ব্যাপারে এসেছে। যে সকল উপাদান নিয়ে সমাজ গঠিত, সে সকল উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার জন্য রয়েছে পবিত্র কুর'আন রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে কুর'আনি সমাজ।

সমাজ হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দান, আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা এবং মানুষের মনে এর বীজ রোপনের উত্তম চারণক্ষেত্র। সমাজ হচ্ছে এমন এক জায়গা যেখানে মানুষের মনে দয়া-মায়া জাগ্রত করা যায়। ভালো কথা, উপকারী কাজ ও সাহায্য সেবার পথ উন্মোচন করা যায়। ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা যায়। সমাজ আল্লাহর বিধি বিধান এবং মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধিকার শিক্ষা দেয়ার উত্তম স্থান। সমাজে রয়েছে স্বামী স্ত্রী, পিতা মাতা, সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন, নিকট ও দূর প্রতিবেশী। রয়েছে ইয়াতীম, মিসকিন, দুস্থ, অসুস্থ, বিপদগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্ত মানুষের মিছিল। সমাজে বসবাসরত এ সকল মানুষদের মধ্যে যখন ইসলামিক ও মানবিক অনুভূতি জাগ্রত হবে তখনই একটি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আল কুর'আন মানুষকে সর্বাধিক বিপজ্জনক বাধা সম্পর্কে সতর্ক করেছে। যা তার জন্য নিয়ামত, ক্ষমা ও দয়ার পথে অন্তরায়।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ • وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ • فَكُّ رَقَبَةٍ • اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ • يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ • اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ • ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ • اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ •

অর্থ: কিন্তু সে কষ্টসাধ্য গিরিপথে অগ্রসর হতে উদ্যোগ নেয়নি। তুমি কিভাবে জানবে, সেই কষ্টসাধ্য গিরিপথ কী? তাহলো) গলা (দাস) মুক্ত করা, কিংবা দুর্ভিক্ষ বা অনাহারের দিনে আহার দান করা এতিম আত্মীয়কে, কিংবা ধুলো মলিন (অভাব পীড়িত) মিসকিনকে, আর সেই সাথে সেইসব লোকদের অন্তরভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবর করার আর রহমদিল হবার। এরাই ডান পাশের লোক।[২১৯]

আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদেরকে আকাংখিত সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য দয়া ও ধৈর্য্যের আহবান জানিয়েছেন। যাতে করে সমাজের এক শ্রেণী আরেক শ্রেণীর ওপর জুলম না করে। একটি সুন্দর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন একজন মুসলিম নিজে ধৈর্য্য

২১৯. আল কুর'আন, ৯০:১১-১৮

ধারণ করে ও অন্যকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দেয় এবং নিজে দয়া করে সাথে সাথে অন্যকেও দয়া অনুগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন:

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۧ

অর্থ: অবশ্যি মানুষ রয়েছে নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে, আমলে সালেহ্ করে, একে অপরকে সত্যের প্রতি অসিয়ত করে (উপদেশ দেয়) এবং (সত্যের উপর) ধৈর্যের সাথে অটল থাকার অসিয়ত করে।[২২০]

একটি সুষ্ঠ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে কেবল স্রষ্টার নির্দেশিত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পবিত্র কুর'আনে এসেছে,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞

অর্থ: তোমাদের মধ্যে অবশ্যি এমন একদল লোক থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) আহবান করবে কল্যাণের দিকে, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দ কাজ থেকে। আর তারাই হবে সফলকাম।[২২১]

একটি সফল ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য সমাজে অভ্যন্তরে এ ধরনের মানুষ থাকাটা জরুরী। যারা সমাজের ভুল পথের মানুষদের সঠিক পথের দিকে ডাকতে পারে ও তাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে। কুর'আনি বিধানগুলো সমাজে বাস্তবায়িত না হলে সামাজিক নিরাপত্তা, পবিত্রতা এক কথায় সার্বিক শৃংখলা হুমকিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সৎ কমের্র আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজের মানুষ সামাজিক শৃংখলা বিধি মেনে চলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হবে। পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধগুলোও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আর তখনই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কল্যাণের বিস্তার ঘটা সম্ভব।

২২০. আল কুর'আন, ১০৩:২-৩

২২১. আল কুর'আন, ৩:১০৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত কুর'আনি সমাজ

সমাজবদ্ধতা মানুষের সাধারণ প্রয়োজন। পরস্পর সহযোগিতা ও আদান প্রদানের মাধ্যএে সমাজ এগিয়ে যায়। ইবাদত-বন্দেগি থেকে শুরু করে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইসলামের সমাজবদ্ধতার নীতি স্পষ্ট। ইসলাম ন্যায়ভিত্তিক আদর্শ সমাজবদ্ধতার শিক্ষা দান করেছে, যা অনুসরণ করার মাধ্যমে সমাজ জীবন শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণপূর্ণ হতে পারে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) পুরো পৃথিবীর সামনে শ্রেষ্ঠ আদর্শ সমাজের মডেল উপস্থাপন করেছেন। রাসূল (সা.) মদীনায় যে সমাজ গড়ে তুলেছিলেন তা ছিলো একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ। মদীনার সে আদর্শ সমাজের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য ছিলো যা দেখে বিশ্ববাসী অবাক হয়েছিলো। প্রভাবিত হয়েছিলো ইসলামের সৌন্দর্যে। ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো ও সুদূর ইউরোপের বহুদেশ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলো। চীনের মতো দূর প্রাচ্যেও ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটেছিলো সে প্রভাবের কারণেই।[২২২]

রাসূল (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত কুর'আনি সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হলো:

০১. সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান ও অবিচলতা

অনেক সময় কোনো বিষয়কে ন্যায় হিসেবে মেনে নিয়েও চাপের কারণে, তার পক্ষালম্বন করে, এর ওপর অবিচল থাকা যায় না। অনেকে সত্যের পথ থেকে হটে যায় লোভে বশিভূত হয়েও। এ জন্যে অন্যকেউ আমাদের অনুসরণ করতে গিয়ে হোঁচট খায়। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তারা হক বিশ্বাস করার পর, আমৃত্যু এর ওপর অটল অবিচল থাকতেন। বাধার প্রাচীর, প্রতিকূল আবহাওয়া, বিভিন্ন রকমের বিপদ-আপদ দেখে কখনো ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হতেন না। দুশমনের হুমকি ধমকি বা লোভ লালসার ফাঁদে কখনো তারা পা দিতেন না।

০২. নিঃস্বার্থ কুরবানী ও অন্যকে অগ্রাধিকার দান

সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলা, দাওয়াতের ময়দানে সফল হওয়ার কার্যকর হাতিয়ার হচ্ছে নিঃস্বার্থ কুরবানী ও অন্যকে অগ্রাধিকার দান। এ বিষয়ে নববী যুগের মদীনার সমাজ সকলের আদর্শ। মহান আল্লাহ তায়ালা এ ময়দানে তাঁদের সক্ষমতার স্বীকৃতি দিয়েছেন, 'তাঁরা নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেন, যদিও স্ব স্ব অবস্থানে তাঁরা (ওই বিষয়ের) মুখাপেক্ষী।' এ-অগ্রাধিকার দান কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিলো না। ধন সম্পদের বেলায় অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার অসংখ্য ঘটনা সাহাবা চরিতে রয়েছে। একজন মানুষের অমূল্য সম্পদ তার জীবন। সেখানেও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) অন্যকে অগ্রাধিকার দিতেন।[২২৩] হিজরতের সময় নবী করীম (সা.) এর বিছানায় হজরত আলী (রা.) শুয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, কীভাবে অন্যের জীবনকে অগ্রাধিকার দিতে হয়।

আরেকটি ঘটনা, ইয়ারমুকের যুদ্ধে একজন আহতের জীবন যখন ওষ্ঠাগত, পানি পানি বলে আত্মচিৎকার করছিলো তখন একলোক ওই আহতের মুখে পানি তুলে ধরলেন; পাশ থেকে

---

২২২. মাওলানা আসজাদ কাসেমী নদভী, *সাহাবা সমাজের বৈশিষ্ট্য ও আমাদের সমাজ*, অনু. শহীদুল ইসলাম (ডেইলি বাংলাদেশ.কম, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮), পৃ. ১, http://m.daily-bangladesh.com

২২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

আওয়াজ আসলো 'পানি পানি', ওই আহত লোকটি নিজে মুমূর্ষ অবস্থায় থেকেও নির্দেশ দিলেন, তাকে পানি পান করাও, আমার চেয়ে তার পিপাসা বেশি।' এ ভ্রাতৃত্বের টানেই হারিস ইবনে হিশাম, আয়য়াশ ইবনে আবি রাবিআহ ও ইকরামা ইবনে আবি জাহল মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একে অপরকে পানি পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে অবশেষে সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন।[২২৪] যুদ্ধের ময়দান, রাসূলের নিরাপত্তা, দীনের হিফাযত ও জাতীয় প্রয়োজন, এমন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর নিঃস্বার্থ কুরবানী ও আত্মত্যাগের ইতিহাস এখনো আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এগুলো দ্বারা অমুসলিমরা কতটুকু প্রভাবিত হতো এবং কীভাবে ইসলামের ছায়ায় এসে আশ্রয় নিতো তাও আমাদের সামনে রয়েছে।

০৩. সমবেদনা ও পরোপকার

সর্বোত্তম মানুষ সে, যে অন্যের উপকার করে। খাঁটি মুসলমান সে, যার জবান ও হাত থেকে অপর মুসলমান হিফাযত থাকে। প্রকৃত মুমিনন ওই ব্যক্তি, যার অনিষ্টতা থেকে মানুষের জান ও মাল নিরাপদ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে ভালো আচরণ করবে সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যাবে। এগুলো একটি ইসলামী সমাজের বুনিয়াদ। রাসূল (সা.) এর যুগে মদীনার সমাজ এ ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে ছিলো। সামাজিক জীবনে পরস্পরের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ অত্যন্ত জরুরী। মানুষের বিপদে সাহায্য করা, সুখ-দু:খে সহানুভূতি প্রকাশ ইসলামী জীবনাদর্শের মৌলিক শিক্ষা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে আবির্ভূত হওয়া তোমার জন্য সদকাস্বরূপ। সৎকাজের জন্য তোমার আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তোমার নির্দেশ তোমার জন্য সদকাস্বরূপ। রাস্তা থেকে পাথর কাঁটা ও হাড় সরিয়ে ফেলা তোমার জন্য সদকাস্বরূপ। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সদকাস্বরূপ।[২২৫]

রাসূল (সা.) বলেছেন: তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারে না যতোক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ভাই পছন্দ করে যা সে নিজের পছন্দ করে।[২২৬]

অন্যের দুখ-কষ্টকে নিজের মনে করা নয় বরং নিজেরটার চেয়ে অন্যেরটার উপলব্ধি বেশি থাকা, এ ছিলো সাহাবায়ে কিরামের সিফাত।

০৪. ন্যায় ও সমতা

আল কুর'আনের সমাজ ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থা। যুলুম ও অবিচারকে ইসলাম কখনো প্রশ্রয় দেয়নি বরং এগুলোকে বিশ্ব শান্তি ও মানব সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি মনে করে। প্রত্যেকজন সাহাবী ইনসাফ ও সমতার প্রত্যাশী ছিলেন। নিজের বিষয়ে বা আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারেও তারা অন্যায় সিদ্ধান্ত কামনা করতেন না। একবার গ্রাম্য এক সাধারণ মুসলমানের পা গাস্সানী সরদার জাবালার কোমরে লেগে যায়। ওই সরদার মুসলমান হয়েছিলো। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে খুব জোড়ে ওই গ্রাম্য লোককে আঘাত করলে, তার নাকের বাঁশি

---

২২৪. উম্মে আইরিন, *ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে রাসূল (সা.) এর আদর্শ* (দৈনিক সংগ্রাম, নারী জগৎ, ৫ আগস্ট ২০১৪), পৃ. ১, www.dailysangram.com

২২৫. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, অনু. মুহাম্মাদ মূসা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ৩৯১, হাদীস নং-১৯০৬

২২৬. মুহিউদ্দিন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী (র.), *রিয়াদুস সালিহীন*, অনু. সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১), খ. ১, পৃ. ১৯০, হাদীস নং-২৩৬

ছিদ্র হয়ে গেলো। হজরত ওমর (রা.) এর নিকট এ মামলা দায়ের হলো। তিনি শুনে ওই সরদারকে পরামর্শ দিলেন, হয় তাকে কোনভাবে রাজী করাও অন্যথায় কিসাসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। জাবাল বললো রায়টা একটু হালকা দেয়া যায় না? হজরত ওমর (রা.) বললেন, ইসলামে আমীর আর ফকিরের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলাম সাম্যের ব্যবস্থা, এখানে বৈষম্যের কোনো সুযোগ নেই। এ কথা শুনে জাবালা সময় নেয়ার ভান করে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু হজরত ওমর (রা.) সুবিচার থেকে সামান্য এদিক সেদিক হননি।[২২৭]

০৫. সামাজিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ

ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না, তার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে না, তাকে অপমান করবে না। প্রত্যেক মুসলিমের মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও রক্তের (জীবনের) ওপর হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলিমের ওপর হারাম। তাকওয়া এখানে (অন্তরে)। কোনো ব্যক্তির মন্দ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করে।[২২৮]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন: এক মুমিন অপর মুমিননের জন্য একটি অট্টালিকাস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।[২২৯]

পরস্পর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম অনন্য। দীর্ঘদিন আওস ও খাজরাজ গোত্র লড়াইরত ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর তারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় হয়ে গেলো। মুনাফিক ও ইহুদীরা শত চেষ্টা করেও তাদের মাঝে কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি। মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে হাওয়া দেয়া, গুজবে কান দেয়া ও পরস্পর খারাপ ধারণা থেকে সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। এ জন্যে তাদের একতা ছিলো অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এমন পর্যায়ের ছিলো যে একে অপরের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি ছিলো।

আর এ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَخًا لِىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّىْ أَحْبَبْتُهُ فِى اللهِ، قَالَ: فَإِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করিম সা. থেকে বর্ণনা করেছেন: এক ব্যক্তি তার (দীনি) ভাইয়ের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অন্য পাড়ায় রওয়ানা করে। আল্লাহ তার গন্তব্য পথে একজন ফেরেশতাকে (মানুষের বেশে) অপেক্ষায় রাখেন। লোকটির পথ অতিক্রমকালে ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে: "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" লোকটি বলে: "ও পাড়ায় আমার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি।" ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে: "তার সাথে কি আপনার

২২৭. উম্মে আইরিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

২২৮. আবু ঈসা তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭৭, হাদীস নং-১৮৭৭

২২৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৮৭৮

কোনো স্বার্থগত বিষয় জড়িত রয়েছে, যা হাসিলের জন্যে আপনি যাচ্ছেন?" লোকটি বললো: "না তা নয়। আমি তার সাথে শুধু এজন্যেই সাক্ষাত করতে যাচ্ছি যে, আমি কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাকে ভালোবাসি।" ফেরেশতা বললো: "তবে শুনে রাখুন! আমি আল্লাহর দূত হিসেবে আপনার নিকট এসেছি, আল্লাহ আপনাকে এ সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনিও আপনাকে ভালোবাসেন, যেমনি আপনি আল্লাহর জন্যে আপনার সেই দীনি ভাইকে ভালোবাসেন।"[২৩০]

عَنْ أَبِىْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىِّ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتًى شَابٌّ بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوْا فِىْ شَيْءٍ،أَسْنَدُوْهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوْا عَنْ قَوْلِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيْلَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِىْ بِالتَّهْجِيْرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ، قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضٰى صَلَاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: وَاللهِ إِنِّىْ لَأُحِبُّكَ لِلّٰهِ، فَقَالَ: اَللهِ؟ قُلْتُ: اَللهِ، فَقَالَ: اَللهِ؟ قُلْتُ: اَللهِ، فَقَالَ: اَللهِ؟ قُلْتُ: اَللهِ، فَأَخَذَ بِحَبْوَةِ رِدَائِىْ فَجَبَذَنِىْ إِلَيْهِ وَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مُحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ •

অর্থ: আবু ইদরিস খাওলানি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি একবার দামেশকের মসজিদে প্রবেশ করে দেখি এক যুবক। তাঁর সামনের দাঁতগুলো উজ্জ্বল দীপ্তিময়। সব লোকেরা তাঁর কাছে জড়ো হয়ে আছে। তারা যেকোনো বিষয়ে মতভেদ করছে, তা মীমাংসার জন্যে তাঁর কাছে পেশ করছে এবং তার বক্তব্য দ্বারা সেটার সঠিকত্ব জেনে নিচ্ছে। আমি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে বলা হলো, ইনি মুয়ায ইবনে জাবাল। পরদিন শেষ রাত্রে আমি শয্যা ত্যাগ করে তাঁর কাছে এলাম। এসে দেখি তিনি আমার আগেই শয্যা ত্যাগ করে সালাত আদায় করছেন। আবু ইদরিস বলেন, আমি তাঁর সালাত শেষ করার অপেক্ষায় থাকলাম। অত:পর তিনি সালাত শেষ করলে আমি তাঁর সামনে দিয়ে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। বললাম: 'আল্লাহর কসম, আমি অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর উদ্দেশ্যে আপনাকে ভালোবাসি।' তিনি বললেন: 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে?' আমি বললাম: 'জি হ্যাঁ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে!' তিনি বললেন: 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে?' আমি বললাম: 'জি হ্যাঁ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে!' তিনি আবারও বললেন: 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে?' আমি বললাম: 'অবশ্যি আল্লাহর উদ্দেশ্যে।' এবার তিনি আমার চাদরের কাছা ধরে টেনে আমাকে তাঁর একেবারে নিকটে নিয়ে গিয়ে বললেন: সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমি রসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "আমার ভালোবাসার উদ্দেশ্যে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার সন্তুষ্টির জন্যে যারা বৈঠকে মিলিত হয়, আমাকে খুশি করার জন্যে যারা একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে এবং আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা একে অপরের জন্যে অর্থ ব্যয় করে, তাদের জন্যে আমার ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে গেছে।"[২৩১]

০৬. কথা ও কাজে মিল

মানুষের কথা ও কাজে মিল না থাকা একটা সমাজ ধ্বংসের জন্য যথেষ্ঠ। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছেও তা অত্যন্ত অপছন্দনীয়। সমাজ সংশোধনের বুনিয়াদ হলো, সমাজের প্রত্যেকজন সদস্য

২৩০. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস* (ঢাকা: বর্ণালি বুক সেন্টার, সেপ্টেম্বর ২০১৯), পৃ. ৩৩২, হাদীস নং-৪৯১

২৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং-৪৯২

আদর্শ দিয়ে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত কায়েম করবে; শুধু কথায় পটু হবে না। হজরত ওসমান (রা.) রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে এ কথাই বলেছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর কথা ও কাজে মিল থাকার কারণে অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

০৭. পবিত্রতা

ইসলাম আমাদের যে সব বিষয়ে মৌলিক শিক্ষা দান করেছে তার অন্যতম হলো তাহারাত বা পবিত্রতা। আল কুর'আনে মানসিক, শারীরিক অর্থনৈতিক সহ সব ধরণের পবিত্রতাকে তাহারাত বলা হয়েছে। 'তওবা' করাতেও তাহারাত বলা হচ্ছে।

রাসূল (সা.) বলেন: পবিত্রতা অর্জন করা ঈমানের অর্ধেক।[২৩২]

পবিত্রতা দুই প্রকার। ০১. শারীরিক বা বাহ্যিক পবিত্রতা। অর্থাৎ ধুলাবালি, ময়লা- আবর্জনা ইত্যাদি থেকে শরীরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। মহান আল্লাহ বাহ্যিক পবিত্রতা সম্পর্কে বলেন:

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ •

অর্থ: তারা তোমার কাছে জানতে চায়, হায়েয (নারীদের মাসিক ঋতুস্রাব) সম্পর্কে। তুমি বলো: এটা একটা অশুচি ও অহিতকর অবস্থা। সুতরাং হায়েয চলাকালে স্ত্রী সহবাস থেকে দূরে থাকো এবং যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করোনা। অতপর তারা যখন পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে আসবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে আসতে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন, ভালোবাসেন পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারীদের।[২৩৩]

ইসলামের মৌলিক ইবাদত সালাতের মধ্যে পবিত্রতা আবশ্যক। পবিত্রতা ছাড়া সালাত সঠিক বলে বিবেচিত হবে না।

দৈহিক পবিত্রতা সম্পর্কে অন্যত্র এসেছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ •

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন সালাতের জন্য উঠবে তখন ধুয়ে নেবে তোমাদের মুখমন্ডল এবং তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত, আর মাসেহ্ করে নেবে তোমাদের মাথা এবং ধুয়ে নেবে তোমাদের পা টাক্নু পর্যন্ত। কিন্তু তোমরা যদি অপবিত্র থাকো তাহলে (আগেই) পবিত্র হয়ে নেবে। তবে যদি রোগাক্রান্ত হয়ে থাকো, কিংবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ যদি

---

২৩২. এম, আফলাতুন কায়সার, *মিশকাত শরীফ* (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৩), খ. ১, হাদীস নং- ২৮১

২৩৩. আল কুর'আন, ২:২২২

পায়খানায় গিয়ে আসো, কিংবা স্ত্রীর সাথে সংগম করে থাকো, অতঃপর যদি পানি না পাও, তবে তাইয়াম্মুম করে নাও ভালো মাটি দিয়ে। তা দিয়ে মাসেহ্ করে নেবে তোমাদের মুখমন্ডল এবং হাত। আল্লাহ্ তোমাদের কষ্টে ফেলতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে, যাতে করে তোমরা হতে পারো শোকরগুজার।[২৩৪]

পোশাকের পরিচ্ছন্নতাও তাহারাত বা পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ • وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ •

অর্থ: তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। আবিলতা (শিরকের অপবিত্রতা) পরিত্যাগ করো।[২৩৫]

০২. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। অর্থাৎ নিজের অন্তরকে পরিষ্কার রাখা। ইসলাম যেম বাহ্যিক পবিত্রতার দিকে গুরুত্ব দিয়েছে তেমনি অন্তরের পবিত্রতার দিকেও গুরুত্ব দিয়েছে। ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত শরীর ও অন্তর দুটোই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا • وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا •

অর্থ: নি:সন্দেহে সফল হলো সে, যে তাযকিয়া (পরিশুদ্ধ, উন্নত ও বিকশিত) করলো নিজেকে। নি:সন্দেহে ব্যর্থ হলো সে, যে দুষিত ও কলুষিত করে ধসিয়ে দিলো নিজেকে।[২৩৬]

রাসূল (সা.) বলেন, জেনে রেখো! মানব দেহে এক টুকরো গোশত রয়েছে। যখন সেটি পরিশুদ্ধ হয়, তার সবকিছুই পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যখন তা কলুষিত হয়, তখন তার সবকিছুই কলুষিত ও বিনষ্ট হয়ে যায়। আর সে গোশতের নাম হলো কলব।[২৩৭]

এ ছাড়াও যাকাত প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পবিত্রতা অর্জনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুর'আন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ •

অর্থ: তাদের মাল-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো। এর ফলে তুমি তাদের পবিত্র পরিশুদ্ধ ও উন্নত করবে। তুমি তাদের জন্যে দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের জন্যে হবে প্রশান্তির কারণ। আল্লাহ্ সব শুনেন, সব জানেন।[২৩৮]

ইসলামের চাওয়া হলো মুসলমান সকল দিক থেকে পাক-পবিত্র থাকবে। তাই সাহাবায়ে কিরামের সমাজ মাথা থেকে পা পর্যন্ত পবিত্র ছিলো। সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তা- চেতনা, ধ্যান-ধারনা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও তারা ছিলেন পাক পবিত্র। তাদের দৃষ্টি, খাবার-দাবার ও পোশাক-আশাক হতো পাক। নির্লজ্জ ও যুলুম অত্যাচার থেকে সমাজ ছিলো পাক। তাদের রাজনীতি ধোকা প্রতারণা

---

২৩৪. আল কুর'আন, ৫:৬

২৩৫. আল কুর'আন, ৭৪:৪-৫

২৩৬. আল কুর'আন, ৯১: ৯-১০

২৩৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, অনু. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল: ১৯৮২), খ. ১, হাদীস নং-৫২

২৩৮. আল কুর'আন, ৯:১০৩

থেকে পবিত্র। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নির্ভর করে বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রকরণের ওপর।

০৮. মানুষের অধিকার আদায়

একজন মুসলিমকে আল্লাহর হকের পাশাপাশি বান্দার হকও আদায় করতে হয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا •

অর্থ: তোমরা সবাই এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করোনা। পিতা-মাতার প্রতি ইহ্‌সান করো এবং আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ব সাথি, ভ্রমণ পথের সাক্ষাত লাভকারী পথিক এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতিও ইহ্‌সান করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অহংকারী দাম্ভিকদের পছন্দ করেননা।[২৩৯]

মহান আল্লাহ সূরা হুজরাতের পরপর তিনটি আয়াতে বান্দার হক সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ • يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ • يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ •

অর্থ: মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে করে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও। হে ঈমানদার লোকেরা! কোনো পুরুষ যেনো অন্য পুরুষকে তিরস্কার না করে। কারণ যাকে তিরস্কার করা হয়, সে তিরস্কারকারী থেকে উত্তম হতে পারে। কোনো নারীও যেনো অপর নারীকে উপহাস না করে। কারণ, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণীর চাইতে উত্তম হতে পারে। তোমরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করোনা এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা। ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা অতি মন্দ। (এমনটি করার পর) যারা তওবা করবে না (অনুতপ্ত হবেনা) তারা যালিম। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা বেশি বেশি ধারণা অনুমান করা থেকে দূরে থাকো, কারণ কোনো কোনো ধারণা অনুমান পাপ। তোমরা অপরের গোপন বিষয় সন্ধান করোনা এবং একে অপরের গীবত করোনা। তোমাদের কেউ কি তার মরা ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে চাইবে? তোমরা এমন

২৩৯. আল কুর'আন, ৪: ৩৬

কাজকে ঘৃণাই করো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তওবা কবুলকারী, পরম দয়াবান।[২৪০]

রাসূল সা. বলেছেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَلَا تَنَافَسُوْا •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: তোমরা অবশ্যি ধারণা অনুমান করা থেকে আত্মরক্ষা করবে। কারণ, ধারণা অনুমান ভিত্তিক কথা অনেক বড় ধরনের মিথ্যা কথা। কারো দোষ সন্ধান করোনা। কারো পিছে গোয়েন্দাগিরি করোনা। বেচাকেনায় ধোঁকাবাজি করোনা। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হয়োনা। একে অপরের সাথে শত্রুতা করোনা। পরস্পরের পেছনে লেগে থেকোনা। বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে: পরস্পর লোভ লালসা করোনা।[২৪১]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ •

অর্থ: আবু হুরায়রা রা. নবী করিম সা. থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: তোমরা নিজেদেরকে হিংসা-বিদ্বেষ করা থেকে রক্ষা করো। কারণ হিংসা-বিদ্বেষ পুণ্যকর্মগুলোকে ঠিক সেভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন জ্বালানি খেয়ে ফেলে।[২৪২]

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ •

অর্থ: আবু বকর সিদ্দিক রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যেকোনো মুমিনের ক্ষতিসাধন করে, কিংবা তার সাথে প্রতারণা করে।[২৪৩]

ইসলামের পবিত্রতম সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা একে অপরের ভাই এবং আল্লাহর ভয়েই তাদেরকে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করা উচিত। এখন পরবর্তী দু'টি আয়াতে এমন সব বড় বড় অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যা সাধারণত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। একে অপরের ইজ্জতের ওপর হামলা, একে অপরকে মনোকষ্ট দেয়া, একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং একে অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির এগুলোই মূল কারণ। এসব কারণ অন্যান্য কারণের সাথে মিশে বড় বড় ফিতনার সৃষ্টি করে।[২৪৪]

---

২৪০. আল কুর'আন, ৪৯: ১০-১২

২৪১. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫, হাদীস নং-২৪০

২৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫, হাদীস নং-২৪২

২৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬, হাদীস নং-২৪৪

২৪৪. সা. আ. আ. মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন*, অনু. মাওলানা মুজাম্মেল হক (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫), খ. ১৫, পৃ. ৮৩

হাদীসে এসেছে, মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে। আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে ব্যক্তিকোনো মুসলিমের বিপদ দূর করবে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন।[২৪৫]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের পাঁচটি হক (অধিকার) রয়েছে। সালামের জবাব দেয়া, রুগ্নকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেয়া (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)।[২৪৬]

অন্য আরেক হাদীসে এসেছে, আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন: যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের মান-ইজ্জতের ওপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে দোযখের আগুন প্রতিরোধ করবেন।[২৪৭]

সুতরাং প্রতিটি মুসলিমের অন্য ভাইয়ের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং অন্যের অধিকার খর্ব হতে পারে এমন ছোট কাজ থেকেও বিরত থাকা অবশ্যই কর্তব্য।

২৪৫. মুহিউদ্দিন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী (র.), *রিয়াদুস সালিহীন*, অনু. সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১), খ. ১, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং ২৩৩

২৪৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯১, হাদীস নং ২৩৮

২৪৭. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, অনু. মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ৩৭৯, হাদীস নং-১৮৮১

২য় পরিচ্ছেদ

কুর'আনি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

কুর'আনি সমাজ বলতে বুঝায় ইসলামী সমাজ। আল কুর'আনের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে উপহার দিয়েছেন দ্বীন ইসলাম। দ্বীন মানে জীবন বিধান, জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং ইসলাম হলো সেই জীবন বিধান বা জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের জীবন যাপনের সঠিক ও যথোপযুক্ত পথ হিসেবে নবীগণের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। ইসলামই ছিলো সকল নবীর দ্বীন। আল কুর'আনে ইসলামের পরিচয় দেয়া হয়েছে দ্বীন হিসেবে।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ •

অর্থ: নিশ্চয়ই দীন আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র ইসলাম। ইতোপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তাদের পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের কাছে এলেম আসার পর ইখতেলাফে লিপ্ত হয়। যারাই কুফুরি করবে আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি, তাদের জেনে রাখা উচিত আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুতগামী।[২৪৮]

অন্যত্র এসেছে,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَ نَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَ لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ •

অর্থ: অংগীকার ভংগের কারণে আমরা তাদেরকে (বনি ইসরাঈলকে) লানত করেছি এবং তাদের অন্তরগুলোকে করে দিয়েছি কঠিন। তারা বিকৃত করতো কথাকে আসল অর্থ থেকে এবং তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একাংশ তারা ভুলে গিয়েছিল। সব সময় তুমি তাদের অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকিদেরকে খিয়ানতকারী দেখতে পাবে। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কল্যাণকামীদের মহব্বত করেন।[২৪৯]

মহাগ্রন্থ আল কুর'আন স্রষ্টার মহাদান এবং বান্দার জন্য রহমতের ভান্ডার। সর্বোপরি বিশ্ব মানবতার মুক্তির মহাসনদ। কুর'আন বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদের ঘোষণা এবং দিশেহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দানের নিমিত্তে আল্লাহ তা'য়ালা কুর'আন অবতীর্ণ করেন। কুর'আনি সমাজে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও রীতিনীতি (ঈমান ও আকীদা) উভয়ই গভীরভাবে প্রোথিত থাকে। আল্লাহরর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতে পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা একজন মুসলিমের কাজ ও আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একজন মুসলিমের কাজে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। মুসলিম জীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কুর'আনী সমাজ হবে আল্লাহর অহির দিক নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত সমাজ। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর হেদায়েতের অনুসরণের বিকল্প নেই। কুর'আনী সমাজ মানে আইন হবে আল্লাহর। সার্বভৌমত্বের মালিক

২৪৮. আল কুর'আন, ৩:১৯

২৪৯. আল কুর'আন, ৫:১৩

হবেন আল্লাহ। কুর'আনি সমাজ মানে রাষ্টের সর্বত্র আদল তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। রাষ্টনায়কও আইনের উর্ধ্বে থাকতে পারবে না। সমাজের সকল মানুষ নিঃশর্তভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। এ সমাজ পরিচালিত হবে পরামর্শভিত্তিক। এখানে ক্ষমতাসীনরা স্বেচ্ছাচারী হতে পারবে না।

কুর'আনি সমাজ সকলের জন্য উন্মুক্ত। এ সমাজের সকল সদস্য সমান মর্যাদার সাথে বসবাস করে এবং নিজেকে বিকশিত করা ও অর্থোপার্জনে সমান সুযোগ পায়। এখানে কোনো সামাজিক বৈষম্য নেই। রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠিত কুর'আনি সমাজে শ্রেণী মানসিকতা ও শ্রেণী সংঘাত দেখা যায়নি। অর্থনৈতিক স্বার্থে উচ্চবিত্ত বা নিম্নবিত্ত লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য কাউকে সংঘবদ্ধ হতেও দেখা যায়নি। এ সমাজে কখনো শ্রেণী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়নি। কুর'আনি সমাজ বর্ণ, গোত্র অথবা জন্মগত কারণে মানুষের মানুষের ভেতর কোনো ব্যবধানকে স্বীকার করেনি। মুসলিমরা চিরুনির দাঁতের মতোই পরস্পর সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহর কাছে পরহেজগারির মানদণ্ড ছাড়া এখানে আর কোনো দিক দিয়ে কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতে পারে না।[২৫০]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরই নীতি ও আদর্শের ওপর খোলাফায়ে রাশেদীন ইসলামী রাষ্ট পরিচালনা করেন। তারপর ধীরে ধীরে রাষ্ট পরিচালনায় পরিবর্তন আসে। এ পরিবর্তন ঘটে বিভিন্ন দিক থেকে। বিগত শতাব্দীগুলোর বিভিন্ন সময় মুসলিম উম্মতের মধ্যে এমন সব মনীষীর আগমন ঘটে যাঁরা রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে যাবতীয় বিকৃতি দূর করে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে খাঁটি ইসলামী সমাজ গড়ার আন্দোলন করেছেন। মনীষীগণ নিজেদের লেখনীর মাধ্যমে, উপদেশ নসীহাত ও বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে বিকৃতি ও বিকৃতির ধারক বাহকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের সংগ্রামের ফলে সকল যুগেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিপুল সাড়া ও জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।[২৫১]

কুর'আনি সমাজের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য সমাজ থেকে এটিকে পৃথক করেছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোচনা থেকে গুরুত্ব বুঝা যায়।

০১. তাওহীদ বিশ্বাস

কুর'আনি সমাজের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদে বিশ্বাস। এ সমাজ মানুষকে এক অদ্বিতীয় আল্লাহর দাওয়াত দেয়। আল্লাহর বাদশাহি ও রাজত্বে কেউ তাঁর অংশীদার নেই। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ •

অর্থ: আমরা শুধুমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য চাই।[২৫২]

তাওহীদের মূলমন্ত্র হলো আসমান ও জমিনের সবকিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে এবং তিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। কু'আনের ঘোষণা:

---

২৫০. ড. আকরাম জিয়া আল উমরী, *রাসূলের (সা.) যুগে মদীনার সমাজ,* অনু. মো. সাজ্জাদুল ইসলাম (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ১৯৯৮), খ. ১, পৃ. ১০১

২৫১. সাজেদা হোমায়রা, *শ্রেষ্ঠ জীবনের পথ* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ৮৯

২৫২. আল কুর'আন, ১:৫

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ۫ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهٗ حَثِیْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ •

অর্থ: তোমাদের প্রভু তো তিনি, যিনি মহাকাশ এবং এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয়টি কালে, অতপর সমাসীন হয়েছেন আরশের ওপর। তিনি দিনকে ঢেকে দেন রাত দিয়ে। তারা পরস্পরকে অবিরামভাবে দ্রুত অনুসরণ করে। সূর্য, চাঁদ এবং তারকারাজি তাঁরই নির্দেশের অধীন। সাবধান, সৃষ্টিও তাঁর, নির্দেশও তাঁর। মহাকল্যাণের মালিক আল্লাহ্ই মহাজগতের প্রভু।[২৫৩]

তাওহীদ বিশ্বাস একজন মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে এবং শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক পরিশীলিত করে। এ বিশ্বাস ইসলামী সমাজের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। এ বিশ্বাসের ফলে এ সমাজ পৃথিবীর সকল সমাজের চেয়ে স্বতন্ত্র একটি মর্যাদা লাভ করেছে। তাওহীদ বিশ্বাস একত্ববাদের এমন রঙ তৈরি করে যা সমাজের সকল নিদর্শন এবং উপাদানে পরিলক্ষিত হয়। কুর'আনি সমাজে আইন হবে আল্লাহর। জনগণের পরিবর্তে সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারী হবেন আল্লাহ।

০২. কুর'আনি সমাজের আবেদন বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন

পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ বলেন:

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰی وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ •

অর্থ: হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে, তারপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং অবগত।[২৫৪]

কুর'আনের এ ঘোষণা মানুষের ঐক্য এবং অভিন্নতার কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। ফলে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে সকল মানুষই ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। কুর'আনি সমাজ গোত্র, বর্ণ, ভাষা, জাতি নির্বিশেষে একটি ব্যাপক ও সার্বজনীন সমাজ ব্যবস্হার কথা বলে। কোনো শহর, নগর বা দেশের জন্য একান্তভাবে কিছু নির্দেশ করে না। আল কুর'আন বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত রহমত ও সুসংবাদের ঘোষণা এবং চরম সমস্যায় জর্জরিত সমাজের আলোকবর্তিকা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, কুটনৈতিক, রাজনৈতিক, আদালতসহ সর্বস্তরে পেশ করেছে নিখুঁত ও শাশ্বত শান্তির সুস্পষ্ট সমাধান।

০৩. নীতি নৈতিকতার অগ্রাধিকার প্রদান

এ বৈশিষ্ট্য কুর'আনি সমাজকে অন্য সব তৎপরতা থেকে পৃথক করেছে। সমাজ ও জাতির উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে নীতি নৈতিকতা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কেননা সমাজে বসবাসের জন্য অন্যর সাথে আচরণের দিকটি প্রধান হয়ে দেখা দেয়। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন:

---

২৫৩. আল কুর'আন, ৭:৫৪

২৫৪. আল কুর'আন, ৪৯:১৩

وَ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا • وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا • وَالَّذِیْنَ یَبِیْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِیَامًا • وَالَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا • اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا • وَ الَّذِیْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ یُسْرِفُوْا وَ لَمْ یَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَیْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا • وَ الَّذِیْنَ لَا یَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا یَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا یَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِكَ یَلْقَ اَثَامًا •

অর্থ: তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত আর দিন। তারা একে অপরের পেছনে আসে। এ ব্যবস্থা করেছেন তাদের জন্যে যারা শিক্ষা গ্রহণ করার এরাদা করে, কিংবা এরাদা করে শোকর আদায় করার। রহমানের দাস তো তারাই যারা জমিনের ওপর চলাফেরা করে বিনয়ী হয়ে। অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদের সাথে বিতর্ক করতে চায়, তারা বলে: 'সালাম।' তারা রাত কাটায় তাদের প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাজদা করে করে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারা দোয়া করে (এভাবে:) 'আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে দূর করে দিও জাহান্নামের আযাব, কারণ তার আযাব তো সর্বগ্রাসী। আর জাহান্নাম তো নিশ্চিতই বাসস্থান এবং আশ্রয়স্থল হিসেবে অতীব নিকৃষ্ট।' তারা যখন খরচ করে, তখন অপব্যয়ও করেনা, কার্পণ্যও করেনা। বরং এই দুইয়ের মাঝখানে অবলম্বন করে মধ্যপন্থা। তারা আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকেও ইলাহ্ (বানিয়ে নিয়ে) ডাকে না। আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করেনা, তবে যথার্থ কারণ থাকলে সঠিক পন্থায়। তারা জিনা করেনা। যে এগুলো করবে, সে অবশ্যি শাস্তি ভোগ করবে।[২৫৫]

হাদীসে বলা হয়েছে,

"মাসরুক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) মুআবিয়া (রা.) এর সাথে কুফায় আগমন করলে আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রা.) কাছে গেলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা উল্লেখ করে বলেন: নবী (সা.) কখনো অশালীন ও অভদ্র ছিলেন না এবং অশিষ্ট ও অশালীন কথাও বলতেন না। তারপর তিনি বলেন নবী (সা.) বলেছেন: তোমাদের যার নৈতিক চরিত্র ও আচরণ ভালো সেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।"[২৫৬]

কুর'আনি সমাজ ব্যবস্থা এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যা মানুষের জন্য নিষ্কলুষ সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং দূর্ভাগ্যের ছায়া থেকেও তাকে রক্ষা করেছে।

০৪. মানুষের প্রতি ভালোবাসা

কুর'আনি সমাজ মানব জাতিকে ঘৃণা, বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, হিংসা ও জিঘাংসা থেকে মুক্ত করে ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং সাম্যের শিক্ষা দিয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.) শত্রুকেও ভালোবাসতেন। যার ফলে শত্রুরা তাঁর ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কুর'আনি সমাজে গালি দেয়া, মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, অন্যায় ব্যবহার ও কাউকে কষ্ট দেওয়া হয় না। ভালোবাসার মাধ্যমেই এ সমাজে শান্তি আর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু

---

২৫৫. আল কুর'আন, ২৫:৬২-৬৮

২৫৬. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, অনু. মাওলানা মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯), খ. ৫, পৃ. ৪০৯, হাদীস নং- ৫৫৯৪

বর্তমান সমাজে মানুষ ভালোবাসার বদলে পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ আর অন্যায় অবিচারের মাধ্যমে পৃথিবীকে অশান্ত করে তুলছে। মানুষের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন না থাকায় ঘৃণা, হিংসা, প্রতিহিংসা আর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বাসনায় পৃথিবীর সর্বত্র আজ অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজমান।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানুষই মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি অত্যাচার চালিয়েছে। আল্লাহরর রহমতপূর্ণ এ ধরণী নরকে পরিণত হয়েছে। রাসূল (সা.) আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আগত রহমাতুল্লিল আ'লামিন। তিনি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে অশান্তময় পৃথিবীকে এ শান্তির আবাসভূমিতে পরিণত করা যায়। জগৎকে শান্তির আবাসভূমিতে পরিণত করতে সবার আগে প্রয়োজন মানুষকে মানুষের ভালোবাসা। একে অপরের প্রতি সদয় হওয়া। রাসূল (সা.) বলেন: "নোমান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (রাসূল সা.) বলেছেন: পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও প্রেম-ভালোবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়।"[২৫৭]

অন্যত্র এসেছে, "জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন: যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।"[২৫৮]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী করিম সা. বলেছেন: মুমিনরা দয়ামায়া ও স্নেহ-মহব্বতের কেন্দ্রস্থল। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে অন্যদের মায়া মহব্বত করেনা এবং তাকেও মায়া মহব্বত করা হয়না।[২৫৯]

٢٦٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ •

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার (ভাইয়ের) প্রতি জুলুম করবেনা, তাকে অন্যের হাতে সঁপে দেবেনা। যে তার (মুসলিম) ভাইয়ের হাজতে (প্রয়োজনে, অভাবে) তাকে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ তার হাজতে (প্রয়োজনে, অভাবে) তাকে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের একটি কষ্ট দূর করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার বিপদসমূহের একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।[২৬০]

এভাবে কুর'আনি সমাজ একটি ভালেবাসাময় সমাজ তৈরি করে।

---

২৫৭. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০৪, হাদীস নং-৫৫৭৭

২৫৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৫৭৯

২৫৯. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২, হাদীস নং-২৫৮

২৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, হাদীস নং-২৬৫

০৫. সাম্যর সার্বজনীনতা

সাম্যর আভিধানিক অর্থ সমতা, সাদৃশ্য বিশেষ করে একই অধিকার, মর্যাদা ও সুযোগ সবাই সমানভাবে পাবে। কুর'আনি সমাজে সমস্ত মানুষ সমান। কুর'আনে বলা হয়েছে,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ •

অর্থ: মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে করে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।[২৬১]

এ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সাম্যর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সালাত আদায় করার সময় সবাই আল্লাহর সামনে একইভাবে দাঁড়ায়। এ সময় কোনো বাদশাহ, সর্দার বা আলেমের জন্য কোনো জায়গা বিশেষভাবে নির্ধারিত হয় না। রমজানে রোজা পালনের সময় সবাই একই রকম ক্ষুধার্ত থাকে। এক্ষেত্রেও ধনী গরীবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। হজ্জ পালনের সময় সবাই একই রকম পোশাক পরিধান করে। আল্লাহর দরবারে একইভাবে সবাই দাঁড়ায়। হজ্জের বিধি বিধানও সবাই একই নিয়মে পালন করে।[২৬২] আইনের ক্ষেত্রেও ইসলামে সকল মানুষের সঙ্গে একইরকম ইনসাফভিত্তিক আচরণ করা হয়। আইন প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। অত্যাচার প্রতিরোধ করে মজলুমকে আশ্রয় দেয়া। কুর'আনি সমাজ সকলকে অন্যায়, অবিচার, খুন ও সন্ত্রাসের উর্ধ্বে উঠে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়।

০৬. ন্যায়ের পতাকাবাহী

বিবর্তনশীল এ পৃথিবীতে আদল ও ইনসাফের কোনো জুড়ি নেই। কুর'আনি সমাজ ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে সমাজে নিয়ে আসে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও শান্তির ফল্‌গুধারা। কুর'আনে বলা হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا •

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার হকদারকে দিয়ে দিতে। তিনি আরো নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সুবিচার করবে। আল্লাহ্‌ তোমাদের অতি উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[২৬৩]

এ সমাজের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা ন্যায়নীতি ভিত্তিক। সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোনো ব্যাপারেই কেউ কারো ওপর জুলুম বা অত্যাচার করতে পারে না। আল্লাহর প্রিয় নবী দাউদ (আ.) একাধারে ছিলেন নবী ও রাষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। তাঁকে দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা নসীহত করেছেন এভাবে,

---

২৬১. আল কুর'আন, ৪৯:১০

২৬২. ডক্টর মোস্তফা আস সাবায়ী, *স্বর্ণযুগে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ*, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ (ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ২০০৬), পৃ. ৪৩

২৬৩. আল কুর'আন, ৪:৫৮

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ •

অর্থ: (আমরা তাকে বলেছিলাম:) 'হে দাউদ! আমরা তোমাকে ভূ-খণ্ডের খলিফা (শাসক) বানিয়েছি, সুতরাং তুমি জনগণের মাঝে সুবিচার করো, নিজস্ব চিন্তা-বাসনার অনুসরণ করোনা, করলে সেটা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব, কারণ তারা হিসাবের দিনটিকে ভুলে যায়।'[২৬৪]

কুর'আনি সমাজ কাফেরদের সাথেও লেনদেন ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইনসাফের নীতিতে অবিচল থাকার নির্দেশ দেয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ •

অর্থ: হে ঈমান আনা লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদাতা হিসেবে অটল অবিচল থাকো। কোনো কওমের প্রতি বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে ন্যায়নীতি বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা আদল ও ইনসাফের নীতি গ্রহণ করো। এটাই তাকওয়ার জন্যে নিকটতর। আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আমল (কর্মকাণ্ড) সম্পর্কে বিশেষভাবে খবর রাখেন।[২৬৫]

কুর'আনি সমাজ এভাবে সমাজের সর্বত্র ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানে রাষ্টনায়কও আইনের উর্ধ্বে থাকেন না।

০৭. যুদ্ধকালীন নৈতিকতা

কুর'আনি সমাজে যুদ্ধনীতির মূল হচ্ছে ন্যুনতম ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে মানবসমাজকে নিরাপদ করা। যুদ্ধকালীন সময়ে নারী, শিশু, রুগ্ন ও নিরীহ মানুষের ওপর যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হয়। এখানে আক্রোশের কোনো স্থান নেই।

শান্তি ও নিরাপত্তার সময় সচ্চরিত্র, নরম ব্যবহার, দূর্বলদের প্রতি দয়া, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহনশীল আচরণ সব সমাজই করতে পারে। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতে এ কাজগুলো সবাই করতে পারে না। কুর'আন শিক্ষা দিয়েছে যুদ্ধের সময় সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করার। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সকলেই অন্তরের নিকৃষ্টতর কঠোরতা এবং প্রতিশোধ স্পৃহার প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু কুর'আনের আলোয় আলোকিত সমাজের মানুষের ভেতর এ রূপ দেখা যায় না।

০৮. অমুসলিমদের সাথে সুন্দর আচরণ

কুর'আনি সমাজ অমুসলিমদের সাথে ভদ্রতা ও সৌজন্যতারর নির্দেশ দেয়। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম অমুসলিম মুখোমুখি হতে হয়। কুর'আনি সমাজে অমুসলিমদের নিরাপত্তা দান ও তাদের সাথে সৌজন্য বজায় রেখে উত্তম আচরণ করা হয়। অমুসলিমদের সাথে সদাচরণ সম্পর্কপ কুর'আনে বলা হয়েছে:

---

২৬৪. আল কুর'আন, ৩৮:২৬

২৬৫. আল কুর'আন, ৫:৮

وَ اِنۡ اَحَدٌ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ اسۡتَجَارَكَ فَاَجِرۡهُ حَتّٰى يَسۡمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبۡلِغۡهُ مَاۡمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا يَعۡلَمُوۡنَ •

অর্থ: মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দাও, যাতে করে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে। কারণ তারা এমন লোক, যারা জানেনা।[২৬৬]

وَ اِنۡ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنۡ تُشۡرِكَ بِىۡ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ۙ فَلَا تُطِعۡهُمَا وَ صَاحِبۡهُمَا فِى الدُّنۡيَا مَعۡرُوۡفًا ۟ وَّ اتَّبِعۡ سَبِيۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ •

অর্থ: তোমার বাবা-মা যদি তোমাকে আমার সাথে শরিক করতে পীড়াপীড়ি করে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো এলেম নেই, সেক্ষেত্রে তুমি তাদের আনুগত্য করোনা। তবে তাদের সাথে বসবাস করো সুন্দরভাবে, আর ইত্তেবা (অনুসরণ) করো তার পথের, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে তো আমারই কাছে, অত:পর আমি তোমাদের সংবাদ দেবো তোমরা যা আমল করতে।[২৬৭]

অমুসলিমদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সূরা মুমতাহিনার এ নির্দেশটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

لَا يَنۡهٰٮكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيۡنَ لَمۡ يُقَاتِلُوۡكُمۡ فِى الدِّيۡنِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوۡكُمۡ مِّنۡ دِيَارِكُمۡ اَنۡ تَبَرُّوۡهُمۡ وَ تُقۡسِطُوۡۤا اِلَيۡهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ •

অর্থ: দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে এবং ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।[২৬৮]

অমুসলিমদের প্রতি সুন্দর মনোভাব পোষণ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

"হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন। একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। তা দেখে রাসূল (সা.) দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি আমরাও দাঁড়ালাম। আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! এ তো এক ইহুদীর লাশ। রাসূল (সা.) তখন বললেন, যখন কোনো লাশ নিতে দেখবে তখন দাঁড়াবে।"[২৬৯]

কুর'আনি সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্যই বিস্ময়কর। সকল ধর্ম ও সকল জাতির জন্য এ সমাজের মধ্যে আকর্ষণীয় শক্তি রয়েছে। কুর'আনি সমাজ অন্যান্য ধর্মের লোকদের নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। যার বাস্তব প্রমাণ দেখা গেছে পৃথিবীর প্রথম ইসলামী রাষ্ট মদীনা প্রজাতন্ত্রে। রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠিত সে কুর'আনি সমাজে মানবগোষ্ঠী এক কলুষমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার নৈতিক মান ও জীবনের অন্যান্য মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সমুচ্চ দিগন্তে উন্নত হয়। তাই কুর'আনি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমদের মধ্যে ভিশন থাকতে হবে। যেমন ভিশন ছিলো রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের মধ্যে। তাঁরা কুর'আনি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শত

২৬৬. আল কুর'আন, ৯:৬
২৬৭. আল কুর'আন, ৩১:১৫
২৬৮. আল কুর'আন, ৬০: ৮
২৬৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩১২

নির্যাতন নিপীড়ন ভোগ করেছিলেন। আপন জন্মভূমি থেকে হিজরত করেছিলেন। কুর'আনে আল্লাহ বলেছেন:

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ؕ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ •

অর্থ: আল্লাহ্ তো সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাকে অন্যসব দীনের ওপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে, মুশরিকরা তা অপছন্দ করলেও।[২৭০]

রাসূল (সা.) ঘুনে ধরা একটি সমাজকে ভেঙ্গে নতুন একটি সমাজ কায়েমের নিরলস চেষ্টা করেছিলেন। সে সমাজই ছিলো কুর'আনি সমাজ। এ সমাজে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, নেতৃত্ব তৈরি ও বিচার ব্যবস্থা সবই হয়েছিলো মানবতার জন্য দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি।

কুর'আনি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সে পথ ও কর্মপদ্বতি অনুসরণ করা প্রয়োজন যে পথ ও কর্মপদ্বতি মুহাম্মদ (সা.) অনুসরণ করে তদানীন্তন সমাজে কুর'আনের রাজ কায়েম করেছিলেন। কুর'আনি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন কুর'আন ও হাদীসের যথাযথ জ্ঞান। কুর'আন ও হাদীসের বিধানগুলো যেসব প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিলো তা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ধারণা থাকাটা খুব জরুরী। মানব রচিত সব মতাদর্শ উৎখাত করে কুর'আনি সমাজের বাস্তব রূপরেখা প্রণয়ন তথা কুর'আনের বিধান কায়েম করা পবিত্র কুর'আন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য। কুর'আনি সমাজ না হলে ইসলামের পূর্ণ রূপায়ন এবং ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুর'আনের সামগ্রীক রূপায়নেরর জন্য কুর'আনি সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কুর'আনি সমাজ প্রতিষ্ঠার ফলে সকল প্রকার জুলুমম নির্যাতনের অবসান ঘটে। আল্লাহ তা'য়ালার নির্ধারিত মানদন্ডে ওজন করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কুর'আনি সমাজে মানবগোষ্ঠী এমন উচ্চ পর্যায়ের জীবনযাত্রা লাভ করে যা অন্য কোনো সমাজে সম্ভব নয়। কুর'আনি সমাজ নির্মাণের মাধ্যমেই কুর'আন নাযিলের হক আদায় সম্ভব। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহরর হেদায়েতের অনুসরণের বিকল্প নেই।

২৭০. আল কুর'আন, ৬১:৯

৩য় পরিচ্ছেদ

আল কুর'আনে বর্ণিত সামাজিক কাঠামোর রূপরেখা

০১. জামা'আতে সালাত আদায়

সালাত ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইবাদত। আর এ মৌলিক ইবাদতটি জামা'আতের সাথে আদায় করা (পুরুষদের জন্য) ইসলামের এক অবধারিত বিধান। জরুরী কারণ ছাড়া জামা'আত বর্জনের কোনো সুযোগ নেই। নেতার পূংখানুপূংখ আনুগত্য, প্রয়োজন হলে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাঁকে শুধরানো, ধনী-গরীব আর ছোট বড় নির্বিশেষে সকলে মিলে মিশে চলা, পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধাগুলো শেয়ার করা সহ সমাজবদ্ধভাবে চলার মৌলিক শিক্ষাগুলো এ জামা'আতে সালাতের মাধ্যমে শিখতে পারা যায়।

জামা'আতে সালাত আদায়ের তাকীদ দিয়ে কুর'আনে বর্ণিত হচ্ছে:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ •

অর্থ: তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দিয়ে দাও এবং রুকু করো রুকুকারীদের সাথে।[২৭১]

রাসূল (সা.) জামা'আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি সারা জীবন ফরয সালাতগুলো জামা'আতের সাথে আদায় করেছেন। মাঝে মাঝে তিনি সালাতের শেষে অনুপস্থিদের খোঁজ খবর নিতেন। সমাজবদ্ধ হয়ে মিলে মিশে চলার জন্য আরও যা যা করণীয়, সেসব নির্দেশনা এখান থেকেই জারি করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা সালাতের চেয়ে জামা'আতের সালাতের সাতাশ গুণ বেশি ফযীলত বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً •

অর্থ: জামা'আতের সালাত একা সালাতের চেয়ে সাতাশগুণ বেশি মর্তবা রাখে।[২৭২]

এমনকি বিনা ওযরে জামা'আত ত্যাগ করার জন্য শক্ত হুঁশিয়ারিও এসেছে।

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ •

অর্থ: ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি উদ্যত হয়েছিলাম যে, কাউকে লাকড়ি জমা করতে বলি, এরপর সালাতের জন্য আযান দিতে বলি। আযান দেয়া হলে একজনকে জামা'আতের ইমাম বানিয়ে আমি ঐ সব লোকের কাছে যাই, (যারা জামা'আত ছেড়ে ঘরে বসে রয়েছে) আর তাদের ঘরবাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেই![২৭৩]

০২. ঐক্য

---

২৭১. আল কুর'আন, ২:৪৩

২৭২. ইমাম হাফেয আবু মুহাম্মাদ যাকীউদ্দীন আব্দুল আযী, *আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব*, অনু. হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক (ঢাকা: হাসনা প্রকাশনী, ২০০০) খন্ড-১, পৃ. ১৬৪, হাদীস নং-২৪১

২৭৩. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৪৪

ঐক্য ও সংহতি মুসলিম জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামী সমাজ-বিধির এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে ঐক্য। ধর্মীয় বিধান ও সামাজিক ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রে চিন্তাগত ও কর্মগত একতা রক্ষার ও বিচ্ছিন্নতা পরিহারের আদেশ খুব তাকিদের সাথে দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِيْ ذِمَّتِهِ •

অর্থ: আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাদের মতো সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের জবেহ করা পশুর গোশ্ত খায়, সে একজন মুসলিম। তার নিরাপত্তা প্রদানের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করোনা।[২৭৪]

কুর'আন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে:

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا •

অর্থ: তোমরা সবাই মিলে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো আল্লাহ্র রজ্জুকে (কুর'আনকে) এবং বিচ্ছিন্ন- ভাগ ভাগ হয়ে থেকো না। স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা! তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশএ, আর তিনিই তোমাদের অন্তরে তোমাদের পরস্পরের জন্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে পরস্পরের ভাই হয়ে গিয়েছো।[২৭৫]

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ •

অর্থ: তোমরা ওদের মতো হয়োনা, যাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং লিপ্ত হয়েছিল ইখতিলাফে। এরা হলো সেইসব লোক যাদের জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব।[২৭৬]

'হাবলুল্লাহ' অর্থ- আল্লাহর রজ্জু। অর্থাৎ আল কুর'আন এবং আল্লাহর সাথে কৃত বান্দার সকল অঙ্গিকার, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গিকারটি এ যে, আমরা শুধু রবেরই ইবাদত করব, অন্য কারো নয়। এ কারণে ইসলামে ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ- এক আল্লাহর ইবাদত, এক আল্লাহর ভয়।

তাওহীদের সমাজকে ইসলাম আদেশ করে সীরাতে মুস্তাকীম ও সাবীলুল মুমিনীনের ওপর একতাবদ্ধ থাকতে, নিজেদের ঐক্য ও সংহতি এবং সৌহার্দ ও সম্প্রীতি রক্ষা করতে। ইজমা ও সাবীলুল মুমিনীনের বিরোধিতা পরিহার করতে এবং এমন সব কর্মকান্ড থেকে

২৭৪. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০, হাদীস নং-২২

২৭৫. আল কুর'আন, ০৩: ১০৩

২৭৬. আল কুর'আন, ০৩: ১০৫

বিরত থাকতে, যা উম্মাহর একতা নষ্ট করে এবং সম্প্রীতি বিনষ্ট করে। ঐক্য সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আরো বলা হয়েছে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ •

অর্থ: মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে করে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।[২৭৭]

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা জামা'আতের সাথে থাক এবং বিচ্ছিন্নতা পরিহার কর। কারণ শয়তান থাকে সঙ্গীহীনের সাথে। আর দু'জন থেকে সে থাকে দূরে।[২৭৮]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও সীরাতকে সামনে রেখে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, 'আল জামাআ'-এর অর্থে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শামিল:

০১. আমীরুল মুমিনীন বা সুলতানের কর্তৃত্ব স্বীকারকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া এবং শরীয়তসম্মত বিষয়ে তার আনুগত্য বর্জন না করা।

০২. শরীয়তের আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে উম্মাহর 'আমলে মুতাওয়ারাছ' তথা সাহাবা-তাবেয়ীন যুগ থেকে চলে আসা কর্মধারা এবং উম্মাহর সকল আলিম বা অধিকাংশ আলিমের ইজমা ও ঐক্যের বিরোধিতা না করা।

০৩. হাদীস-সুন্নাহ এবং ফিকহের ইলম রাখেন, এমন উলামা-মাশাইখের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখা। ইমাম তিরমিযি (রহ.) আহলে ইলম থেকে আল জামা'আতের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে:

أهل الفقه والعلم والحديث •

অর্থ: জামা'আত হচ্ছে ফিকহ ও হাদীসের ধারক আলিম সম্প্রদায়।

০৪. মুসলিম সমাজের ঐক্য, সংহতি এবং ঈমানী ভ্রাতৃত্বের উপাদানসমূহের সংরক্ষণ এবং অনৈক্য, বিবাদ ও হানাহানির উপকরণসমূহ থেকে সমাজকে মুক্ত করার প্রয়াস, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

এখানে যে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হলো সাধারণত আল জামা'আতের ব্যাখ্যায় এগুলোকে আলাদা আলাদা মত হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এদের মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই। প্রত্যেকটি হচ্ছে আল জামা'আতের বিভিন্ন দিক।[২৭৯]

০৩. মাশওয়ারা ও পরামর্শ

মাশওয়ারা ইসলামী সমাজ ও সমষ্টিগত জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরামর্শের দ্বারা পরস্পর ঐক্য সৃষ্টি হয়, উত্তম ব্যবস্থা ও সমাধান বের হয়ে আসে, চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিশ্লেষণ, আলোচনা-পর্যালোচনার ধারা শক্তিশালী হয় এবং ব্যক্তিগত ভুল-ভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা সহজ হয়।

---

২৭৭. আল কুর'আন, ৪৯:১০

২৭৮. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, অনু. মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭), হাদীস নং-২১৬৫

২৭৯. মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ, *সমাজ গঠনে সীরাতের ভূমিকা* (মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৭) http://www.alkawsar.com>article

ইসলামে ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং ব্যবস্থাপনাগত বিষয়াদি উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে মাশওয়ারার বিধান। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আল্লাহ তায়ালা পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তিনি ছিলেন নবী ও রাসূল। ইরশাদ হয়েছে:

وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ •

অর্থ: (প্রয়োজনীয় বিষয়ে) আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন।[২৮০]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাত এ কুর'আনি বিধানের বাস্তব দৃষ্টান্ত। খন্দকের যুদ্ধে এবং ইফকের ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। যুদ্ধ ও সন্ধি সবক্ষেত্রেই পরামর্শ করেছেন।

মাশওয়ারার দ্বারা সংশ্লিষ্টদের মাঝে যে প্রেরণা ও উদ্যম তৈরি হয় তার উদাহরণ দিতে গিয়ে ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, বদর যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শের জন্য সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে বসলেন এবং সবার কাছে পরামর্শ চাইলেন, তখন হযরত সা'দ ইবন মু'আজ (রা.) দাঁড়িয়ে এক উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিলেন যে, আমি আনছারদের পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি, আপনি যেখানে ইচ্ছা যাত্রা করুন। যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক স্থাপন করুন। কিংবা সম্পর্ক ছিন্ন করুন, আল্লাহর কসম, আপনি যদি (সুদূর) বারকুল গিমাদেও যেতে চান, আমরা আপনার সঙ্গে যাব। আল্লাহর কসম আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে এ সাগরে ঝাঁপ দিতে চান আমরাও ঝাঁপ দিব। হযরত মিকদাদ (রা.) বললেন, আমরা হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের মতো বলবো না যে, আপনি ও আপনার রব গিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। বরং আমরা আপনার ডান দিকে, বাম দিকে, আপনার সামনে, পিছনে- সব জায়গায় থেকে লড়াই করবো।[২৮১] কুর'আন মাজীদে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করাকে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে:

وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ •

অর্থ: তাদের কর্ম পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে হয়।[২৮২]

০৪. পরস্পর সহযোগিতা

ইসলামী সমাজ-বিধির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'তাআউন'-পরস্পর সহযোগিতা। এক্ষেত্রে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতি ও বিধান, যার দ্বারা ইসলামের সমাজ-বিধি অন্য সকল জাহেলী সমাজ-ব্যবস্থা থেকে আলাদা।

ইসলামে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তি হচ্ছে 'বির' ও 'তাকওয়া' অর্থাৎ 'সদাচার' ও 'পরহেযগারি'। আল্লাহ বলেন:

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ •

অর্থ: আর পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো, তবে পাপও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।[২৮৩]

---

২৮০. আল কুর'আন, ০৩: ১৫৯

২৮১. হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (র.), *তাফসীর ইব্নে কাসীর।* অনু. ড. মুহাম্মাদ মুজীবর রহমান (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ১৯৯৫) পৃ. ৭৮৭-৭৮৮

২৮২. আল কুর'আন, ৪২: ৩৮

রাসূল সা. বলেছেন:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: "ভালো কাজের পথপ্রদর্শক ও উদ্বুদ্ধকারী কাজটি সম্পাদনকারীর সমতুল্য। আর বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা আল্লাহর অতীব পছন্দনীয়।"[২৮৪]

শুধু বংশ, গোত্র, দল, বন্ধুত্ব ইত্যাদি কারণে কারো অন্যায়কর্মে সহযোগিতা ইসলামে 'আসাবিয়্যা' বা সাম্প্রদায়িকতা নামে অভিহিত এবং সম্পূর্ণ বর্জনীয়। এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন:

مَا الْعَصَبِيَّةُ؟

আসাবিয়্যা (সাম্প্রদায়িকতা) কী? নবীজী উত্তরে বললেন:

أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ •

অর্থ: তুমি তোমার কাওমকে যুলমের ক্ষেত্রে সাহায্য করা।[২৮৫]

আরেক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ •

অর্থ: সে আমাদের নয় যে আসাবিয়্যার দিকে ডাকে। সে আমাদের নয় যে আসাবিয়্যার কারণে লড়াই করে। সে আমাদের নয় যে আসাবিয়্যার ওপর মৃত্যুবরণ করে।[২৮৬]

০৫. মানবীয় সাম্য

কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ •

অর্থ: হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে, তারপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং অবগত।[২৮৭]

---

২৮৩. আল কুর'আন, ৫: ২

২৮৪. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬, হাদীস নং-৩০৩

২৮৫. আবু দাউদ সিজাস্তানি, *সুনানু আবী দাউদ* (বৈরুত: লেবানন, দারু ইহইয়াতিত তুরাছিল আরাবী, ১৯৭৫), হাদীস নং-৫১১৯

২৮৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১২১

২৮৭. আল কুর'আন, ৪৯: ১৩

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى •

অর্থ: হে মানুষ! শোনো, তোমাদের রব একজন তোমাদের আব (বাবাও) একজন। শোনো কোনো আরবীর শ্রেষ্ঠত্ব নেই কোনো আজমীর ওপর। আর না কোনো আজমীর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে কোনো আরবীর ওপর। না কোনো লাল বর্ণের কৃষ্ণ বর্ণের ওপর আর না কৃষ্ণ বর্ণের লাল বর্ণের ওপর। শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাকওয়ার কারণে।

মানবীয় সাম্যের মূল কথাটি হচ্ছে সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এবং সকলেই আদম-সন্তান। সুতরাং মানুষ হিসেবে কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তাকওয়া।[২৮৮]

০৬. দুর্বলের প্রতি ইনসাফ করা

একটি প্রবাদ আছে, 'মানুষ শক্তের ভক্ত নরমের যম'। সমাজে যে শ্রেণিটি দুর্বল ও অসহায় অনেক মানুষ তাদের প্রতি অন্যায় করে এবং ইনসাফ করে না। দুর্বলরা দ্বারে দ্বারে ঘুরেও ন্যায় বিচার পায় না। তাদের ক্ষেত্রে 'বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে'। কিন্তু ইসলাম সবল দুর্বল সকলের জন্য সমভাবে ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ দেয়। শুধু তাই নয় যালেমদের যুলুম থেকে দুর্বলদের মুক্তির জন্য ইসলাম লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষ করে যে সকল দুর্বল লোকদেরকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত করা হয় তাদের মুক্তির জন্য কাজ করা। আল কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا •

অর্থ: তোমাদের কী হয়েছে, কেন তোমরা লড়াই করছো না আল্লাহ্‌র পথে! সেসব দুর্বল অসহায় নর, নারী ও শিশুদের জন্যে, যারা ফরিয়াদ করে বলছে: 'আমাদের প্রভু! আমাদের বের করে নাও এ জনপদ থেকে। এর অধিবাসীরা যালিম। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে একজন অলির (অভিভাবকের) ব্যবস্থা করে দাও এবং ব্যবস্থা করে দাও একজন সাহায্যকারীর।'[২৮৯]

অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ • الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ •

অর্থ: অনুমতি দেয়া হলো (প্রতিরোধের) যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে, কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। অবশ্যি তাদের সাহায্য করতে আল্লাহ্‌ সক্ষম। (কারণ) তাদেরকে না হকভাবে খারিজ করে দেয়া হয়েছে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে। (তাদের বের করে দেয়া হয়েছে) শুধু এ কারণে যে, তারা বলে: 'আল্লাহ্‌ আমাদের রব।'[২৯০]

---

২৮৮. মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ, *সমাজ গঠনে সীরাতের ভূমিকা* (মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

২৮৯. আল কুর'আন, ৪: ৭৫

২৯০. আল কুর'আন, ২২: ৩৯-৪০

এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: তোমার ভাইকে সাহায্য কর। চাই সে স্বৈরাচারী যালেম হোক অথবা মজলুম। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি মজলুম হয় আমি তাকে সাহায্য করবো। আপনার কি মত, সে যদি যালেম হয় তবে আমি তাকে কি করে সাহায্য করতে পারি? তিনি বলেন, তাকে যুলুম করা থেকে বিরত রাখো, বাধা দেও। এটাই তাকে সাহায্য করা।[২৯১]

ন্যায় ইনসাফের বিপরীত হলো যুলুম। যালেমদেরকে প্রতিহত করে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا •

অর্থ: মন্দ ও পাপের কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, তবে যার প্রতি যুলুম করা হয়েছে, তার কথা ভিন্ন। আল্লাহ সব শুনেন, সব জানেন।[২৯২] আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ • إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ •

অর্থ: তবে যারা অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের অপরাধ ধরা হবে না। অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে তদেরকে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[২৯৩]

০৭. ইয়াতিমদের প্রতি সদাচার

দুর্বল শ্রেণির অন্যতম হলো পিতৃহীন বা ইয়াতিম। এ দুর্বলদের প্রতিও চরম অন্যায় করা হয়। তাদেরকে প্রাপ্য সম্মান ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাদেরকে গলা ধাক্কা দেওয়াসহ নানাভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। কিন্তু ইসলাম এ দুর্বল শ্রেণির প্রতি ন্যায় ইনসাফ ও সদাচারের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ •

অর্থ: তোমরা সবাই এক আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করোনা। পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিনদের প্রতি ইহ্সান করো।[২৯৪]

ইয়াতিমদের ব্যাপারে রাসূল সা. বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ •

---

২৯১. মুহিউদ্দিন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী (র.), *রিয়াদুস সালিহীন*, অনু. সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১), খ. ১, পৃ. ১৯০, হাদীস নং-২৩৭

২৯২. আল কুর'আন, ৪: ১৪৮

২৯৩. আল কুর'আন, ৪২: ৪১-৪২

২৯৪. আল কুর'আন, ৪: ৩৬

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: মুসলিমদের সর্বোত্তম ঘর হলো সেই ঘর, যে ঘরে কোনো এতিম আছে এবং তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করা হয়। আর মুসলিমদের নিকৃষ্ট ঘর হলো সেই ঘর যাতে কোনো এতিম আছে এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।[২৯৫]

আল কুর'আনে ইয়াতিমদেরকে ধমক দিতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ •

অর্থ: আর ইয়াতিমদেরকে ধমক দিও না।[২৯৬]

যারা ইয়াতিমকে গলাধাক্কা দেয় তারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না বলে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ • فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ •

অর্থ: তুমি কি দেখেছো ঐ ব্যক্তিকে, যে (পরকালের) প্রতিদানকে করে অস্বীকার? এ ব্যক্তিই ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় ইয়াতিমকে।[২৯৭]

ইয়াতিমকে সম্মান না করা দুনিয়ায় দারিদ্র ও লাঞ্ছনার কারণ বলে আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন।

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ • كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ •

অর্থ: আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার জীবন সামগ্রী সংকুচিত করে দিয়ে, তখন সে বলে: 'আমার প্রভু আমাকে হীন করেছেন।' না ব্যাপার এমনটি নয়; বরং তোমরাই ইয়াতিমদের প্রতি দয়া এবং সম্মান প্রদর্শন করো না।[২৯৮]

অপরদিকে যে সকল কাজ করলে কল্যাণ ও সওয়াব লাভ হয় তার অন্যতম হলো ইয়াতিমের ভরণ-পোষণ করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ •

অর্থ: পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে (প্রকৃত পক্ষে) কোনো পুণ্য নেই। বরং পুণ্য তো হলো: মানুষ ঈমান আনবে এক আল্লাহ্‌র প্রতি, শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং নবীদের প্রতি; আর তাঁর (আল্লাহ্‌র) ভালোবাসায় মাল-সম্পদ দান করবে আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতিমদের, মিসকিনদের, পথিক-পর্যটকদের,

২৯৫. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯, হাদীস নং-২৮২

২৯৬. আল কুর'আন, ৯৩: ৯

২৯৭. আল কুর'আন, ১০৭: ১-২

২৯৮. আল কুর'আন, ৮৯: ১৬-১৭

সাহায্যপ্রার্থীদের এবং মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির কাজে; আর সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান (পরিশোধ) করবে; তাছাড়া প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণকারী হবে এবং অর্থসংকট, দুঃখ-কষ্ট ও সত্য মিথ্যার সংগ্রামে সবর অবলম্বনকারী হবে। মূলত এরাই (তাদের ঈমান ও ইসলামের দিক থেকে) সত্যবাদী এবং এরাই (প্রকৃত) মুত্তাকি।[২৯৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতবাসীদের জান্নাতে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করে বলেন:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا •

অর্থ: আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা তাদের খাদ্য দান করে দেয় মিসকিন, ইয়াতিম ও বন্দিদেরকে।[৩০০]

রাসূল সা. বলেছেন:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وفرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا •

অর্থ: সাহল বিন সাআদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: আমি এবং এতিমের দায়িত্ব বহনকারী- সেই এতিম তার নিকটাত্মীয়ের হোক কিংবা অন্য কারো- জান্নাতে এরকম (কাছাকাছি) থাকবো। একথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী এবং মধ্যমা দিয়ে ইশারা করে দেখালেন এবং উভয় আঙুলের মধ্যখানে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন।[৩০১]

ইয়াতিমদের প্রতি আরো দু'টি উপায়ে অন্যায় করা হয়। প্রথমত: পিতার মৃত্যুর পর তাদের সম্পদ তাদেরকে না দিয়ে গ্রাস করার চেষ্টা করা হয়। অগত্যা দিতে হলেও সামান্য কিছু দিয়ে অথবা ভালো সম্পদ নিজে নিয়ে অপেক্ষাকৃত খারাপ সম্পদ দিয়ে তাদেরকে বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন:

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا •

অর্থ: দিয়ে দাও ইয়াতিমদেরকে তাদের মাল-সম্পদ। ভালো সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল করো না। তোমরা গ্রাস করো না তাদের মাল-সম্পদ তোমাদের মাল-সম্পদের সাথে মিশিয়ে নিয়ে। কারণ, এটা একটা কবিরা গুনাহ্।[৩০২]

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا •

অর্থ: আর তোমরা ইয়াতিমদের যাচাই-পরীক্ষা করতে থাকো, যতোদিন তারা বিবাহযোগ্য-বালেগ না হয়। অতঃপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে ভালোমন্দ যাচাই করার মতো যোগ্যতার সন্ধান পাও, তখন তাদের মাল-সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও। তারা বড় হয়ে তাদের

২৯৯. আল কুরআন, ২: ১৭৭

৩০০. আল কুরআন, ৭৬: ৮

৩০১. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯, হাদীস নং-২৮৩

৩০২. আল কুরআন, ৪: ২

সম্পদ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এ ভয়ে অপচয় করে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না।[৩০৩] অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ •

অর্থ: ইয়াতিমরা বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম পন্থায় ছাড়া তাদের মাল সম্পদের কাছেও যেয়ো না।[৩০৪]

উত্তম ব্যবস্থায় ইয়াতিমের সম্পদ ব্যবহার বলতে কী বুঝায়, তা অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ •

অর্থ: যে (ইয়াতিমের যে তত্ত্বাবধানকারী) সম্পদশালী, সে যেনো (ইয়াতিমদের সম্পদ থেকে তত্ত্বাবধানের খরচ নেয়া থেকে) বিরত থাকে। তবে অভাবী হলে প্রচলিত সঙ্গত পরিমাণ গ্রহণ করবে।[৩০৫]

যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস, করে তাদেরকে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا •

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা যুলুম করে (অন্যায়ভাবে) ইয়াতিমদের মাল-সম্পদ গ্রাস করে, তারা ভক্ষণ করে তাদের উদরে আগুন এবং তাদেরকে দগ্ধ করা হবে জ্বলন্ত আগুনে।[৩০৬]

দ্বিতীয়ত: সম্পদের লোভে বা অন্য কোনো কারণে ইয়াতিম নারীদের বিবাহ করে, কিন্তু তাদের প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ করে না এবং স্ত্রী হিসেবে যথাযথ মর্যাদা দেয় না, বরং তাদের প্রতি উপেক্ষা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। আল কুর'আনে এটিকেও নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ •

অর্থ: আর তোমরা যদি আশংকা করো, ইয়াতিম-মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে যেসব নারীদের তোমরা পছন্দ করো, তাদের মধ্য থেকে বিয়ে করে নাও দুই, তিন, বা চারজনকে।[৩০৭]

মোট কথা ইয়াতিমদের প্রতি সর্বাবস্থায় ন্যায় বিচার ও সদাচার করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ •

---

৩০৩. আল কুরআন, ৪: ৬
৩০৪. আল কুরআন, ৬: ১৫২, ১৭: ৩৪
৩০৫. আল কুরআন, ৪: ৬
৩০৬. আল কুরআন, ৪: ১০
৩০৭. আল কুরআন, প্রাগুক্ত: ৩

অর্থ: আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন, ইয়াতিমদের ব্যাপারে তোমরা সুবিচার করবে।[৩০৮]

ইয়াতীমদের যারা লালন পালন করে, তাদের সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন: 'আমি ও ইয়াতীমদের লালন-পালনকারী বেহেশতে এভাবে একত্র থাকবো। (এই বলে) তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং দুটোর মাঝখানে ফাঁক করলেন।[৩০৯]

৩০৮. আল কুরআন, প্রাগুক্ত: ১২৭

৩০৯. মুহিউদ্দিন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী (র.), *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৯, হাদীস নং-২৬১

৪র্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামের সামাজিক সুবিচার

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের দ্বন্দ্ব ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে সত্যের আলো উদ্ভাসিত হয়েছে, সেখানেই অন্ধকারের অমানিশার বাঁধার প্রাচীর তৈরি হয়েছে। সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটাতে সামাজিক সুবিচার কার্যকর একটি পদ্বতি। মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব খতম করে শোষণের হাত থেকে বিশ্ব মানবতার মুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব জাগিয়ে তোলাই এর প্রধান লক্ষ্য। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۪ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ •

অর্থ: প্রথমে সব মানুষ ছিলো একই আদর্শের অনুসারী। অতপর আল্লাহ নবীদের পাঠাতে থাকেন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে। তাদের সাথে সত্য ও বাস্তবতাসহ কিতাব নাযিল করেন, যাতে করে মানুষের মাঝে ফায়সালা করে দেয়া যায়, যেসব বিষয়ে তারা লিপ্ত হয়েছে মতভেদে। যাদেরকে তা (কিতাব) দেয়া হয়েছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন আসার পর কেবল পারস্পারিক বিদ্বেষ বশতই তারা সে বিষয়ে এখতেলাফ করেছে। তারপর তারা যে বিষয়ে এখতেলাফ (মতভেদ) করতো, সে বিষয়ে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে সঠিক পথ দেখিয়েছেন তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে। আল্লাহ যাকে চান, সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।[৩১০]

ইসলামের সামাজিক সুবিচার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান তখনই লাভ করা যাবে যখন তাওহীদ, সৃষ্টি জগত, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাধারার জ্ঞান থাকবে। ইসলাম এমন একটি অবিভাজ্য পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন, যার প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা অন্যান্য শাখা-প্রশাখার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

সৃষ্টি জগত, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের একটি মৌলিক চিন্তাধারা ও বুনিয়াদী দর্শন বিদ্যমান আছে। সামাজিক সুবিচারের ধ্যান ধারণা ও রূপরেখা হলো সে মৌলিক চিন্তাধারা ও বুনিয়াদী দর্শনেরই একটি বাস্তব আলোকরশ্মি। এ দর্শন ইসলামী ইনসাফকে এমন একটি উদারময় ও সার্বজনীন মানবিক ইনসাফের রূপ দিয়ে পেশ করে যেখানে জীবনের মৌলিক মূল্যবোধ বস্তুজগত ও আধ্যাত্মিক জগত উভয়ের ভিতর নিহিত। সামাজিক ইনসাফ কায়েমের ইসলামী বিধানাবলী তিনটি মৌলিক নীতির ওপর নির্ভরশীল। নীতিগুলো হলো:

ক. আত্মার অবাধ স্বাধীনতা ও পূর্ণ মুক্তি
খ. পূর্ণ সামাজিক সাম্য
গ. স্থায়ী ও সুষ্ঠ সামাজিক বণ্টন[৩১১]

---

৩১০. আল কুর'আন, ২:২১৩

৩১১. সাইয়্যদ কুতুব শহীদ, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, অনু. মাওলানা কারামত আলী নিযামী (ঢাকা: এ. এইচ. পি প্রকাশনী, ২০১৫) পৃ. ৭৬

আল কুর'আনে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশ্বের সমগ্র মানবজাতি একই মাটির উপাদান দিয়ে সৃষ্টি এবং একই নিয়মে লালিত-পালিত।

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ سُلٰلَةٍ مِّنۡ طِيۡنٍ • ثُمَّ جَعَلۡنٰهُ نُطۡفَةً فِىۡ قَرَارٍ مَّكِيۡنٍ • ثُمَّ خَلَقۡنَا النُّطۡفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقۡنَا الۡعَلَقَةَ مُضۡغَةً فَخَلَقۡنَا الۡمُضۡغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوۡنَا الۡعِظٰمَ لَحۡمًا ۟ ثُمَّ اَنۡشَاۡنٰهُ خَلۡقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِيۡنَ •

অর্থ: আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর তাকে আমরা নোতফা (শুক্রবিন্দু) হিসেবে স্থাপন করি এক নিরাপদ দুর্গে। তারপর আমরা নোতফাকে রূপান্তরিত করি আলাকা-তে (শক্তভাবে আঁটকে থাকা জিনিসে), তারপর আলাকা-কে রূপান্তরিত করি মুদগায় (পিণ্ডতে), তারপর মুদগাকে রূপান্তরিত করি হাড়-অস্থিতে, তারপর হাড়-অস্থিকে ঢেকে দেই গোশ্ত দিয়ে, তারপর আমরা তাকে বানিয়ে নিই অন্য এক সৃষ্টি। সুতরাং সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কতো যে বরকতওয়ালা![৩১২]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ وَّ اُنۡثٰى وَ جَعَلۡنٰكُمۡ شُعُوۡبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۡا ؕ اِنَّ اَكۡرَمَكُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ اَتۡقٰىكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ •

অর্থ: হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে, তারপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং অবগত।[৩১৩]

বিশ্বের সমগ্র জাতি ও বংশ আল্লাহর নিকট সমান। একের ওপর অন্যের মর্যাদার মাপকাঠি শুধুমাত্র তাকওয়া। এটি এমন একটি মানব অর্জিত প্রশংসনীয় গুন, যার সাথে বংশীয় আভিজাত্যার কোনো সম্পর্ক নেই।

কুর'আনে বলা হয়েছে,

وَ مَنۡ يَّعۡمَلۡ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى وَ هُوَ مُؤۡمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدۡخُلُوۡنَ الۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُوۡنَ نَقِيۡرًا •

অর্থ: যে কোনো পুরুষ বা নারী মুমিন অবস্থায় আমলে সালেহ্ করবে, তারা অবশ্যি দাখিল হবে জান্নাতে এবং তাদের প্রতি কণা পরিমাণও অবিচার করা হবেনা।[৩১৪]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম সীমিত অর্থে সাম্যকে কখনো সমর্থন করে না। মানুষের মধ্যে কিছুটা অর্থনৈতিক দূরত্ব ও ব্যবধান থাকা এবং কিছু সংখ্যক লোকের অপরাপর লোকের তুলনায় বেশি ধন-সম্পদের মালিক হওয়া ইনসাফের স্বাভাবিক চাহিদা। এ সাম্যকে বহাল রাখার অনিবার্য শর্ত হলো যে, সর্বক্ষেত্রে যোগ্যতা মাফিক সকলের একই সুযোগ সুবিধা থাকতে হবে। সকল প্রকার মূল্যবোধকে যথোপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। ইসলামে ধনীদের সম্পদে রয়েছে গরীবের অধিকার।

---

৩১২. আল কুর'আন, ২৩:১২-১৪

৩১৩. আল কুর'আন, ৪৯:১৩

৩১৪. আল কুর'আন, ৪:১২৪

ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত হলো একটি আইনগত পাওনা ও অধিকার। এটা যেএ নয় দানের বস্তু, তেমনি নয় বদান্যতার বস্তু। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে:

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ •

অর্থ: তাদের অর্থ-সম্পদে ছিলো অধিকার সাহায্যপ্রার্থী এবং বঞ্চিতদের।[৩১৫]

এ যাকাতের বিধান হলো প্রত্যেকজন নাগরিকের জন্য আবশ্যিক পালনীয় বিধান, যা রাষ্ট্র আদায় করে মুসলিমদের সমুদয় স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য ব্যয় করে।

ইসলামী জীবনাদর্শের মৌলিক নীতিমালা মানব রচিত জীবনাদর্শের নীতিমালা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামের বুনিয়াদী নীতি হচ্ছে, সার্বভৌম শাসনত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ এবং তিনিই শরীয়ত রচনা করেন। আর অন্যান্য জীবনাদর্শের বুনিয়াদী নীতি হচ্ছে সার্বভৌমত্ব শাসনত্ব জনগণের। ইসলাম মানবতার বিভিন্ন সমস্যার এমন সুন্দর সমাধান পেশ করে, যা তার স্বীয় স্থানে স্বাধীন এবং স্বীয় মহত্বে অদ্বিতীয়।[৩১৬]

কুর'আনে এসেছে,

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا •

অর্থ: নিশ্চয়ই এ কুরআন হিদায়াত করে (পরিচালিত করে) সে দিকে, যা সঠিক ও সুষম। আর যেসব মুমিন আমলে সালেহ্ করে তাদের (এ কুরআন) সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।[৩১৭]

ইসলাম কাউকে তাকে মানতে জোর জবরদস্তি করে না।

কুর'আনে এসেছে,

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ •

অর্থ: দীন গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা ও বল প্রয়োগ নেই। সঠিক পথকে উজ্জ্বল-পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে, সে সবচে মজবুত বিশ্বস্ত হাতলটিই আঁকড়ে ধরবে, যা কখনো ভেঙ্গে যাবার নয়। আর আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।[৩১৮]

ইসলাম মুসলিমদের ওপর যাকাত ও জিহাদে অংশ গ্রহণ ফরজ করে দিয়েছে। আবার অমুসলিমদের থেকে জিজীয়া আদায় করার বিধান দিয়েছে। কারণ তারাও ইসলামী হুকুমাতের ভিতর পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে মুসলিমদের ন্যায় সমভাবে লাভবান হচ্ছে।

কুর'আনে শাসকবর্গের মাধ্যমেও ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

---

৩১৫. আল কুর'আন, ৫১:১৯
৩১৬. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪
৩১৭. আল কুর'আন, ১৭:৯
৩১৮. আল কুর'আন, ২:২৫৬

وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَ مِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ •

অর্থ: সঠিক পথ দেখানো আল্লাহ্‌র দায়িত্ব, যেহেতু অনেক বক্র পথ রয়েছে। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করতেন।[৩১৯]

অন্যত্র এসেছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ •

অর্থ: হে ঈমান আনা লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদাতা হিসেবে অটল অবিচল থাকো। কোনো কওমের প্রতি বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে ন্যায়নীতি বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা আদল ও ইনসাফের নীতি গ্রহণ করো। এটাই তাকওয়ার জন্যে নিকটতর। আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আমল (কর্মকাণ্ড) সম্পর্কে বিশেষভাবে খবর রাখেন।[৩২০]

ইসলামে এ সুবিচার এমনই এক মানদণ্ড যা দ্বারা সমগ্র মুসলিম জাতি সমভাবে উপকৃত হয়।

ইসলাম ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি দিকের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে আইন বিধান রচনা করেছে। ইসলাম বাস্তব সত্যাবলী ও মানব সত্তার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শক্তি এ উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে। ইসলাম একদিকে যেএ মানুষের পবিত্রতম গতিধারাকে অনুপ্রাণিত করে, তেমনি উজ্জীবিত করে তাদের মূল্যবান যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে।

সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ছাড়া শান্তিপূর্ণ সমাজ কল্পনা করা যায় না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সামাজিক সুবিচারের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩১৯. আল কুর'আন, ১৬:৯

৩২০. আল কুর'আন, ৫:৮

৫ম পরিচ্ছেদ

কুর'আনের দৃষ্টিতে সামাজিক জীবনে পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা

ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে তার নিজস্ব সুন্দরতম ব্যবস্থাপনায় দান করে একটি মহান ও উচ্চাংগের সাম্য গড়ে তুলে। কিন্তু সে তাদেরকে লাগামহীন ঘোড়ার ন্যায় ময়দানে ছেড়ে দেয় না। একদিকে সামাজিক স্বার্থ ও অধিকার, অপরদিকে মানবতার স্বার্থ ও কল্যাণ এবং তার মৌলিক চাহিদার পানে দৃষ্টি রাখে। আর সাথে ধর্মীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূল্যবোধও থাকে তার সমানে বর্তমান। এ জন্যই ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতার সমানে ব্যক্তির দায়িত্বশীল হবার নীতিমালা পেশ করে। আর তার পার্শ্বে স্থান দেয় এমন সামাজিক দায়িত্ব-বোধকে, যার ভার ন্যস্ত হয় ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রতি। আর এহেন দায়িত্বশীলতাকে আমরা 'সামাজিক পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা' নামে অভিহিত করি।

ইসলাম সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার নীতিমালাকে পূর্ণ বিবরণ সহ নিজের সামনে বর্তমান রেখেছে। ব্যক্তি এবং তার সত্তা, ব্যক্তি ও তার নিকটতম পরিবার, ব্যক্তি ও সমাজ একজাতির সাথে অপর জাতি এবং একটি বংশ ও ভবিষ্যতে আগত বংশের সকলের মধ্যে সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার নীতিমালাই পথ প্রদর্শকরূপে ভূমিকা গ্রহণ করে।

০১. নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা

দায়িত্বশীলতার এহেন মিলিত সামাজিক নীতিমালা ব্যক্তি ও তার সত্তার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার এবং তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির দায়িত্ব হলো যে নফসকে লাগামহীন কামনার দৌরাত্মা থেকে বিরত রাখা। তাকে সর্ব প্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রেখে তার পরিচর্যা সাধন করতঃ তাকে নিয়ে কল্যাণ মুখি ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়ে ধ্বংসের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা। ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদন করার দায়িত্ব থাকে একমাত্র ব্যক্তির ওপরই। ব্যক্তি নিজেই এ সফল কাজ সম্পাদন করে সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ • وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا • فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ • وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ • فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ •

অর্থ: সেদিন (এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে যে,) পৃথিবীর জীবনে যারা সীমালংঘন করেছিল, এবং (আখিরাতের চাইতে) অগ্রাধিকার দিয়েছিল দুনিয়ার জীবনকে, তাদের আবাস হবে জাহিম (দোযখ)। আর যে তার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়াবার ভয়ে ভীত ছিলো এবং নিজেকে আত্মার দাসত্ব ও মন্দ কাএা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছিল, জান্নাতই হবে তাদের আবাস।[৩২১]

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا • فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا • قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا • وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا •

অর্থ: শপথ মানবের (মানব সত্তার) আর তাঁর, যিনি তাকে যথাযথভাবে গঠন করেছেন, তারপর তার মধ্যে ইল্হাম করেছেন ফুজুর (সীমালংঘনের প্রবণতা) এবং তাকওয়া (সীমার মধ্যে অবস্থানের প্রবণতা)। নিঃসন্দেহে সফল হলো সে, যে তাযকিয়া (পরিশুদ্ধ, উন্নত ও বিকশিত)

৩২১. আল কুর'আন, ৭৯: ৩৭-৪১

করলো নিজেকে। নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হলো সে, যে দুষিত ও কলুষিত করে ধসিয়ে দিলো নিজেকে।[৩২২]

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ •

অর্থ: আর নিজেদের হাতে নিজেদেরকে হালাক হবার (ধ্বংসের) দিকে নিক্ষেপ করো না (আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করে)।[৩২৩]

ব্যক্তিকে সাথে সাথে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন করে দিয়েছে যে, সে তার নাফ্‌সকে একটি সীমারেখা পর্যন্ত তার প্রয়োজনীয় ও পছন্দনীয় দ্রব্য সামগ্রীর সংস্থান করে দিবে, যে পর্যন্ত তার স্বভাব প্রকৃতির ওপর কোনরূপ খারাপ প্রভাব পতিত হবার সন্দেহ না থাকে। তার অধিকার ও দাবি অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া এবং তার শান্তির জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে তাকে ক্লান্ত করে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া তার ওপর যুলুম বৈ আর কিছু নয়। পবিত্র কুরআন মাজিদে এ বিষয়ে সচেতন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا •

অর্থ: আল্লাহ্‌ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর সন্ধান করো। দুনিয়ায় তোমার দায়িত্বের অংশ ভুলে যেয়ো না।[৩২৪]

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ •

অর্থ: হে আদম সন্তান! প্রত্যেক মসজিদের (সালাতের) সময় তোমরা তোমাদের সুন্দর পোশাক পরবে। আর আহার করবে, পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না, কারণ তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।[৩২৫]

ব্যক্তির এহেন দায়িত্বশীলতা তার স্থানে পূর্ণরূপে বর্তমান আছে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব কর্ম দ্বারাই আদান-প্রদান ও লেন-দেন করে। সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ সে যা কিছুই করুক না কেন, তার একটি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তার প্রতিবেশীদের প্রতি পড়ে। দুনিয়া বা আখিরাত যেখানে হোক না কেন কোথাও এ ব্যাপারে কেউ তার সাহায্য আসবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ •

অর্থ: প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অর্জনের কাছে আবদ্ধ।[৩২৬]

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ • وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ • أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ • وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ • وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ • ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ •

অর্থ: তাকে কি অবহিত করা হয়নি যা রয়েছে মূসার কিতাবে? এবং ইবরাহিমের কিতাবে, যে পূর্ণ করেছিল তার কর্তব্য? (সেসব কিতাবে রয়েছে:) কোনো বোঝা বহনকারী অপরের (পাপের)

৩২২. আল কুর'আন, ৯১: ৭-১০
৩২৩. আল কুর'আন, ২: ১৯৫
৩২৪. আল কুর'আন, ২৮: ৭৭
৩২৫. আল কুর'আন, ৭: ৩১
৩২৬. আল কুর'আন, ৭৪: ৩৮

বোঝা বহন করবে না। মানুষ তাই পাবে, যা সে চেষ্টা করবে। এবং শীঘ্রি তাকে দেখানো হবে তার প্রচেষ্টা, তারপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিফল।[৩২৭]

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ •

অর্থ: তার ভালো উপার্জনের (কৃতকর্মের) প্রতিফল সে-ই পাবে, আর তার মন্দ উপার্জনের (কৃতকর্মের) প্রতিফলও তাকেই ভোগ করতে হবে।[৩২৮]

فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ •

অর্থ: এখন যে কেউ সঠিক পথ গ্রহণ করবে, তাতে তারই কল্যাণ হবে, আর যে কেউ বিপথগামী হবে, সে ডেকে আনবে নিজেরই ধ্বংস। তুমি তাদের উকিল নও।[৩২৯]

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ •

অর্থ: যে কেউ কামাই করবে পাপ, সে তা কামাই করবে নিজেরই বিরুদ্ধে।[৩৩০]

ব্যক্তির ওপর ইসলামের আরোপিত এহেন বাধ্যতামূলক বিধানসমূহের দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিক রূপে এ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যে, ব্যক্তি তার নফ্সের রক্ষক সে নিজেই হয়। সে যখন গোমরাহীর পানে অগ্রসর হয়, তখন তাকে সে ঘাড় ধরে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসে এবং সাথে সাথে তার একান্ত অপরিহার্য প্রাপ্য দাবী-দাওয়া ও অধিকার সমূহকে সর্বদা পূরণ করে। আর যদি নফ্সের থেকে ভুলভ্রান্তি প্রকাশ পায়, তবে কেন পেল তার কড়ায় গণ্ডার হিসাবও তার থেকে সে বুঝিয়ে নেয়। আর যদি সে নিজে কোনরূপ অলসতা প্রকাশ করে, তবে তার প্রতিফল সে নিজেই ভোগ করতে থাকে।[৩৩১]

০২. পারিবারিক দায়িত্বশীলতা

ইসলাম যে ব্যক্তি এবং তার বংশের নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্বশীলতাকে অপরিহার্য রূপে বাধ্যতামূলক বিধানে পরিণত করে দিয়েছে: কুর'আনে কারিমের নিম্নলিখিত আয়াতগুলিই তার জলন্ত প্রমাণ:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا • وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا •

অর্থ: পিতা-মাতার প্রতি ইহ্সান করবে, তাদের একজন কিংবা দু'জনই তোমার জীবদ্দশায় বৃদ্ধ বয়সে এসে পৌঁছালে তাদেরকে 'উহ্' পর্যন্ত বলোনা এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তাদের সাথে কথা বলবে সম্মানের সাথে। দয়া-অনুকম্পা নিয়ে তাদের প্রতি কোমলতার ডানা অবনমিত

---

৩২৭. আল কুর'আন, ৫৩: ৩৬-৪১

৩২৮. আল কুর'আন, ২: ২৮৬

৩২৯. আল কুর'আন, ৩৯: ৪১

৩৩০. আল কুর'আন, ৪: ১১১

৩৩১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, অনু. মাওলানা কারামত আলী নিযামী (ঢাকা: এ.এচ.পি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৫), পৃষ্ঠা-১৩৮-১৪১

করবে এবং তাদের জন্যে দু'আ করবে এভাবে: 'আমার প্রভু! তাদের প্রতি রহম করো, যেভাবে শৈশবে তারা (দয়া, মায়া ও কোমলতার পরশে) আমাকে লালন পালন করেছে।'[৩৩২]

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ •

অর্থ: আমরা মানুষকে অসিয়ত (নির্দেশ) করেছি তার বাবা-মার সাথে উত্তম আচরণ করতে। কারণ, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং শোকরগুজার হও আমার প্রতি, আর তোমার বাবা-মার প্রতি। তোমাদের ফিরে আসতে তো হবে আমারই কাছে।[৩৩৩]

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ •

অর্থ: আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরদের চেয়ে আত্মীয়রা পরস্পরের নিকটতর।[৩৩৪]

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ •

অর্থ: মায়েরা তাদের বাচ্চাদের বুকের দুধ পান করাবে পূর্ণ দুই বছর। এ বিধান তার জন্য যে পিতা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। এক্ষেত্রে বাচ্চাদের পিতার দায়িত্ব হবে বাচ্চাদের মায়ের খাওয়া পরার ব্যয় ভার বহন করা ন্যায়সংগত পরিমাণে।[৩৩৫]

শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে রাসূল সা. বলেছেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ •

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের মায়া-মহব্বত করবেনা আর বড়দের সম্মান-শ্রদ্ধা করবেনা এবং ভালো কাজের আদেশ করবেনা আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবেনা, সে আমাদের লোক নয়।[৩৩৬]

পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্বশীল হবার গুরুত্ব দানের ব্যাপারে শুধু এতোটুকই বলা যায় যে, ইসলামের এহেন নীতিমালা এ সংস্থার বিভিন্ন গ্রুপের লোকদেরকে একই সুতায় সুসংগঠিত করে গড়ে তোলার একটি মৌলিক পদ্ধতি। পরিবার হলো সামাজিক সৌধ কাঠামোর ভিত্তি প্রস্তর স্বরূপ। তার মূল্যমানের স্বীকারোক্তি থেকে পলায়ন আদৌ সম্ভব নয়। পারিবারিক এ সংগঠনটি মানব প্রকৃতির গভীর তলদেশের সাথে সম্পৃক্ত। স্নেহ-ভালোবাসা দয়া অনুগ্রহ প্রবণতা ও অন্তরংগতার পবিত্র চেতনাবোধ এবং প্রয়োজন ও উপযোগিতার

---

৩৩২. আল কুর'আন, ১৭: ২৩-২৪
৩৩৩. আল কুর'আন, ৩১: ১৪
৩৩৪. আল কুর'আন, ৩৩: ৬
৩৩৫. আল কুর'আন, ২: ২৩৩
৩৩৬. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮, হাদীস নং-২৭৯

স্বভাবগত পূর্ণ চাহিদার ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত। আর এ সংগঠনটি একটি দোলনা স্বরূপ, যেখানে মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী তথা মহত্ব শিষ্টাচারিতা আদব আখলাক ইত্যাদির লালন-পালন হয়। আর প্রকৃত পক্ষে যদি গভীর ভাবে তলিয়ে দেখা হয়। তবে এটাকে সে সমাজের আদব আখলাক ও রীতিনীতি বলতে হবে, যা জীব-জন্তুর সাধারণ আচরণ ও বন্য প্রকৃতির পশুত্বের বর্বরতাপূর্ণ আচরণ থেকে মানুষকে করেছে মহান ও উন্নত।[৩৩৭]

০৩. মীরাসী বিধান কার্যকর করা

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ •

অর্থ: তোমাদের কোনো ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় হাজির হয় এবং সে যদি অর্থ-সম্পদ রেখে যেতে থাকে, তাহলে বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্যে অসিয়ত করে যাবার বিধান তোমাদের জন্যে লিখে (ফরয করে) দেয়া হলো প্রচলিত যুক্তিসংগত নিয়মে। এটা মুত্তাকিদের একটা কর্তব্য।[৩৩৮]

ইসলামের এহেন অসিয়াতের ব্যবস্থা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অধিক হবে না। আর তা কোনো ওয়ারিসদের বেলায়ও করা যাবে না। কারণ হাদীসে কোনো ওয়ারিসদের বেলায় অসিয়ত করাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) পরিবারের যদি এমন কোনো ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের সত্বান হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়, যার সাথে ভালো আদান প্রদান করে এবং তার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা পারিবারিক সম্পর্কের অনিবার্য দাবী। কেবল এমতাবস্থায় ইসলাম অসিয়াতের অবকাশ রেখেছে। এ ছাড়া অসিয়াতের সম্পদ দ্বারা সমাজের অন্যান্য কল্যাণ ও সেবামূলক কাজ সম্পাদন করারও সুবর্ণ সুযোগ দান করেছে।

ইসলামের রচিত এ বিধানগুলো পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি এবং পরস্পর আগত বিভিন্ন বংশাবলীর মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল দায়িত্ববান ও রক্ষাকবচ হবার একটি সুষমভাবে বণ্টন হয়। অনুরূপ তা যাতে করে এক হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে সামগ্রিক সমাজের জন্যে ভীতির ও অসুবিধার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, সে পথও রুদ্ধ করে।

ইসলামের এ মীরাসী বিধান পারিবারিক জীবনের পরিমণ্ডলে পরিশ্রম, বিনিময়, অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক তুলনার একটি মধ্যস্থতার উপকরণে পর্যবসিত হয়। প্রত্যেক পিতাই এ মনে করেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে যাতে তার পরিশ্রম লব্ধ সম্পদ তার নিজ জীবনের স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ না হয়। তা যেন তার পরবর্তী জীবনে অবশিষ্ট রয়ে তার পুত্র পৌত্রদেরও কল্যাণ সাধন করতে পারে। যাকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের 'পাথেয়' নামে অবহিতি করা হয়। সে অধিক পরিমাণে সম্পদ অর্জন করার বেলায় এ জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যে তার ভেতর যেমন তার দেশের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। অনুরূপ সমগ্র মানবতার কল্যাণও তাতে নিহিত। এ ছাড়া তার ব্যায়কৃত শ্রম ও তার প্রাপ্য প্রতিদানে একদিক দিয়ে একটি সমতাও সৃষ্টি হয়। কারণ, তার সন্তানগণ তারই একটি অংশ বিশেষ। তাদের স্থায়ীত্বতায় তার নিজের জীবনের স্থায়ীত্বতা এবং তার বংশানুক্রমিক ধারাই পরিদৃষ্ট হয়।

---

৩৩৭. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪৩

৩৩৮. আল কুর'আন, ২: ১৮০

সন্তান সন্ততি তাদের পিতা-মাতার পরিশ্রম লব্ধ ধনসম্পদ দ্বারা উপকৃত ও লাভবান হওয়া এটা ইনসাফ ও সুবিচারের স্বভাবগত দাবী। কেননা ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হবার সম্পর্ক যদি কেটে দেয়াও হয়, তবুও পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যে একটি নিবিড় রক্তের সম্পর্ক বিরাজমান থাকে, তা কখনো শেষ হয় না। পিতা-মাতাগণ সন্তানের মানসিক ও দৈহিক গঠন প্রকৃতির মধ্যে উত্তরাধিকারী সূত্র দ্বারা এমন সব গুণাবলী ও স্বভাবগত ক্ষমতা ও দক্ষতার মূল উপাদান সম্প্রসারিত করে দেয়, যা জীবনভর কখনো তা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনের অবস্থাকে একটি সীমারেখা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেয়। আর তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে এ অবস্থা যেএ খারাপ হবার সম্ভাবনা আছে, অনুরূপ তা ভালোও হতে পারে। রাষ্ট্র বা সমাজ সন্তানদের প্রতি যতোই প্রবল চাপ সৃষ্টি করুক না কেন, কখনো উত্তরাধিকারী হবার গুণাবলীকে অস্বীকার করা অথবা তার মধ্যে কিছু রদ-বদল ও পরিবর্তন আনয়ন করার ক্ষমতা কোনো সন্তানের নেই। তা তাদের শক্তির বর্হিভূত কাজ। কিন্তু যে সন্তানকে তার পিতা-মাতা একটি খারাপ ধরনের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছে, তাকে সর্বসুন্দর করে তোলাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর সে যখন উত্তরাধিকারীর মধ্যে দৃঢ়চেতাহীন ও অসমাঞ্জস্যতা লাভ করেছে। তখন তাকে স্বভাব প্রকৃতির দিক দিয়ে সংযত চিত্ততা ও দৈহিক দিকদিয়ে সুস্থ সাবলীলতা দান করতে পারে না। অনুরূপ ভাবে পিতা-মাতা স্বভাবগত রোগা হওয়া, তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হওয়া এবং অকর্মন্য হওয়ার মূল উপাদান যদি ভরে দেয়, তবে তারা তাকে কখনো দীর্ঘ বয়স ও সুস্থ সাবলীল আনন্দ মুখর স্বাস্থ্যও দান করতে পারে না। যখন তাকে এ সবকিছু বিনা ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে নিতে হয়। তখন সামাজিক সুবিচার ও ইনসাফের স্বাভাবিক দাবী অনুযায়ী যাতে করে তার লাভ ক্ষতির মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমতা সৃষ্টি হয়, তার জন্যে তাকে স্বীয় পিতা-মাতার জাগতিক জীবনের পরিশ্রম লব্ধ ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়।[৩৩৯]

০৪. সমাজের প্রতিটি মানুষ দায়িত্বশীল

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ •

অর্থ: বলো, তোমরা আমল করতে থাকো, আল্লাহ্ তোমাদের আমল দেখছেন আর তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ।[৩৪০]

প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণের পানে এমনরূপে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, তাকে তার পাহারাদার ও রক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। কেননা, জীবন হলো মহাসমুদ্রের স্রোত ধারার সাথে চলমান নৌকা স্বরূপ। যার নিরাপত্তার ব্যাপারে সকল যাত্রীর সমভাবে দায়িত্ববান থাকতে হয়। স্বাধীনতার অজুহাত দেখিয়ে স্বীয় স্থানে ছিদ্র করে দেওয়ার অধিকার কাহারো নেই। এ বিষয়টি রাসূলে করিম (সা.) একটি উদাহরণের মাধ্যমে সুন্দর রূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন: "আল্লাহর অংকিত সীমারেখা যারা মেনে চলে আর যারা তা অতিক্রম করে তাদের উদাহরণ হলো- যেমন কিছু লোক একটি জাহাজে আরোহণ করলো। তাদের কতক লোক জাহাজটির ওপর তালাতে থাকার জন্যে স্থান নির্বাচন করে নিলো। আর কতক লোক নিলো নিচের তালাতে। যারা নীচের তালায় অবস্থান করে তাদের পানি পান করার জন্য ওপর তালার লোকদের নিকট যেতে হয়। কারণ পানির পাত্র ওপর তালায় রাখা হয়েছে। সুতরাং নীচের তালার লোকেরা মনে করলো যে, পানির কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপরের যাওয়ার চেয়ে আমাদের নীচ তালা দিয়ে একটি ছিদ্র করে নিলে কতই না ভালো হয়। ওপর তালার লোকেরা আমাদের দৌরত্মের কষ্ট থেকে বেঁচে

৩৩৯. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৯

৩৪০. আল কুর'আন, ৯: ১০৫

যায়। অতএব লোকেরা সকলে যদি নীচ তালার লোকের ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ দান করে, তবে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে, তবে তারা যেমন ধ্বংস হাত থেকে রক্ষা পায় অনুরূপ সকলেই মুক্তি পায়।"[৩৪১] ব্যক্তির স্বার্থ ও কল্যাণ পরস্পর বিজড়িত এবং একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার এটা এমনি একটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ, যা ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তাধারার মোকাবেলায় তুলে ধরা হয়েছে। আর যা নীতি ও দর্শনের বাহ্যিক ও উন্নত সমতল ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করত: বাস্তব সত্যের গভীর তলদেশে অবতরণ করতে এবং ঘটনা জগতের বাস্তব পরিণামের দিকে লক্ষ্য রাখার তাকিদ বহন করে থাকে। আর এ উদাহরণটি খুব সুক্ষ্মভাবে ব্যক্তি এবং জামায়াতের তথা সমাজের প্রতি এমতাবস্থায় কী দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাও সাথে সাথে আমাদেরকে বলে দেয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণের পানে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব থেকে সমাজের কোনো ব্যক্তিই মুক্ত নয়। একই সময় প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন সমাজের রক্ষক, অনুরূপ সে নিজে সমাজের সকলের পর্যবেক্ষণের অধীন ব্যক্তি।[৩৪২] হাদীসে এসেছে। নবী কারীম (সা.) বলেন:

• كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই রক্ষক ও পাহারাদার। আর তাদের পর্যবেক্ষণ ও পাহারাদারীর অধীন করে যাদেরকে দেয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কেও তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৩৪৩]

সমাজের লোকদের মধ্যে সৎ ও ন্যায় নীতির সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে একে অন্যের সাহায্য সহানুভুতি করে যাওয়া সামাজিক স্বার্থ ও কল্যাণের মূল দাবী এবং একটি অপরিহার্য কর্তব্য। পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

• وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থ: আর পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো, তবে পাপও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।[৩৪৪]

• وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে অবশ্যি এমন একদল লোক থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) আহবান করবে কল্যাণের দিকে, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দ কাজ থেকে।[৩৪৫]

আমরু বিল মা'রূফের (সৎকাজের নির্দেশ দান) ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট স্বতন্ত্ররূপে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সে যদি তার এ কর্তব্য সম্পাদন না করে, তবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তাকে অপরাধের বিনিময়ে শাস্তিও ভোগ করতে হবে। এ বিষয়ে কুর'আনে কারীমের ঘোষণা যে কত কঠোর তা সত্যই প্রণিদানযোগ্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

৩৪১. বুখারি, তিরমিযি

৩৪২. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২

৩৪৩. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, অনু. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮২), হাদীস নং-৮৯৩, ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অনু. মাওলানা মোজাম্মেল হক, মাওলানা আফলাতুন কায়সার (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার, ২০০২), হাদীস নং-১৮২৯

৩৪৪. আল কুর'আন, ৫: ২

৩৪৫. আল কুর'আন, ৩: ১০৪

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ • ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ • ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ • إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ • وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ • فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيْمٌ • وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ • لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُوْنَ •

অর্থ: (ফেরেশতাদের বলা হবে:) "একে পাকড়াও করো এবং বেড়ি লাগাও তার গলায়। তারপর নিক্ষেপ করো জাহিমে। অতঃপর তাকে বাঁধো সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে। সে ঈমান আনেনি মহান আল্লাহ্‌র প্রতি, (মানুষকে) উৎসাহ দেয়নি মিসকিনদের আহার করাতে। তাই তার জন্যে আজ এখানে নেই কোনো সহমর্মী, (তার জন্যে) নেই কোনো খাবার ক্ষতের পূঁজ ছাড়া, যা আর কেউই খাবে না অপরাধীরা ছাড়া।"[৩৪৬]

গরীব মিসকিন ও অভাবীদেরকে খাদ্য খাওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত না করাকে ইসলামে কুফরি ও দীনকে মিথ্যা জানার প্রকাশ্য নযিররূপে গণ্য হয়। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ • فَذٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ • وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ •

অর্থ: তুমি কি দেখেছো ঐ ব্যক্তিকে, যে (পরকালের) প্রতিদানকে করে অস্বীকার? এ ব্যক্তিই ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় ইয়াতিমকে, এবং (সে) খাওয়াতে উৎসাহ দেয় না মিসকিনকে।[৩৪৭]

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হলো যে সমাজের অনাচার অবিচার যুলুম অত্যাচার এক কথায় সকল প্রকার শরীয়ত গর্হিত কাজের অবলুপ্তি ও নিরসনের জন্য যথাসম্ভব সর্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করা ও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হলো এ:

"তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি কোনরূপ অন্যায় কাজ হতে দেখে, তবে শক্তি প্রয়োগ করে তার অবলুপ্তি ঘোষণা করা উচিত। আর যদি শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ দ্বারা তা নিবারণ করা উচিত। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে মনে প্রাণে সে কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা উচিত। এটাই হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়।"[৩৪৮]

এ হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে অনুষ্ঠিত সর্ব প্রকার অন্যায় অবিচার ও শরীয়ত বিরোধী কাজের জন্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জবাবদিহি করার জন্য দায়ী থাকতে হয়- চাই সে উক্ত কাজের মধ্যে নিজে অংশ গ্রহণ করে থাকুক কিংবা নাই থাকুক তা ধর্তব্য হবে না। কারণ সমাজ হলো এমন একটি সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে অনাচার অবিচার ও শরীয়ত গর্হিত কাজ খুবই ক্ষতিকর। আর সমাজকে এ সকল দুরাচার থেকে মুক্ত রাখা সকল ব্যক্তিরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। অনুরূপ সমাজ নিজে যদি সমাজভুক্ত লোকদের থেকে প্রকাশিত শরীয়ত গর্হিত কাজের বেলায় কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ক্ষমা প্রদর্শন বা লক্ষ্যের আড়ালে রেখে নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করে। তবে তারও জবাবদিহি করতে হবে এবং ইহকালে পরকালে উভয় স্থানেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদের চালক হিসেবে নিযুক্ত থাকা সরাসরি তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের থেকে কোনরূপ খারাপ কাজ প্রকাশ

---

৩৪৬. আল কুর'আন, ৬৯: ৩০-৩৭

৩৪৭. আল কুর'আন, ১০৭: ১-৩

৩৪৮. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, অনু. মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭), খ. ৪, পৃ. ৮৮, হাদীস নং-২১১৮

পেলে তা নিরসন না করার অর্থ হলো, তার ওপর অর্পিত দায়িত্বকে অবহেলা করা। এ ব্যাপারে আল্লাহর স্বাভাবিক বিধানের প্রতি আমাদের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।[৩৪৯]

০৫. দারিদ্র্যতা নিরসনের দায়িত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে দরিদ্র ও গরিব মিসকীনদের প্রয়োজন পূরণ করণের দায়িত্বও সমাজের ওপর অর্পিত। সে ধনাট্য ব্যক্তিদের থেকে যাকাত আদায় করে তার নির্দিষ্টতম ব্যয়ের খাতে খরচ করবে। এ উদ্দেশ্য পুরণের জন্য তা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে সে সমাজের বড় ধনী ও সামর্থবান লোকদের ওপর এমন একটি সীমারেখা পর্যন্ত কর বসাবে যেন তা দ্বারা প্রয়োজনশীল অভাবী লোকদের প্রয়োজন পূরণ হয়। দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণ করা ব্যতীত কর ধার্য্যের ব্যাপারে দ্বিতীয় এমন কোনো যোগ্য কারণ থাকতে পারে না, যা তার দরুন তার পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সমাজের লোকেরা যদি দরিদ্রদের খাদ্য দানের ব্যাপারে অপরকে উৎসাহিত না করার দরুন একটি লোকও রাত্রি উপাবাসে কাটায়, তবে সমাজের সমস্ত ব্যক্তিই অপরাধী ও অমার্জনীয় গুনাহগার রূপে পরিগণিত হবে। এ ব্যাপারে কুরআন মাজিদের ভাষ্য যে কত কঠোর ও মর্মস্পর্শী তাই লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ • وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ • وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا • وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا • كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا • وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا • وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ • يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي • فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ • وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ • يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ • ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً • فَادْخُلِي فِي عِبَادِي • وَادْخُلِي جَنَّتِي •

অর্থ: না ব্যাপার এমনটি নয়; বরং তোমরাই ইয়াতিমদের প্রতি দয়া এবং সম্মান প্রদর্শন করো না, এবং মিসকিনদের আহার প্রদানের জন্যে পরস্পরকে উৎসাহ উপদেশ দাও না। অপরদিকে লোভ লালসায় তোমরা খেয়ে ফেলো ওয়ারিশদের সব অর্থ-সম্পদ। আর প্রচন্ড ভালোবাসো মাল-সম্পদ। না (তোমাদের এ নীতি সংগত নয়), পৃথিবীকে যখন চুর্ণ বিচুর্ণ করা হবে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে, এবং তোমার প্রভু যখন উপস্থিত হবেন আর তাঁর সাথে থাকবে সারি সারি ফেরেশতা, সেদিন জাহান্নামকে (সামনে) নিয়ে আসা হবে। সেদিন মানুষ (প্রকৃত ব্যাপার) উপলব্ধি করবে। কিন্তু তার সে উপলব্ধি কী কাজে আসবে? তখন সে বলবে: 'হায়রে, আমার এ জীবনের জন্যে যদি (ভালো) কাজ করে পাঠাতাম!' সেদিন তিনি যে আযাব দেবেন, সে আযাব আর কেউ দিতে পারবে না, এবং তিনি যেভাবে (অপরাধীদের) শক্ত করে বাঁধবেন, সেরকম শক্ত বাঁধা আর কেউ বাঁধতে পারবে না। (সেদিন মুমিনদের বলা হবে) হে নফসে মুতমায়িন্না! ফিরে আসো তোমার প্রভুর কাছে সন্তুষ্ট চিত্তে এবং তাঁর সন্তোষভাজন হয়ে, প্রবেশ করো আমার (সম্মানিত) দাসদের মধ্যে, আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।[৩৫০]

সমগ্র মুসলিম জাতিটি একটি দেহ স্বরূপ, তার মধ্যে এখান থেকে ওখানে একই অনুভূতি ক্রিয়াশীল। কোনো একটি অংগ যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়, তবে যেএ সমুদয় শরীরে তার কষ্ট

---

৩৪৯. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫

৩৫০. আল কুর'আন, ৮৯: ১৭-৩০

অনুভূত হয়, মুসলিম জাতির অবস্থাও অনুরূপ। মুসলিম জাতির এহেন সুন্দরতম চিত্রটি খুবই চিত্তাকর্ষক চিত্র। রসূলুল্লাহ (সা.) তার নিজের ভাষায় রূপ দিয়ে এ চিত্রটি জনসমক্ষে এমনিভাবে তুলে ধরেছেন:

"পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও প্রেমপ্রীতির বেলায় মুসলিম জাতি একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অংগ যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়, তবে এক এক করে সকল অংগ প্রতংগ তার মর্মস্পর্শী বেদনায় ব্যথিত হয়ে পড়ে।"[৩৫১]

মুসলিম সমাজ পরস্পর পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববান ও সহানুভূতিশীল হবার আর একটি আকর্ষণীয় চিত্র যে নবী (সা.) অংকিত করেছেন তা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি (সা.) বলেছেন: "এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ। এর এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। (এ কথা বলার সময়) তিনি তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখান।"[৩৫২]

০৮. সামাজিক অপরাধের শাস্তির বিধান

ইসলামে সামাজিক অপরাধের শাস্তি বিধান নিরূপণ করা হয়েছে। আর তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কঠোরতম চরমসীমায়। কারণ যতো সময় পর্যন্ত সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য মাল ইয্যৎ আবরুর হেফাযতের পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান না করা হবে, ততো সময় পর্যন্ত পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির নীতি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না।

"প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, জান-মাল, ধন-সম্পদ, ইয্যত-আবরুর প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ হারাম।"[৩৫৩]

এ জন্যই ইসলাম হত্যা ও যখম জনিত অপরাধের ব্যাপারে সমপরিমাণের শাস্তি বিধান করেছে। আর হত্যাজনিত অপরাধকে শাস্তির বেলায় কুফরির সমপর্যায় গণ্য করেছে। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا •

অর্থ: আর কেউ যদি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তবে তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, সে চিরকাল সেখানেই থাকবে।[৩৫৪] অন্যত্র এসেছে:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا •

অর্থ: আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তোমরা তাকে হত্যা করো না, তবে হক পন্থায় (ন্যায় বিচারের মাধ্যমে) হলে ভিন্ন কথা। কেউ যুলুমের শিকার হয়ে নিহত হলে আমরা তার অলিকে প্রতিকারের (কিসাস গ্রহণের) অধিকার দিয়েছি।[৩৫৫]

---

৩৫১. মুহিউদ্দিন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী (র.), *রিয়াদুস সালিহীন,* অনু. সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১), খ. ১, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং-২২৪

৩৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং-২২২

৩৫৩. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫৬৪

৩৫৪. আল কুর'আন, ৪: ৯৩

৩৫৫. আল কুর'আন, ১৭: ৩৩

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ •

অর্থ: আমরা তাতে (তাওরাতে এ বিধান) লিখে দিয়েছিলাম: জীবনের বদলে জীবন, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে কিসাস (অনুরূপ যখম)।[৩৫৬]

ইসলাম কিসাসের বিধানকে সমাজ জীবনের মুক্তির পথ ও সমাজের জন্য জীবন লাভ আখ্যা দিয়ে ঘোষণা করছে:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ •

অর্থ: তোমাদের জন্যে কিসাস (বিধান)-এর মধ্যেই রয়েছে জীবন (এর নিরাপত্তা) হে বুদ্ধি বিবেক ওয়ালা লোকেরা! আশা করা যায়, তোমরা (এ আইনের প্রতি অবজ্ঞা করা থেকে) বিরত থাকবে।[৩৫৭]

সামাজিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার এহেন বিধানের মধ্যে যে মানুষের জীবন নিহিত রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কারণ এহেন বিধান দ্বারা মানুষকে হত্যার অপরাধ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। সুতরাং একজনের মৃত্যু দণ্ডের দ্বারা সমাজের বহু প্রাণ রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এর দ্বারা যেএ মানব জীবন রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে, অনুরূপ সমাজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব এবং তার মূল কাঠামো ছত্রভঙ্গ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩৫৮]

বস্তুত: ইসলাম সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা ও সহানুভূতিশীলতাকে তার সমুদয় সম্ভাব্য পথে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। ব্যক্তি এবং সমাজ তথা রাষ্ট্র উভয়ের সমুদয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে একই থাকবে এবং জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগগুলি যে, একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থাকবে, একে অপরের পরিপূরকরূপে কাজ করে যাবে, এ নীতিমালাই ক্রিয়াশীল থাকে তার এহেন প্রচেষ্টার পিছনে।

সুতরাং যে ব্যক্তিকে এমন একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত স্বাধীনতা দান করা হয়, যা তার নিজের জন্য যেএ ক্ষতিকারক হয় না, অনুরূপ তা সমাজ পথেও প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় না। সে সমাজ তথা রাষ্ট্রও তার পূর্ণ অধিকার দান করে বটে। কিন্তু সাথে সাথে এ সকল অধিকার সমূহের মোকাবিলায় তার ওপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে থাকে যেন, জীবনটি তার গতিপথে বিনা বাঁধা বিপত্তিতেই সামনে অগ্রসর হয়ে পরিশেষে সে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হয়, যার জন্য ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই সমবেত ভাবে চেষ্টিত থাকে।[৩৫৯]

---

৩৫৬. আল কুর'আন, ৫: ৪৫

৩৫৭. আল কুর'আন, ২: ১৭৯

৩৫৮. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫

৩৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

৪র্থ অধ্যায়

পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল কারণসমূহ এবং এর সমাধানে কুর'আনের নির্দেশনা

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার হচ্ছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। সভ্যতা নির্মাণে পরিবারের অবদানই সবচেয়ে বেশি। মাতৃগর্ভে জন্ম নিলেই একটি শিশু মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠে না। মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তাকে মূল প্রশিক্ষণ দেয় তার পরিবার। কাজেই একটি সভ্যতা নির্মাণের জন্য পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পাশ্চাত্যে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন এ প্রতিষ্ঠানটি আজ বিপর্যয়ের মুখে। পরিবারই যে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়, সে কথাটি যেন পাশ্চাত্যের নীতিনির্ধারকরা ভুলতেই বসেছেন। পরিবার যে উচ্চতর এক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গড়ে উঠে, তারা পরোক্ষভাবে তা অস্বীকার করছেন। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যৌনতাই পরিবারের সবকিছু নয়। পরিবার প্রথা ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজ এবং রাষ্ট্রে শান্তি নিশ্চিত করে। কিন্তু পাশ্চাত্যে যৌনতাকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়া হচ্ছে। সব কিছুর ওপর যৌনতা প্রাধান্য পেলে মানুষ আর পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীব হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখে না। আসলে সুস্থ ও সমৃদ্ধ পরিবার একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ ও সভ্যতার জন্ম দেয়। অপরদিকে, পারিবারিক বিপর্যয় সভ্যতা ধ্বংসের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিবার ব্যবস্থা সৃষ্টিকর্তার অন্যতম বড় অনুগ্রহ। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে পরিবার নামক সুখের নীড়গুলোকে নির্মূল করার অপচেষ্টা ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। পরিবার এমন একটি ব্যবস্থা যা ধার্মিক ও ধর্মহীন সমাজেও গ্রহণযোগ্য। ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিবেকবান মানুষ বা যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সমাজ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। পরিবারগুলো মানুষের স্নেহ-ভালবাসার চাহিদাসহ অন্য অনেক চাহিদাও মেটায়। তাই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবার-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮৪ সালে পারিবারিক সংকটগুলো নিরসনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি ৫-সালা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানায়। সাধারণ পরিষদ ১৯৮৯ সালে এক প্রস্তাবে ১৯৯৩ সালকে বিশ্ব পরিবার বর্ষ হিসেবে অনুমোদন করে এবং ১৫ ই মে-কে বিশ্ব পরিবার দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধের দিকে ফিরে যাওয়ার সংস্কৃতি জোরদার করা এবং পরিবারগুলোর ভিত্তিকে শক্তিশালী করা ছিল এসব কর্মসূচির উদ্দেশ্য। বর্তমানে এ দিবসটি প্রত্যেক দেশেই পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দিন এবং এ সংক্রান্ত নানা কর্মসূচি পালনের উপলক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। ক্রমেই পরিবার প্রথার বিলোপ ঘটছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানা সংকট। পুঁজিবাদ তথা বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা, পরিবার ব্যবস্থা বিলুপ্তির ক্ষেত্রে উস্কানি হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেও এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতায় নারী ও পুরুষ সম্পর্ক মানবীয় নয়, নিতান্ত পাশবিক। পাশবিক উত্তেজনা ও যৌন-লালসার পরিতৃপ্তিই হচ্ছে তথায় সাধারণ নারী-পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি। এর ফলে বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা বিপর্যয় ও ব্যর্থতার সম্মুখীন। অথচ নারী-পুরুষের মিলন ও একাত্মতাকে সভ্যতার অগ্রগতির কারণ ও বাহনরূপে গণ্য করা হয়েছে চিরকাল। সেজন্যই দেখা যায়, নারী-পুরুষের মিলনে জীবনে যে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ হওয়া বাঞ্চনীয় বর্তমান

মানুষ তা থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত। বর্তমান সভ্যতা পরিবারকে চূর্ণ করে, পরিবারের গুরুত্ব হ্রাস করে দিয়ে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে রাষ্ট্রকে। অথচ পরিবার হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ। বর্তমানে ব্যক্তির কাছেও পরিবারের গুরুত্ব যেন অনেকখানিই কমে গেছে। পরিবারের প্রতি কোনো আকর্ষণই বোধ করে না। স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর, পুত্র পিতার, পিতা পুত্রের, ভাই ভাইয়ের, ভাই বোনের, বোন ভাইয়ের প্রতি কোনো দরদ অনুভব করছে না। কেউ কারো ধার ধারে না, পরোয়া করে না। অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। ফলে সমাজ জীবনের যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তা শুধু সভ্যতাকেই ধ্বংস করছে না, মনুষ্যত্ব ও মানবতাকেও দিচ্ছে প্রচণ্ড আঘাত।[৩৬০]

পাশ্চাত্যে তালাকের পরিমাণ বেড়ে গেছে। পাশাপাশি বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠনের প্রতিও আগ্রহ অনেক কমে গেছে। যৌন স্বাধীনতা, ব্যক্তিবাদ ও ভোগ-বিলাসিতাই এখন পাশ্চাত্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এ কারণে সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। এর ফলে বিয়ে ও পরিবার গঠনে তারা আগ্রহী নয়। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক ডেভিড এইচ. ওলসন লিখেছেন, 'আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষই দেরিতে বিয়ে করছে। অনেকেই বলছে, তারা তাদের পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মতো তালাক নিতে চান না। তবে এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করার মতো কোনো আদর্শ তাদের সামনে নেই।' পাশ্চাত্যের পত্রপত্রিকাগুলোও মানুষকে পরিবার গঠনের বিষয়ে অনাগ্রহী করে তুলছে। ফরাসি ম্যাগাজিন 'এলে'তে কর্মরত একজন বিশেষজ্ঞ বিয়ে করতে ইচ্ছুক এক নারীকে পরামর্শ দিতে যেয়ে বলেছেন, তুমি কুকুরকে বিয়ে করো। কারণ একমাত্র কুকুরই তোমাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসে।

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে মূলত জাহিলিয়াতের ভিত্তি। আর যে সভ্যতার ভিত্তিই হয় বস্তুবাদ, সেখানে মানুষ ও পশুতে বড় একটা পার্থক্য থাকতে পারে না। বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকার সভ্যতা এ বস্তুবাদী জীবন দর্শন এ দৃষ্টিভঙ্গীর উপরই ভিত্তি করে গড়া। ফলে সেখানকার সমাজ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সন্তান সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পিতা মাতা তাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, তাদের কোনো দায়িত্বই বহন করতে প্রস্তুত হয় না। ঘর থেকে তাদের বের করে দেয়। এমনকি তখনও যদি কোনো সন্তান ছেলে কিংবা মেয়ে পিতার ঘরের কোনো অংশ ব্যবহার করে, তাকে তার জন্য দস্তুরমত ভাড়া দিতে হয় এবং একজন ভাড়াটের মতোই তাকে সেখানে থাকতে হয়। শুধু তাই নয়, তাদের বিয়ে শাদীরও কোনো দায়িত্ব পিতা মাতা বহন করতে রাজি হয় না। ছেলে ও মেয়ে যেখানে যার ইচ্ছা এবং যার সাথে ইচ্ছা বিয়ে করুক বা না-ই করুক, তাতে পিতামাতার কিছু যায় আসে না। এরূপ আচরণ সত্যিই মনুষ্যত্বের ঘোর অপমৃত্যু ঘটেছে বলে প্রমাণ করে।[৩৬১]

প্রতিটি সমাজের ভিত্তিমূল হচ্ছে পরিবার। এ কারণে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে সমাজে নৈতিক অবক্ষয়সহ নানা সমস্যা ও সংকট দেখা দেয়। পাশ্চাত্য-সমাজেই এ ধরনের সংকট সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যণীয়। এনলাইটমেন্টের যুগ এবং শিল্প বিপ্লবের পর একবিংশ শতাব্দির শুরু থেকে পাশ্চাত্যে সামাজিক সংকট তীব্রতর হতে শুরু করে। গত কয়েক দশক ধরে পশ্চিমা দেশগুলোতে বিয়ের

---

৩৬০. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১০), পৃ. ৩৯

৩৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

পদ্ধতি ও পারিবারিক জীবন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সেখানে গোটা পরিবার ব্যবস্থাই এখন হুমকির সম্মুখীন। পরিবার ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ হলো, পাশ্চাত্য সমাজে হিউম্যানিজম, লিবারেলিজম, সেক্যুলারিজম ও ফেমিনিজমের মতো বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব। গত কয়েক শতাব্দি ধরে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নীতির উৎস হিসেবে অনুসরণ করা হচ্ছে এসব মতবাদকে। পাশ্চাত্যের এসব মতবাদে ধর্ম ও নৈতিকতাকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব মতবাদ অনুযায়ী, অন্যের ক্ষতি না করে একজন ব্যক্তি সব ধরনের অনৈতিক কাজ করতে পারে। এ কারণে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সমকামিতা, বিয়ে বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক এবং গর্ভপাতের মতো অনাচারগুলো স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হতে শুরু করেছে।

১ম পরিচ্ছেদ

পরিবারবিহীন সমাজঃ মানবতার অধঃপতন

পরিবার মানব সমাজ সৃষ্টির মূলভিত্তি। সামাজিক জীবনে মানব সভ্যতার রাস্তা তৈরি করেছে পারিবারিক ব্যবস্থা। পরিবার নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি শিশু সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

আদিম যুগে মানুষ পরিবারবিহীন দলবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতো। যাযাবর শিকারী জীবন ছিলো। বাঁচার প্রয়োজনে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য এবং খাদ্যের অন্বেষণে ছুটে বেড়াত দিক থেকে দিকে। কালের বিবর্তনে আদিমযুগের মানুষেরা তাদের অদম্য শক্তির বলে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার স্পৃহা অর্জন করে এবং খাদ্য সংগ্রহের নিশ্চয়তা অর্জন করতে থাকে। এ সবের ফলে যাযাবর জীবনের পরিবর্তে তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ আগ্রহ থেকেই নিরাপত্তার জন্য তারা পারিবারিক জীবনের প্রয়োজন বোধ করে।

মানবজাতির প্রাথমিক ইউনিট হচ্ছে তার পরিবার। পরিবারবিহীন মানুষ পৃথিবীতে কোনো কার্যকর সংস্থা নয়। ব্যক্তি নিজস্ব প্রতিভায় সমাজের অনেক উপকার করতে পারে। কিন্তু সমাজ গড়তে পারে না। স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক প্রচেষ্টায় একটি পরিবার গড়ে উঠে এবং তাদের অপত্য স্নেহ ও নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে সন্তান প্রতিপালিত হয়। অতঃপর পিতা-মাতার আচরণসমূহ রপ্ত করেই সন্তানরা পর্যায়ক্রমে নিজেদের আচরণকে বিকশিত করে সুন্দর মানুষে পরিণত হয়। বিয়ে হচ্ছে পরিবার প্রথা উদ্ভবের মূল চাবিকাঠি। মানব সমাজে বিয়ে কিংবা পরিবার উদ্ভবের কারণগুলো হচ্ছে:

ক. মানব সমাজে স্বেচ্ছাচার যৌন সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে শৃংখলা আনয়ন করা।
খ. সন্তানদের মাধ্যমে মানব জীবনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা।
গ. বংশগতির মাধ্যমে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা।
ঘ. সামাজিক জীব মানুষের একাকিত্ব দূর করা।
ঙ. মানুষের মাঝে মানবিক গুণাবলী যেমন: স্নেহ, প্রীতি ও ভালোবাসার সুযোগ করে দেওয়া।

মানব সভ্যতার বিকাশে বিয়ে কিংবা পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও আধুনিক এ বিশ্বে বিয়ে কিংবা পরিবার প্রথা ক্রমশ যে অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছে তা সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকায় পরিবার প্রতিষ্ঠান ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছে। বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠনের প্রচলন কিছুটা থাকলেও উচ্চহারে বিয়ে বিচ্ছেদের কারণে সেখানকার বেশির ভাগ পরিবারই আজ ভংগুর এবং সমাজে বিয়ে প্রথা প্রায় নেই বললেই চলে। বিয়ে বহির্ভূত 'লিভ টুগেদার' এর গ্রহণযোগ্যতা সেখানকার সমাজে অনেক বেশি। আবার এ 'লিভ টুগেদারে'র স্থায়িত্বও খুব বেশী নয়। সমাজে এর প্রতিক্রিয়া খুব ভয়াবহ। বিশেষ করে সন্তান-সন্ততির স্বাভাবিক মনস্তাত্বিক বিকাশে প্রচন্ডভাবে ব্যাহত হয়। পাশ্চাত্যে এটি একটি সাধারণ ঘটনা। বিয়ের আগে পরস্পরকে জেনে নিতে, বুঝে নিতে, মানিয়ে নিতে অনেকেই 'লিভ টুগেদার' করে থাকে। 'লিভ টুগেদার' কোনো সামাজিক স্ট্যাটাস নয় বিধায় ব্যক্তি সামাজিকভাবে ও আইনগত দিক দিয়ে কোনো সুবিচার পান না। 'লিভ টুগেদার' যারা করছেন তারা করছেন একই ফ্ল্যাটে থেকে তাদের জৈবিক চাহিদাও মিটছে আবার সামাজিক নিরাপত্তাও থাকছে। কিন্তু এর ফলে সমস্যা হচ্ছে সমাজে এক ধরনের অপরাধ তৈরি হচ্ছে। কোনো কারণে তাদের মাঝে মিল না হলে খুন হয়ে যাচ্ছে মেয়ে বা ছেলেটা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এ 'লিভ টুগেদারে'র শেষ পরিণতি হয় বিচ্ছেদ। আর ছেলেটা বা মেয়েটা খুন হচ্ছে এ 'লিভ টুগেদার' সম্পর্কের বিচ্ছেদের কারণেই। অথবা তারা

সম্পর্কে ব্যর্থ হয়ে বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ। আত্মহত্যা যারা করে, তাদের মধ্যে নিজেদের প্রতি ভালোবাসাটা নেই। তাই তারা সহজেই নিজেদের শেষ করে দিতে পারে। পারিবারিক বন্ধন জোরালো হলে তাদের মধ্যে এ প্রবণতা থাকতো না।

পরিবার প্রথা ক্রমশ বিলুপ্তির কারণে সমাজ ভারসাম্যতা হারাচ্ছে। মানুষের মাঝে বাড়ছে নিঃসঙ্গতা এবং মানবিক গুণাবলী চর্চার সুযোগ লোপ পাচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে উন্নত বিশ্বের জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধ বয়সে শেষ আবাসস্থল হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রম। যারা বৃদ্ধ তারা নিজেদের সকল সময়, সম্পদ বিনিয়োগ করেছিলেন তাদের সন্তানদের জন্য। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের কাছ থেকে এর একটি ক্ষুদ্র অংশও তারা পাচ্ছেন না। সন্তান পিতা- মাতাকে পরিবারের বোঝা মনে করে তাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বৃদ্ধাশ্রমে। পিতা- মাতার সাথে সন্তানদের দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। পরিবার ভাঙ্গনের কারণে বৃদ্ধরা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্থাৎ আশ্রয় ও বাসস্থান হারাচ্ছেন। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা পরিবারের ছায়াতলে স্বস্তিতে বসবাস করতে পারছেন না। বয়সের ভারে এক সময় ন্যুজ হয়ে আসে মানবদেহ। দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গগুলো তখন আর যথা নিয়মে কর্মসম্পাদন করতে পারে না। দেহে সৃষ্টি হয় নানা অসুখ বিসুখ। পরিবারে প্রবীণ ব্যক্তিদের নানা ধরনের শারীরিক মানসিক সমস্যায় অনেক সময়ই বিরক্ত হন পরিবারের অন্য সদস্যরা। ভেঙ্গে গিয়েছে পারিবারিক বন্ধন। হারিয়ে গিয়েছে পারিবারিক সহযোগিতা।

বিয়ে কিংবা পরিবার প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে ভোগবাদী দর্শন প্রসূত মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতাকে চিহ্নিত করা যায়। ভোগবাদী সমাজের চারপাশে অজস্র ভোগ্যপণ্যের হাতছানি। কর্পোরেট ব্যবসার বিজ্ঞাপনে মানুষের মনে সৃষ্টি হচ্ছে নানা পণ্যের কৃত্রিম চাহিদা। ভোগের মাঝেই মানুষ খুঁজছে সবধরনের সুখ। পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও আশংকামুক্ত নয়। অর্থনৈতিক কারণে সমাজে একান্নবর্তী পরিবার বিলুপ্ত। যৌথ পরিবারও প্রায় বিলুপ্তির পথে। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যৌথ পরিবার থেকে একটি শিশু নৈতিকতা সম্বলিত যে আদর্শিক জীবন পেয়ে থাকে তা তার পরবর্তী জীবন সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে তার নিজের অবস্থান তৈরিতে সাহায্য করে। বিশেষ করে প্রবীণরা তো পরিবার ও সমাজের ভিত্তি। প্রত্যেক প্রবীণ ব্যক্তিই কোনো না কোনো দিক থেকে আমাদের শিক্ষক। তাঁদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও সহযোগিতা নবীণদের চলার পথের পাথেয় হতে পারে। পরিবার মানুষকে একটি স্থানে ও একটি লক্ষ্যে চলতে সাহায্য করে। পরিবারের একজন মানুষ লক্ষ্যচ্যুত হলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাদেরকে সঠিক পথে চলতে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনতে তৎপর হয়।

মানুষের আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার প্রবণতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উদ্ভবের কারণে যৌনতার প্রসার, সামাজিক বা ধর্মীয় অনুশাসনের চেয়ে ব্যক্তিগত চাহিদাকে গুরুত্ব প্রদান মানুষকে পরিবারবিহীন করে তুলছে।

পরিবার না থাকার ক্ষতিকর দিকসমূহ:

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ •

অর্থ: আর আমরা তাদের আদর্শের অনুগামী করেছিলাম আরো অনেক রাসূলকে এবং অনুগামী করেছিলাম ঈসা ইবনে মরিয়মকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইনজিল। তার অনুসারীদের অন্তরে

দিয়েছিলাম, করুণা এবং দয়া। আর বৈরাগ্য-যা তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে উদ্ভাবন করে নিয়েছিল, আমরা এ বিধান তাদের দেইনি। অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। ফলে তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল আমরা তাদের দিয়েছিলাম তাদের পুরস্কার। তবে তাদের অধিকাংশই ছিলো ফাসিক (সত্যত্যাগী)।[৩৬২]

পরিবার প্রথাকে স্থায়ী করতে হলে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন। মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক অনুশাসন ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রসার ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করা সম্ভব।

৩৬২. আল কুর'আন, ৫৭:২৭

২য় পরিচ্ছেদ

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক অশান্তি

বর্তমানে পাশ্চাত্যে ঐতিহ্যবাহী ধারার পরিবার বলতে আর কিছুই নেই, বরং পরিবারগুলো এক কর্তার আওতাধীন পরিবার বা উপ-পরিবার কিংবা সিকি-পরিবারে পরিণত হয়েছে। সেখানে তালাকের হার ক্রমেই বাড়ছে এবং টিকে-থাকা মুষ্টিমেয় পরিবারগুলোর অস্তিত্বও হুমকির মুখে রয়েছে। কারণ, পাশ্চাত্যে তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদকে খুবই সহজ করে দেয়া হয়েছে। যেমন, পাশ্চাত্যে স্বামী ও স্ত্রী কোনো গুরুতর কারণ ছাড়াই যদি বলে যে, আমাদের আর একসাথে জীবন-যাপন করতে ভাল লাগছে না, তাহলে এই অনুভূতিই তালাকের গ্রহণযোগ্য কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। পাশ্চাত্যে স্বামীরা খুব সহজেই পরিবারকে ত্যাগ করছেন। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্ত্রীরা তাদের সন্তানসহ একাকী জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিশ্বের যেসব দেশে তালাকের হার সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে আমেরিকা অন্যতম। মার্কিন সাপ্তাহিকী নিউজউইক লিখেছে, আমেরিকায় তালাক নেয়াটা ট্যাক্সি ভাড়া করার মতোই অতি সহজ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তবে যেসব নারী তালাক নিচ্ছেন,তাদের এক-চতুর্থাংশই অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়ছেন। এ ধরনের নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও সাধারণ নারীদের তুলনায় তিন গুণ। আমেরিকায় একজন স্বামী ও স্ত্রী কোনো কারণ উল্লেখ না করেই তালাক নিতে পারে। এর ফলে সেখানে তালাকের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে।[৩৬৩]

মার্কিন পরিসংখ্যান বিভাগ ২০০৬ সালে জানিয়েছে, ১৮ বছরেরও কম বয়সের মার্কিন তরুণ-তরুণী বা বালক-বালিকার শতকরা ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ এমন পরিবারে বসবাস করছে যেখানে নারীই পরিবারের অভিভাবক বা উপার্জনকারী। যেসব বাবা কন্যা থেকে দূরে থাকেন সেসব কন্যারা পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় নড়বড়ে ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। এইসব কন্যারা পুরুষদের বিশ্বাস করতে পারে না।[৩৬৪]

বাংলাদেশেও তালাকের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য মতে ২০১২ থেকে ২০১৮ এ কয়েক বছরে তালাকের প্রবণতা বেড়েছে ৩৪ শতাংশ। ২০১৮ সালে বিবিএস ও ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের ছয় বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে অর্ধ লাখের বেশি তালাকের আবেদন জমা পড়েছে। সে হিসেবে মাসে গড়ে ৭৩৬টি, দিনে ২৪টিরও বেশি এবং ঘন্টায় ১টি করে তালাকের আবেদন করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মীমাংসা হচ্ছে গড়ে ৫ শতাংশেরও কম।[৩৬৫]

তালাক ব্যাপারটি কোনো সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি কারো জন্যই কোনো সুখকর বা আকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নয়। বিয়ের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে মানব মানবী আজীবন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়, তাদের লালন পালন করে এক সাথে। তাদের পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয়, একে অন্যের দায়িত্ব নেয়, দু'জনের মধ্যে থাকে ভালোবাসা এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা। এটাই সুস্থ বিয়ের ফলাফল। তালাক বাড়তে থাকলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বাড়তে থাকে।

---

৩৬৩. আল হাসনাইন, *বর্তমান বিশ্বের পরিবারগুলোর অবস্থা*, http://alhassanain.org/bengali/?com=content&id=66

৩৬৪. প্রাগুক্ত (আল হাসনাইন, ৩১ অক্টোবর ২০১৩), http://alhassanain.org/bengali/com=content&id=270

৩৬৫. মরিয়ম চম্পা, *যে কারণে বাড়ছে তালাক* (ঢাকা: মানবজমিন, ৩ জুলাই, ২০১৯) পৃ.১, www.m.mzamin.com > article

মানুষের নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্নতা বাড়তে থাকে। সন্তানের পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের জন্য বাবা, মা দু'জনের স্নেহ, ভালোবাসা, শাসন, সবকিছুরই দরকার আছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বাবা-মা আলাদা হওয়ার পর সন্তানেরা বিশেষকরে মেয়ে সন্তানেরা মারাত্মক সমস্যার মুখে পড়ে। তারা অর্থনৈতিক সমস্যাসহ শিক্ষা ক্ষেত্রেও ক্ষতির শিকার হয়।

পাশ্চাত্যে গর্ভপাতের পরিমাণও ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। বিশেষকরে আমেরিকা, ব্রিটেন ও কানাডায় ভ্রুণহত্যার মতো অমানবিক তৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কোনো পদ্ধতিতে গর্ভস্থ শিশুকে গর্ভের ভেতরেই মেরে ফেলা খুবই আমানবিক ও নৃশংস কাজ। এ কাজ মানুষের সহজাত প্রকৃতির বিরোধী। মাইকেল লিচফিল্ড এবং সুসান কেন্টিশ নামের দুই বৃটিশ গবেষক জানিয়েছেন, বৃটেনে গর্ভস্থ শিশুর জীবন নাশ বা গর্ভপাতের হার ব্যাপক মাত্রায় বেড়ে যাওয়ার কারণে এইসব শিশুর মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য বিশেষ ধরনের অনেক চুল্লী বানানো হয়েছে। প্রতিবছর গর্ভপাতের শিকার হাজার হাজার শিশুর মৃতদেহ পোড়ানো হচ্ছে চুল্লীতে। গর্ভস্থ শিশু হত্যার নৃশংস চিত্র এখানেই শেষ নয়। পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর মুনাফালোভী মানুষ আজকাল বিপুল অর্থের লোভে গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করছে চিকিৎসা গবেষণায় তাদের ব্যবহার করার জন্য। কানাডীয় লেখক উইলিয়াম গার্ডনার লিখেছেন, "নিহত ভ্রুণ শিশুর কোষগুলো সুস্থ ও খুব তাজা বলে এসব কোষ চিকিৎসা গবেষণায় ব্যবহার করছে কেউ কেউ। গর্ভস্থ শিশু বা ভ্রুণ শিশুর মৃত্যুর পরপরই তার দেহের কোষ ও চামড়াগুলো সতেজ থাকা অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়। এইসব কোষ অন্যদের কোষের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।" যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ১৫ লক্ষ ভ্রুণ-শিশু হত্যা করা হচ্ছে। একজন মার্কিন গবেষক গর্ভপাতের করুণ দৃশ্য রেকর্ড করেছেন গর্ভের ভেতরে ক্যামেরা বসিয়ে। তার এ ভিডিও চিত্রের নাম দেয়া হয়েছে "নীরব আর্তনাদ"। এই ফিল্মে দেখা গেছে, তিন মাসের এক অসহায় ভ্রুণশিশু কিভাবে যন্ত্রের হাত থেকে পালানোর হতাশাব্যাঞ্জক চেষ্টা করছে এবং গর্ভপাতকারী যন্ত্র কিভাবে একের পর এক ওই শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কেটে কেটে বের করে আনছে।

জার্মানির বিখ্যাত লেখক ও রাজনীতিবিদ কার্ল শ্নাইডার পাশ্চাত্যে পরিবার বিষয়ক আইনের সমালোচনা করে বলেছেন, প্রচলিত আইন পরিবারের নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার মতে, পরিবার হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। ব্যক্তিত্ব গঠন ও নারীর সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে পরিবারের বিকল্প নেই। কিন্তু তারপরও পাশ্চাত্যে পরিবার প্রথাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা আরো বলছেন, মানুষের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু সব কিছু জেনেও পাশ্চাত্যের মানুষ নিজেই নিজের অপূরণীয় ক্ষতি করছে। পরিবারের সদস্যরা তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ কারণে পাশ্চাত্যে নারীরা মা ও স্ত্রী হিসেবে তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। একজন পুরুষও পরিবারের প্রধান হিসেবে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না। বাবা-মায়েরা নিজেদের বিনোদন ও স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। সন্তান লালন-পালন তথা পরিবার ব্যবস্থাপনা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়। পাশ্চাত্যের পরিবারগুলোর এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীই ওই সমাজের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় বয়ে আনছে। পাশ্চাত্যে পরিবার বিপর্যস্ত হওয়ায় সবচেয়ে বেশি অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারী। পাশ্চাত্য সমাজে নারীদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিজ্ঞাপন,পর্ণচিত্র ও নাচ-গানের মত বিনোদন শিল্পে। পাশ্চাত্যে বর্তমানে পারিবারিক ব্যবস্থার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা ঐতিহ্যবাহী ও প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। পাশ্চাত্যে পরিবার ব্যবস্থায় এই যে পরিবর্তন, তা সমসাময়িক ইতিহাসে নজিরবিহীন এবং এ পরিবর্তন সব শিল্পোন্নত দেশে প্রভাব ফেলেছে।

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী নীতিও পরিবার ব্যবস্থাকে পতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাশ্চাত্য সমাজের বাবা-মায়েরা ডে-কেয়ার সেন্টারে সন্তানদেরকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রেখে দেন। সেখান থেকে ভালো-মন্দ যা শেখে, তাকেই তারা যথেষ্ট বলে মনে করে। কিন্তু ডে-কেয়ার সেন্টার যে কখনোই বাবা-মায়ের মতো মায়া-মমতা ও উষ্ণতা দিতে পারছে না। পরিবার হচ্ছে শান্তি-সুখের নীড়। ইসলামে শিশুদের বলা হয়েছে মন ও দৃষ্টি জুড়ানো আদরের ধন। ধর্মীয় জীবন ধারায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ভাবনাকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে,কিন্তু পরিবার-স্বজন,রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করে ব্যক্তিকে আলাদা করে ভাবার কোনো অবকাশ রাখেনি।

পাশ্চাত্যে যে রাষ্ট্র ও সমাজে 'বস্তুবাদ' যত বেশি প্রভাব ফেলতে পেরেছে, সেই সমাজ ও রাষ্ট্রে লিভটুগেদার ও সমকামিতা তত বেশি বেড়েছে। সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে। পরিবারগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে। শিশু কিশোররা নীতি ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। বৃদ্ধ মা ও বাবার ঠাঁই হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা বাড়ছে। সমকামিতার মতো প্রকৃতিবিরোধী প্রবণতাও সমাজকে গ্রাস করছে। এরইমধ্যে পাশ্চাত্যের অনেক দেশে প্রকৃতি ও ধর্ম বিরোধী এমন প্রবণতাকে আইনি স্বীকৃতিও দেয়া হচ্ছে। এর ফলে 'পরিবার' সম্পর্কে চিরাচরিত সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্য বিশ্বে পরিবারের চিরাচরিত সংজ্ঞায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেখানে এখন পরিবার বা সামষ্টিক স্বার্থ ও কল্যাণের উর্ধ্বে স্থান পাচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থ। হিউম্যানিজমের ভিত্তিতে পাশ্চাত্যের মানুষ ব্যক্তিবাদী হয়ে ওঠায় পরিবারের প্রতিটি মানুষ কেবল তার নিজের স্বার্থ নিয়েই চিন্তিত। অন্যদের স্বার্থ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর ফলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতার মতো বিষয়গুলো গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।

বর্তমান সমাজে হিউম্যানিজমের পাশাপাশি সেক্যুলারিজম ও লিবারেলিজমের বিধ্বংসী ভূমিকাও সুস্পষ্ট। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতাই হচ্ছে সেক্যুলারিজম। এ ছাড়া, সমাজের চেয়ে ব্যক্তিই বেশি প্রাধান্য পায় লিবারেলিজমে। এ মতবাদে ব্যক্তিকে নিঃশর্ত ও লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়। সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি পাশ্চাত্যে। ইউরোপের ততকালীন খ্রিস্টান পাদ্রিদের দুর্নীতি ও অপশাসনের কারণে সেখানে রেঁনেসা শুরু হয়। কারণ সে সময় ইউরোপের সব সমস্যার জন্য খ্রিষ্টান পাদ্রিদের অপনীতিকে দায়ী বলে মনে করা হতো। ওই সব পাদ্রীর অন্যায় তৎপরতার কারণে ইউরোপের জনগণ খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিলো। অবশ্য এ ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইউরোপের সব ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার রয়েছে। মোটকথা, খ্রিষ্টান পাদ্রীদের ব্যর্থতা ও অপশাসনের কারণে পাশ্চাত্যে সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করেছে। সেক্যুলারিজমের মূল বক্তব্য হলো, সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রভাব থাকবে না। পাশ্চাত্যে প্রভাবশালী আরেকটি মতবাদ হচ্ছে, লিবারেলিজম। শিল্প বিপ্লবের পর নতুন যে সম্পদশালী শ্রেণী গড়ে উঠেছে, তারাই এ মতবাদের জন্ম দিয়েছে। লিবারেলিজমের সঙ্গে পুঁজিবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে লিবারেলিজমে সম্পদ ও পুঁজির গুরুত্ব সর্বাধিক। সম্পদ কীভাবে অর্জিত হলো,এ মতবাদে তা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এ কারণে লিবারেলিজমের ধারক-বাহকরা বিভিন্ন দেশে আগ্রাসন চালিয়ে এবং বিভিন্ন বৈষম্যমূলক নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করছে। বাস্তবিক অর্থে লিবারেলিজমে নীতি-নৈতিকতার কোন স্থান নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বর্তমানে স্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সমকামীদের বিয়েকে আইনি বৈধতা দেয়া হয়েছে। একইভাবে পাশ্চাত্য-সমাজে বিয়ে বহির্ভূত

অবাধ যৌনাচার এবং পর্ণো চলচ্চিত্র তৈরির প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। কারণ এর মাধ্যমে মুনাফা হয় অনেক বেশি।[৩৬৬]

এ ছাড়াও পারিবারিক জীবনে ধস নেমে আসার অন্যতম কারণ বৈরাগ্যবাদ। খ্রীষ্টিয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে খ্রিষ্ট ধর্মে বৈরাগ্যবাদ ব্যাপক আকার ধারণ করে। সে যুগে বৈরাগ্যবাদ হয়ে দাঁড়ায় এক সাধারণ ব্যাপার। তখন বহু বিজ্ঞজনও সমাজকে বিদায় জানিয়ে সংসারত্যাগী সাজে। মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন করাই ছিলো বৈরাগ্যবাদের মূল কথা। অসংখ্য সংসারত্যাগী মানুষ তাদের বাবা-মা, স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদেরকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। তারা মনে করতে থাকে পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন কতে গেলে তাদের মনে একাগ্রতা নষ্ট হবে। এভাবে বৈরাগ্যবাদের ফলে পরিবারগুলো অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়।

গর্ভ নিরোধ, গর্ভপাত, ভ্রুণ হত্যা কিংবা সদ্যপ্রসুত সন্তান হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর প্রয়োজন হলে অন্য কথা এবং তা নেহায়েত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো দিক দিয়েই এ কাজকে সমর্থন করা হয়নি। নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সর্বোপরি মানবিক সকল দিক দিয়েই এ কাজ শুধু অবাঞ্চিতই নয়, অত্যন্ত মারাত্মক। যে পিতামাতা নিজেরাই নিজেদের সন্তানের জানের দুশমন হয়ে দাঁড়ায়, তারা যে গোটা মানব জাতির দুশমন এবং কার্যত সে দুশমনি করতে একটুও দ্বিধা করছে না। কেননা নিজ ঔরসজাত, নিজ গর্ভস্থ বা গর্ভজাত সন্তানকে নিজেদের হাতেই হত্যা করার জন্য প্রথমত নিজেদের মধ্যে অমানুষিক নির্মমতা, কঠোরতা ও নিতান্ত পশুবৃত্তির উদ্ভব হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় এরকম কাজ কারো দ্বারা সম্ভব হতে পারে না, তা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। ব্যক্তির এ নির্মমতা ও কঠোরতাই সংক্রমিত হয়ে গোটা জাতিকে গ্রাস করে, গোটা জাতির প্রতিই তা শেষ পর্যন্ত আরোপিত হয়। বস্তুত নিজেদের সন্তান নিজেরাই ধ্বংস করে এর দৃষ্টান্ত প্রাণী জগতে কোথাও পাওয়া যায় না।[৩৬৭]

পরিবারগুলোর বন্ধন বা পরিবার-ব্যবস্থাকে জোরদার করা বর্তমান বিশ্বে খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। যদিও পাশ্চাত্যে পরিবারকে সমাজের ভিত্তি বলা হচ্ছে এবং বিশ্ব পরিবার দিবসও আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হচ্ছে, কিন্তু তিক্ত বাস্তবতা হল, পাশ্চাত্যে পরিবারগুলো দিনকে দিন আগের চেয়েও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছে। পরিবার থেকেই সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। কারণ সমাজের প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানুষ তার পরিবার থেকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের রীতি-নীতি তথা সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় লাভ করে। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হলে সামাজিক সম্পর্কেও এর প্রভাব পড়ে।

বর্তমান সময়ে সামাজিক অপরাধগুলো মাত্রা অতিক্রম করতে চলেছে। দেশে ভয়াবহ ব্যাধীর মতো দানা বাঁধছে পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়। অর্থের প্রতি লালসা, নৈতিক মূল্যাবোধের অভাব, অন্য দেশের সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা, দাম্পত্য কলহ, মাদকাসক্তি ইত্যাদির কারণে সামাজিক অবক্ষয় বেড়েই চলছে। কার্যকর বিচার ব্যবস্থার অভাবে অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে অপরাধীরা। অবক্ষয়ের সূত্রপাত হয় পরিবার থেকেই। পরিবারগুলোতে নৈতিকতার যথার্থ চর্চা হয় না। এ ছাড়াও পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও তৎপরতার অভাব রয়েছে। পরিবার থেকেই উৎপত্তি হয় ক্ষোভ ও বিশ্বাসহীনতা। পরিবারের সদস্যরাই

---

৩৬৬. আশরাফুজ্জামান মিনহাজ, *পারিবারিক সংকট এবং মূল্যবোধ বনাম নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি* (), পৃ. ১, https://www.facebook.com/Ashrafuzzaman.Minhaz/posts/264449477051116

৩৬৭. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে তাদের মানসিকতা ও কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটে। পরিবারকে মানবজাতির প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা হলেও বর্তমানে সে কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পরিবারগুলো নেই। যথার্থ জীবন দর্শন ও জীবনদৃষ্টির অভাবে পরিবারগুলো এখন ভোগ- বিলাস, অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পরশ্রীকাতর এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উন্নত বিশ্বে নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা ও ভোগ-বিলাসের উপায়-উপকরণ অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও সেখানে আমাদের দেশের তুলনায় আত্মহত্যার পরিমাণ, পাগলা গারদ, খুন-ধর্ষণ, ছিনতাই, ছাড়াছাড়ি-মারামারিও অনেক বেশি। বৃহত্তম মানব-সমাজের একক ইউনিট-পরিবারব্যবস্থা সেখানে ভেঙ্গে পড়েছে। সেখানকার নাগরিকরা নিজেদের শারীরিক প্রবৃত্তিজাত চাহিদা পূরণেই এত ব্যস্ত যে, অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসবে দূরের কথা, নিজের মানসিক সমস্যাগুলো নিয়েও একান্তে ভাববার বা আলোচনা করবার সময় নেই। ওরা পুরোপুরি যান্ত্রিক। যান্ত্রিক হলেও ভালোই ছিল, হৃদয়ে অশান্তি স্পর্শ করতে পারত না। কারণ যন্ত্রের কোন হৃদয় নেই। কিন্তু ওদের সম্পূর্ণ যান্ত্রিকও বলা যায় না, সমস্যাটা এখানেই। অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস সারা জীবন ধরে মানসিক সমস্যা ও অশান্তি চাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু বিশেষ সময় ও পরিস্থিতিতে যখন তা বিস্ফোরিত হয় তখন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। আমাদের বাংলাদেশে এ সমস্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এজন্য যুবসমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক সমস্যা ও অশান্তির ব্যাপারে সচেতনতা প্রয়োজন।

৩য় পরিচ্ছেদ

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়: হুমকির মুখে পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা

অবক্ষয় শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ক্ষয়প্রাপ্তি'। বর্তমান আধুনিকতার বিশ্বে আমরা বাস করছি এক চরম নৈতিক অবক্ষয়ের মাঝে। প্রতিনিয়ত অধঃপতিত হচ্ছে যুব সমাজ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও ব্যবহারের ফলে মানুষ বস্তুগত উন্নতির অনেক উপরে উঠেছে। তবুও সামগ্রিকভাবে সুখী হতে পারছে না মানুষ। সর্বত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে অস্থিরতা, ভয়, ভীতি, শংকা ও অনাস্থা। বৃদ্ধি পাচ্ছে শোষণ, নির্যাতন ও অরাজকতা। আজ পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায়, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাঙ্গনসহ সবক্ষেত্রে চরম অবক্ষয়ের ছাপ। যেখানে নৈতিকতা অনুপস্থিত, সেখানেই সামাজিক অবক্ষয় সবচেয়ে বেশি। বর্তমান বিশ্বে নৈতিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে ধর্ম বিমুখতা, ধর্মের অপব্যবহার, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব এবং সর্বগ্রাসী অশ্লীলতার প্রসার।

একটি জাতির আত্মবিশ্বাস তার নৈতিক মূল্যবোধে। আর কোনো জাতির ধ্বংসের প্রধান বাহন হচ্ছে অনৈতিকতার প্রসার। ইসলাম নৈতিকতার বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মধ্যে এমন আচরণ যা অপরের প্রতি ক্ষমা, উদারতা, দানশীলতা, ধৈর্য, বিনয় ও নম্রতা এসব গুণে গুণান্বিত হওয়া বুঝায়। ভালো গুণাবলীগুলোর সঠিক বিকাশ ও উৎকর্ষতা সাধনই নৈতিকতা। আর এটিই সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। যে সমাজের মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ যতোঁ বেশি হবে সে সমাজের মানুষ ততোঁই শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে। সমগ্র পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর বিষয়সমূহকে নৈতিকতা হিসেবে ধরা হয়।

নৈতিক অবক্ষয়ের মৌলিক কারণসমূহ:

০১. শিক্ষার অভাব: শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সবকিছু জানতে পারে, বুঝতে পারে। প্রকৃতার্থে জ্ঞান অর্জনের দ্বারাই মানুষ সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ •

অর্থ: পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।[৩৬৮] এ মর্মে রাসূল (সা.) বলেন, "প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জ্ঞানার্জন ফরয।"[৩৬৯]

শিক্ষার সাথে যাদের সম্পর্ক নেই তারা অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয় এবং ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারে না। ফলে তারা অপরাধ জগতের সাথে মিশে যায় এবং তাদের মাধ্যমে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। ইসলামী শিক্ষার বড় উদ্দেশ্যই হলো হৃদয়ে নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটানো। ন্যায় ও সততার আলোকায়ন যা তাকে সব ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখবে। রাসূল (সা.) বলেন, "উত্তম চরিত্র থেকে মিযানে অধিক উত্তম কোনো আমল নেই।"[৩৭০]

---

৩৬৮. আল কুর'আন, ৯৬:০১

৩৬৯. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ, *সুনান ইবনে মাজাহ* (বৈরুত: লেবানন, দারু ইহইয়াতুত তুরাছ আল আরাবী, ১৯৭৫) হাদীস নং- ২২৪

৩৭০. আবু দাউদ সিজাস্তানি, *সুনানু আবু দাউদ* (বৈরুত: লেবানন, দারু ইহইয়াতুত তুরাছ আল আরাবী, ১৯৭৫), হাদীস নং- ৪১৬৬

০২. প্রবৃত্তির দাস: মানব প্রকৃতিই এমন যে আমরা প্রায়ই প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়ি। ইবলিস আমাদের সামনে, পেছনে, ডানে, বামে থেকে আক্রমণ করে, একে প্রলুব্ধ করে, অনৈতিক কাজের প্রতি আকর্ষণ জাগায়। মূলত নাফসের আধিপত্য ও বিবেকের পরাজয় থেকেই জন্ম হয় অনৈতিক কর্মকান্ডের। ব্যক্তি পর্যায় থেকে নৈতিকতার এ অনুভূতি উঠে যেতে যেতে কলুষিত হয় গোটা পরিবার। এভাবে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক অবক্ষয়। নাফসের প্ররোচনায় মানুষ অনৈতিকতার পথ বেছে নেয়। তাই এ পথ থেকে তাকে প্রতিরক্ষা দিতে হলে প্রয়োজন কলবের বিশুদ্ধতা তথা পরিশুদ্ধ অন্তর। পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে সমাজের দিকে তাকালেই কেবল অনৈতিকতা ও পাপাচার থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ •

অর্থ: তোমরা ঐসব লোকদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ্‌ও তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই ফাসিক।[৩৭১]

০৩. অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসার: একজন ব্যক্তি যখন কোনো গুনাহর মধ্যে জড়িয়ে যায়, তখন সে গুনাহ আস্তে আস্তে গোটা সমাজেই প্রভাব বিস্তার করে। এর পরিণতি কলুষিত করে চারপাশকে। আমাদের চারপাশে অশ্লীলতার প্রসারের চলছে মহাযজ্ঞ। নারীদের পোশাকের স্বল্পতা, অশ্লীল বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপনের নারীর অযাচিত ব্যবহার, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, মাদকের প্রসার, ইন্টারনেট সন্ত্রাস ইত্যাদি নানাভাবে বিকৃত হচ্ছে গোটা সমাজকাঠামো। দূষিত হচ্ছে স্বাভাবিক কর্মধারা। মহান আল্লাহ কুর'আনে বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ •

অর্থ: যারা মুমিনদের মাঝে ফাহেশার প্রচার প্রসার পছন্দ করে, তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া এবং আখিরাতে। আল্লাহ্‌ জানেন, তোমরা জানো না।[৩৭২]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ •

অর্থ: বলো: 'আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন গোপন ও প্রকাশ্য ফাহেশা (অশ্লীল) কাজ, পাপকাজ, না হক বিদ্রোহ, তোমাদের আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা যার সপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি, এবং না জেনে বুঝে তোমাদের আল্লাহ্‌র সম্পর্কে কথা বলা।[৩৭৩]

০৪. অধিক ধন-সম্পদ: অধিক ধন সম্পদ মানুষকে বিলাসিতা ও অপব্যয়ের পথ দেখায়। শরীর - মনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে মানুষ অনৈতিকতার পথে পা বাড়ায়। একজন গরীবের কাছে যেটা অকল্পনীয়, ধনীর কাছে সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ইসলাম তাই অধিক ধন-সম্পদ গড়ে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত হওয়াকে অনুৎসাহিত করেছে। যাদের সম্পদ রয়েছে, ইসলাম তাদেরকে জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্পদশালীদেরকে অধিক পরিমাণে দান ও সম্পদের বিনিয়োগের পরামর্শ দেয়। দুনিয়ার প্রাচুর্য যে ক্ষণস্থায়ী সেটা মনে করিয়ে দেয় আল কুর'আন।

---

৩৭১. আল কুর'আন: ৫৯:১৯

৩৭২. আল কুর'আন, ২৪:১৯

৩৭৩. আল কুর'আন, ৭: ৩৩

اِعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ •

অর্থ: জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবনটা হলো খেল তামাশা, চাকচিক্য, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধনমাল ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপাদিত শস্য কৃষকদের উৎফুল্ল করে। তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি দেখতে পাও তা হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে, অবশেষে তা পরিণত হয় খড়কুটায়। আর আখিরাতে রয়েছে কঠোর আযাব, মাগফিরাত (ক্ষমা) এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবনটা প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।[৩৭৪]

০৫. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন: একটি জাতির প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির বাইরে এমন কিছু রসম রেওয়াজ ধার করা যা জাতীয় সংস্কৃতির সংগে বেমানান ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, তারই নাম সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।[৩৭৫]

একটি দেশের ও জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য বেয়ে গড়ে উঠে তার সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির বহমান ধারা পেরিয়ে শৃংখলামুক্ত হওয়ার ফলাফল হলো অপসংস্কৃতি। বর্তমান যুগে এ অপসংস্কৃতির চর্চায় ডুবে পরিবার ও সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বেড়ে চলছে।

ইসলামে নৈতিকতার চর্চা

ইসলাম মহান আল্লাহর দেওয়া এক পরিপূর্ণ ও প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল পর্যায়ে নৈতিকতার বিধানকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে ইসলাম। আল কুর'আনে বলা হয়েছে:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى •

অর্থ: নিশ্চয়ই সাফল্য অর্জন করবে ঐ ব্যক্তি, যে তাযকিয়া করবে।[৩৭৬]

নৈতিকতাই মানুষের জীবনের সবদিক ও বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামী রীতিনীতির যথাযথ মূল্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শন থেকেই আসে নীতিবোধ ও আদর্শিক গুণাবলী। নৈতিকতার জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতেই ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলেন,

رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ •

অর্থ: আমাদের প্রভু! এদের (আমাদের বংশধরদের) কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়ো, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে (তোমার)

---

৩৭৪. আল কুর'আন, ৫৭:২০

৩৭৫. মো: মাহমুদুল আলম, *বর্তমান প্রেক্ষাপটে নৈতিক অবক্ষয় ও এর প্রতিকারের উপায়সমূহ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মাসিক পৃথিবী, মে ২০১৫), পৃ. ৫৪

৩৭৬. আল কুর'আন, ৮৭:১৪

কিতাব এবং হিকমা শিক্ষা দেবেন আর তাদেরকে তাযকিয়া করবেন। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞানী।[৩৭৭]

বর্তমান বিশ্বে যতো প্রকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, যৌনবাদী, বস্তুবাদী-ভোগবাদী মতবাদ আছে, সেগুলোর কোনটিই নিখুঁত, নির্ভুল, অনাবিল তিনটি উপাদান দিতে পারছে না। একমাত্র ইসলামেরই রয়েছে এ তিনটি নিখুঁত উপাদান। অর্থাৎ-

ক. এ পৃথিবী সহ মহাবিশ্ব এবং মানুষের মহান স্রষ্টা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও অবিচল আস্থা।
খ. আল্লাহরর কিতাব আল কুর'আন এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহয় বিবৃত ও বর্ণিত নিখুঁত নীতিমালা।
গ. আল্লাহর রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাথী ও অনুসারীদের সুখী পরিবার সমূহের ঐতিহাসিক উপমা।[৩৭৮]

ইসলামে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত। ইসলাম নৈতিকতার অনুশীলন ও চর্চাকে করেছে অবারিত। মানুষের জীবনে সততা, মহানুভবতা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, সভ্যতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, চরিত্র ও আদর্শিক গুণাবলীর সংমিশ্রিত ফসল হলো নৈতিকতা। মানুষের বিবেক ও মূল্যবোধের জাগরণই হলো নৈতিকতা। পবিত্র কুর'আনে এসেছে,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا • وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا •

অর্থ: নিঃসন্দেহে সফল হলো সে, যে তাযকিয়া (পরিশুদ্ধ, উন্নত ও বিকশিত) করলো নিজেকে। নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হলো সে, যে দুষিত ও কলুষিত করে ধসিয়ে দিলো নিজেকে।[৩৭৯]

ইসলামে পবিত্র ও নির্মল জীবন গঠন করার জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকার মন্দ কাজ পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا •

অর্থ: তোমরা যদি কবিরা গুনাহ্সমূহ পরিহার করে চলো, যেগুলো করতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের ছোট খাটো সব গুনাহ্খাতা মুছে (expiate) দেবো এবং তোমাদের দাখিল করবো অতীব সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় (জান্নাতে)।[৩৮০]

ইসলামী শরীয়তে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা সমগ্র মানব সমাজের নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর নির্দেশনা বিদ্যমান। মূলত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নৈতিকতার আলোকেই হয়ে থাকে। পবিত্র কুর'আনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে,

وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ •

অর্থ: আমরা জাহান্নামের জন্যেই তৈরি করেছি জিন ও ইনসানের অনেককে। তাদের অন্তর আছে, তবে তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, তবে তা দিয়ে তারা দেখে

৩৭৭. আল কুর'আন, ২:১২৯
৩৭৮. আবদুস শহীদ নাসিম, *কুর'আন ও পরিবার* (ঢাকা: বর্ণালি বুক সেন্টার, ২০০৬) পৃ. ১১
৩৭৯. আল কুর'আন, ৯১:৯-১০
৩৮০. আল কুর'আন, ৪:৩১

না। তাদের কান আছে, তবে তা দিয়ে তারা শুনে না। এরা হলো পশুর মতো, বরং তারা আরো অধিক বিভ্রান্ত এবং তারা অচেতন।[৩৮১]

বস্তুত নৈতিকতাই মানুষের সবচেয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব। ইসলাম হচ্ছে নৈতিকতার সঠিক মানদণ্ড নির্ধারক। কারণ ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা দেখিয়ে দেয়, যা অহীর নির্দেশনার আলোকে মানবতার সামনে নৈতিকতার এক মহান উপমা স্থাপন করেছে।

নৈতিকতার চর্চা ও প্রসার ঘটলে পরিবার ও সমাজের অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব। শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতার সমন্বয় আনা উচিত। মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে নৈতিকতার বিকল্প নেই। নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে একজন সৎ, দেশপ্রেমিক, চরিত্রবান, আল্লাহভীরু ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারে। আর তখনই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে শাশ্বত শান্তি ফিরে আসতে পারে।

৩৮১. আল কুর'আন, ৭:১৭৯

৪র্থ পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা: পারিবারিক ও সামাজিক অস্থিরতার অন্যতম কারণ

রাজনীতি সমাজের বসবাসকারী মানুষদের জীবনযাত্রার সাথে ওতোপ্রতোভাবে মিশে থাকে। মানুষ, সমাজ ও রাজনীতি অবিচ্ছিন্ন। রাজনীতি জীবন ঘনিষ্ঠ, অস্তিত্ব সংলগ্ন একটি বিষয়। একটি নরগোষ্ঠীর জীবন উপভোগের যাবতীয় পদ্ধতি ও আয়োজন এবং উপকরণ ও তার ধরন নিয়েই এ সমাজ গঠিত। নৃতাত্ত্বিক উৎস, ভাষা এবং ভৌগলিক অবস্থান তার পরিচয় নির্ধারণ করে জাতি বা দেশ হিসেবে। তত্ত্বগতভাবে সমাজের অগ্রযাত্রার লক্ষ্যে জীবন ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করার পদ্ধতিই হচ্ছে রাজনীতি। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।[৩৮২]

সমাজের সর্বত্র চরম অস্থিরতা বিরাজমান। ব্যক্তি, পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনগুলোতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তবর্গের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। সমাজে কেউ ন্যায্য অধিকার চাচ্ছে, আবার কেউ সকল ক্ষমতা নিজ করায়ত্ত রাখার অবৈধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। রাজনৈতিক নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের গণতান্ত্রিক সমন্বয়তার অভাব এবং সিদ্ধান্ত মান্যতার ক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতা এর জন্য প্রধানত দায়ী।

দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে দুর্নীর্তি। দুর্নীতির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে সততাও। সৎভাবে কোথাও কিছু করার সুযোগ নেই। কিছু সংখ্যক মানুষ যারা অনৈতিকতা থেকে বাঁচতে চাচ্ছে সমাজ তাদেরও বাঁচতে দিচ্ছে না। দুর্নীতির কাছে সবাই যেন আত্মসমর্পণ করতে এক প্রকার বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ফরমান এবং কঠোরতার মাধ্যমে দুর্নীতির লাগাম টানার ব্যবস্থা করা না হলে সমাজের শৃংখলার ধ্বংস অনিবার্য।[৩৮৩] শাসকগোষ্ঠীর দূর্বলতার সুযোগ এবং বিরোধী পক্ষের সাথে শাসকগোষ্ঠীর টানাপোড়ন সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে সমাজকে অস্থির করে তুলছে। সমাজের সকল মানুষকে জিম্মি করে সন্ত্রাসীরা বীরবেশে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।[৩৮৪]

সামাজিক পরিস্থিতি অস্থির ও উত্তপ্ত হয়ে উঠার পেছনে রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের আচরণ ও কথাবার্তার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। রাজনীতিবিদরা দেশকে যেমন চালাতে এবং গড়তে চান, দেশের সমাজ ব্যবস্থা তেমনিভাবেই চলে এবং গড়ে উঠে। বর্তমানকালে প্রায় সব দেশের সমাজ গঠনে এবং মানুষের সামাজিক আচরণে রাজনীতিবিদদের আচরণ এবং ভাবাদর্শের প্রভাব অপরিসীম। বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, রাজনীতিবিদদের মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে ক্ষমতায় যাওয়া, সেটা যেভাবেই হোক। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই মুক্তবাজারভিত্তিক আদর্শে সমাজ বিনির্মাণে তৎপর। এজন্য তাদেরকে ব্যাপক দূর্ণীতির আশ্রয় নিতে হয়। দেশের মানুষও নৈতিকতাহীন ও দূর্ণীতিগ্রস্ত কাজ করতে বাধ্য হয়। ফলে দূর্ণীতি ও নৈতিকতাহীনতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। এটা রোধ করতে দেশের ধর্মশিক্ষা ও প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যারা দিয়ে থাকেন তারা অপারগ হয়ে পড়ছেন। অধিকন্তু এ জাতীয় শিক্ষা যারা দেন তারাও বিভিন্ন সাংঘর্ষিক দল মত দ্বারা প্রভাবিত থাকে। এ থেকে দেখা যায় দলীয় পক্ষপাতিত্ব যা এক প্রকারের দূর্ণীতিরই নামান্তর। ফলে বাধে দলীয় স্বার্থের সংঘাত এবং জন্ম নেয় পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। এ থেকে

---

৩৮২. গোলাম হোসেন, *বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি* (ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃ. ১

৩৮৩. রাজু আহমদ, *সামাজিক অস্থিরতার মূলে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা* (দৈনিক সংগ্রাম, মুক্তমঞ্চ, ৮ নভেম্বর ২০১৪), পৃ. ১

৩৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

উদ্ভূত হচ্ছে প্রতিহিংসার রাজনীতি। হিংসাত্মক প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের মধ্যেও। তারাও দেশেরই মানুষ এবং তারা উঠে এসেছেন শ্রেণীবিভক্ত দেশীয় সমাজেরই বিভিন্ন স্তর থেকে। এতে করে তাদের দূষিত আচার আচরণ ও মনোভাব সমাজের অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে সার্বিক সমাজকে কলুষিত করে তুলছে। ফলে সমাজে হিংসা-প্রতিহিংসা এবং এ থেকে সৃষ্ট প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছে সর্বব্যাপী। ক্ষমা ও সহনশীলতাহীন সমাজে অরাজকতার বিস্তার ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এ অস্থির ও অসহিষ্ণু সামাজিক পরিস্থিতি রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার কারণেই ঘটে থাকে। প্রতিশোধ গ্রহণ ও একে অন্যকে দমিয়ে রাখার প্রবণতা সমাজের সুস্থিতির পথে অন্তরায়।

রাজনৈতিক নেতাদের আধিপত্য বিস্তার, ফায়দা হাসিল, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বলি হতে হয় সাধারণ মানুষকে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দেয়া তথ্য মতে, বাংলাদেশে ২০১৬ সালের প্রথম দশ মাসে ৮৭০টি রাজনৈতিক সহিংসতা হয়েছে। রাজনৈতিক এসব সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৭৭ জন। তাদের মধ্যে ৮৪ জনের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কিংবা ক্ষমতা ভাগাভাগির সংশ্লিষ্টতা নেই।[৩৮৫]

ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্টের "শাসন পরিস্থিতি, বাংলাদেশ ২০১৩: গবেষণা, দল, রাজনীতি" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্যে তুলে ধরা হয়েছে, রাজনৈতিক সহিংসতায় ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২১তম। এ অবস্থানের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়ী করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ২ হাজার ৭২৩ টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবছর সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৯ দশমিক ৭১ শতাংশ। এতে নিহত হয়েছেন ৫১৯ জন।[৩৮৬]

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতা কেড়ে নেয় মানুষের স্বাভাবিক জীবনের গতি। বিরুপ প্রভাব পড়ে সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের উপর। ভুলণ্ঠিত হয় সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি। সমাজ জীবনে দেখা দেয় নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক সহিংসতা তীব্রতর হয়েছিলো। একবিংশ শতাব্দীতে তা দ্বিগুণ হয়ে প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। ইসরাঈল-ফিলিস্তিন সংঘর্ষ মাঝে মধ্যেই পৃথিবীকে অশান্ত করে তুলছে। ইরাকের মানুষ সহিংসতায় ক্রমেই বিহবল, মৃত্যু উপত্যকায় তাদের বসতি। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হরণ করা হয় মানুষের মৌলিক অধিকার। আফ্রিকার অনেক দেশেই রাজনৈতিক সহিংসতা নিত্যদিনের ঘটনা। পৃথিবীতে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ৩ লাখ ৭৮ হাজার মানুষের মৃত্যু দেখতে হয়েছে কেবল যুদ্ধজনিত রাজনৈতিক সহিংসতায়।[৩৮৭]

সমাজের সকল স্তরেই মানুষ আজ অনিরাপদ। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, জাতিকে ধর্মহীন করার প্রচেষ্টা, অপসংস্কৃতির অনুকরণ, অযোগ্যদের দায়িত্বশীল করে মর্যাদার আসনে বসানো, দলীয় স্বার্থের কারণে জাতীয় স্বার্থ অবজ্ঞা করা এবং শাসক ও প্রজাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি সহ বিভিন্ন কারণে সামাজিক অস্থিরতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।

---

৩৮৫. সাজ্জাদ মাহমুদ খান, *রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বলি সাধারণ মানুষ* (আলোকিত বাংলাদেশ, ২১ নভেম্বর ২০১৬) পৃ. ১, www.alokitobangladesh.com

৩৮৬. ব্রাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রতিবেদন, *রাজনৈতিক সহিংসতায় ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশ* (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২১ ডিসেম্বর ২০১৪) পৃ. ১, https://www.bd-pratidin.com > 51233

৩৮৭. মিল্টন বিশ্বাস, *রাজনৈতিক সহিংসতা ও আমাদের অসহায়ত্ব* (কালের কণ্ঠ, ১২ নভেম্বর ২০১৩) পৃ. ২, http://www.kalerkantha.com >2013

সমাজে যদি সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে ব্যক্তিগতভাবে সমাজ সংশোধন করা দুরূহ ব্যাপার। একজন নেতা ঠিক হলে তার অধীনস্থ সব কর্মী ঠিক হতে বাধ্য। অপরদিকে একজন কর্মী সৎ হলে সে অন্য কর্মীকে সঠিক পথে আনা বা তার অসৎ নেতার উপর প্রভাব বিস্তার করা তেমন সহজ নয়। সমাজের পতন নেতৃত্ব থেকেই শুরু হয়। যে সমাজের নেতৃত্ব কলুষিত সে সমাজ ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকেই ধাবিত হয়। সামাজিক সমস্যা দূর করতে রাষ্ট্রের সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই।

৫ম অধ্যায়

আল কুর'আনে বর্ণিত পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো অনুসরণের সুফল

আল কুর'আনের বিধানগুলো মানবতার সাথে সম্পর্কিত। মানুষের কল্যাণের জন্যই এ সকল বিধান। আল কুর'আন মানুষকে ইতিহাসের গতিধারায় এবং মানবসমাজ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দায়িত্বশীল করেছে। আল কুর'আনে এমন কিছু বিধান আছে যা মুসলিম অমুসলিম সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গোটা মানবজাতির অভিন্ন স্বার্থ রক্ষা এবং কল্যাণার্থে এ সকল কুর'আনি বিধান প্রযোজ্য। পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করার মাধ্যমেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা ঘটে। স্ত্রী, স্বামী, মা, বাবা, সন্তান সকলেই পারিবারিক জীবনের সদস্য। সকলের সাথে সুসম্পর্ক ও অধিকার নিশ্চিত করার ওপরই পারিবারিক জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী যারা এ জীবনের সকল বিভাগ পরিচালনা করতে পারেন তাদের জন্য রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। আল কুর'আনে রয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বহুবিধ সমস্যার সমাধান এবং সঠিক পথের দিক নির্দেশনা। ইসলামই প্রথম স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। এসব মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার নামে পরিচিত। ইসলামে মনাবাধিকার বলতে সেসব অধিকারকে বোঝানো হয়, যেগুলো স্বয়ং মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাকে প্রদান করেছেন। পৃথিবীর কেউ তা রহিত করার অধিকার রাখে না। এ অধিকার কখনো রহিত হওয়ার নয়। ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা কেবল ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা প্রতিটি মুসলিমের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে।

আল কুর'আনের বিধান অনুসরণে জীবনের দৈনন্দিন আচার আচরণে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। ইসলামের গভীরতা ও ব্যাপকতা জীবনের সকল দিককে প্রভাবিত করার সামর্থের কারণে ইসলাম মদিনার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলো। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবরা সামাজিক আচার-আচরণ ও আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সুশৃংখল ছিলো না। কুর'আনের বিধান তাদের সুশৃংখল করে। এ বিধি বিধান তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল বিষয়ে পরিব্যাপ্ত হয়। কুর'আন তাদের মনে এক সুগভীর ঈমানী চেতনার সঞ্চার করে যা তাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বের সকল অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যের অপনোদন ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাদের ব্যক্তিত্ব ঢেলে সাজায়। তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের সকল পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকান্ড আল্লাহর পথে পরিচালিত হয়। ফলে মদিনার সমাজে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত গভীর সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন পরিলক্ষিত হয়। সেখানে ইসলামী সমাজ সর্বোত্তমভাবে বিকশিত হয়ে নিরংকুশ পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিলো।

বর্তমান এ ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে কুর'আনের সৌন্দর্যে রূপায়িত করার জন্য আল কুর'আনে বর্ণিত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিধি বিধানগুলোর অনুসরণ খুব প্রয়োজন।

১ম পরিচ্ছেদ

সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় কুর'আন বর্ণিত পরিবার

পরিবার একটি সুন্দর সমাজ গঠনের ভিত্তি তৈরি করে। কুর'আনি সমাজ গঠনে পরিবারে ইসলামী আদর্শের বীজ বপন, তার চর্চা আবশ্যক। যেহেতু সমাজে শৃংখলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের উদ্দেশ্য, তাই মানুষে মানুষে সহ অবস্থানের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে ইসলাম। কেউ যখন তার কাজের ক্ষেত্র ছেড়ে দেয় তখন যে শূণ্যতা তৈরি হয় এ সমাজ কখনও তা পূরণ করতে পারে না। আর তা থেকেই শুরু হয় সামাজিক বিশৃংখলা। একটি ইসলামী সমাজ গঠনের প্রধান উপাদান একজন কারিগর। তার সাথে কিছু জনসমষ্টি এবং এ সমাজ পরিচালনার জন্য কিছু মৌলিক নীতিমালা। একটি ইসলামী পরিবার জন্ম দিতে পারে একজন কারিগর, যিনি এ সমাজ বিনির্মাণ করতে পারেন ইসলামী আদর্শে। ইসলামী পরিবার জন্ম দিতে পারে হাজার জনসমষ্টির যারা পরিবারের মতোই শান্তিপূর্ণ দেখতে চায় তার আশেপাশের পরিবেশকে, সমাজকে। ঘুনে ধরা সমাজের ভাঙ্গন রোধে একটি পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কুর'আনের আলোকে পরিবারগুলো গড়ে উঠলেই সমাজও হবে সুন্দর ও নিরাপদ।

সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় পরিবারগুলো যেসব ভূমিকা রাখতে পারে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

০১. আল্লাহর একত্ব ও একচ্ছত্র কতৃত্বের বাস্তবায়ন হলো পরিবার

আল্লাহমুখী হতে হবে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে। যেহেতু পরিবার শিশুর প্রথম পাঠশালা তাই এখানে তাকে আল্লাহর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের শিক্ষা দিতে হবে। শিশুকাল থেকেই শিশুর মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতে হবে। একজন আল্লাহভীরু ও আল্লাহমুখী ব্যক্তি একটি সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট নেয়ামত। মহান আল্লাহ কুর'আনে বলেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ •

অর্থ: তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন: তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব, উপাসনা ও প্রার্থনা) করো না।[৩৮৮]

আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থায় আকীদার দিক দিয়ে প্রথম ভিত্তি তাওহীদ- আল্লাহর একত্ব এবং সমাজ জীবনের প্রথম ইউনিট হচ্ছে পরিবার। ইসলামের মূল লক্ষ্য এক আল্লাহর প্রভুত্ব এবং তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বাস্তবায়িত হওয়া। আর এ জন্য পরিবার গঠন ও পারিবারিক জীবন যাপন করলে এক আল্লাহর বন্দেগী কবুল করা ও সে অনুযায়ী বাস্তব জীবনধারা পরিচালিত করা সম্ভব। আল্লাহর আইন অনুযায়ী আমাদের প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনা করা আল্লাহর ইবাদতের শামিল। আল্লাহকে ভালোবেসে হারাম কাজ থেকে মুক্ত থাকা, বিপদে পড়লে আল্লাহর ওপর ভরসা করা, ভালোবাসা, ভয় আশা সব অনুভূতি আল্লাহর জন্যই হতে হবে। সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করাও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে 'তাওহীদ' প্রতিষ্ঠা হলেই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এর প্রতিফলন ঘটবে। সর্বত্রই থাকবে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব।

---

৩৮৮. আল কুর'আন, ১৭:২০

০২. পরকালমুখী পরিবার

পরিবারকে পরকালমুখী হওয়া জরুরী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ •

অর্থ: আমার প্রভু! আমাকে তৌফিক দাও, আমি যেনো তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যে অনুগ্রহ তুমি করেছো আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি। আমাকে এমন আমলে সালেহ্ করার তৌফিক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে, আর আমার জন্যে আমার সন্তানদের সৎ ও যোগ্য করে গড়ে তোলো। আমি তোমার দিকে মুখ ফেরালাম এবং অবশ্যি আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।[৩৮৯]

আল্লাহ তা'য়ালার একত্ব ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের বাস্তবায়ন হলো পরিবার। তাই সর্বপ্রথম আল্লাহমুখি হতে হবে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে। এছাড়া পরিবারই যেহেতু শিশুর প্রথম পাঠশালা, তাই এখানে আল্লাহর ক্ষমতা, সার্বভৌমত্বের শিক্ষা দিতে হবে তাকে। তার মনে আল্লাহর ভয় তৈরি করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেন সে সর্বদা তৎপর থাকে তা নবী-রাসূল ও সাহাবিদের জীবনের গল্প শুনিয়ে তার মনে উন্নত জীবনের একটা মডেল দাঁড় করাতে হবে। বস্তুত একজন মুসলিম পরিবার থেকে তার জীবনাচরণ শিক্ষা লাভ করে। সে জানে প্রভুর ডাকে সুবহে সাদিকে ফজরের আজান শুনে তাকে উঠতে হবে। দিনে পাঁচবার তাকে এ ডাকে সাড়া দিতে হবে। সে জানে সকালে ও রাতে কুর'আনকে তার সঙ্গী বানাতে হবে। প্রতিটি কাজের আগে আল্লাহর নাম নিতে হবে ও তার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তার সব কাজের সূচনা হবে সালাম দিয়ে, তার রুচি, পছন্দ, বিনোদন এবং জীবনাচরণ একজন কাফের বা মুশরিকের রুচি, পছন্দ, বিনোদন এবং জীবনাচরণ থেকে পার্থক্য হবে। যা দেখে তাকে হাজার লোকের ভীড়ে আলাদা করে নেওয়া যাবে।

এমন আদর্শ ও সংস্কৃতিতে গড়া একজন পূর্ণাঙ্গ পরিপূর্ণ মানুষ শুধু সমাজের জন্য নেয়ামত নয় বরং সমাজ গড়ার কারিগর।

এমন গুণসম্পন্ন মানুষ জীবনের লাভ-ক্ষতির হিসাব, কিংবা মর্যাদার মাপকাঠি তারা দুনিয়ার মূল্যমান ধরে করবে না বরং পরকালের জন্য লাভজনক কাজগুলোকেই তারা অগ্রাধিকার দেবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ •

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো জাহান্নাম থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর (ভাস্কর্য, মূর্তি), তার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রয়েছে এমন সব ফেরেশতা, যারা শক্ত হৃদয় আর কঠোর স্বভাবের। তারা অমান্য করেনা তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়। যা নির্দেশ দেয়া হয় তারা তাই করে।[৩৯০]

---

৩৮৯. আল কুর'আন, ৪৬:১৫

৩৯০. আল কুর'আন, ৬৬:৬

ইসলাম মনে করে, আদর্শ পরিবার হবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার। এখানে এক সম্পর্ক অন্য সম্পর্কের প্রতিবন্ধক নয় কখনোই। জ্ঞানের স্বল্পতা কিংবা নিজ স্বার্থের প্রতি অতিরিক্ত লোভ কিংবা হেকমতের অভাব তাকে একটি হকের ব্যাপারে অধিক সচেতন কিংবা অন্য হকের ব্যাপারে উদাসীন করে তোলে।

আল্লাহ তা'য়ালার পরেই পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন করার তাকিদ রয়েছে কুর'আনে ও হাদিসে। পিতা-মাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ, বিশেষত মায়ের পদতলে জান্নাতের ঘোষণা- এটাই প্রমাণ করে যে, একজন সন্তান কোনো অবস্থাতেই বাবা-মাকে কষ্ট দিতে পারে না। সূরা বনি ইসরাইলে 'উহ' পর্যন্ত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সে অবস্থায় অন্য কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া বা বিরক্তি প্রকাশের তো সুযোগই নেই। ঠিক একইভাবে পিতা-মাতাকেও সন্তানের হকগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে হবে।

আদর্শ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকবে মধুর। কুর'আন কারিমে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা একে অন্যের পোশাকস্বরূপ।' ঠিক যেমন পোশাক দেহের অসামঞ্জস্যতাকে ঢেকে রাখে তেমনি স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের দোষ অন্যদের কাছ থেকে গোপন রাখাই কর্তব্য। কুর'আন যেমন স্বামীর কর্তব্য হিসেবে স্ত্রীর খাওয়া ও পরার ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করার তাকিদ দিয়েছে তেমনি স্ত্রীর জন্যও নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত, সন্তানের দেখাশোনা, সম্পদের আমানত রক্ষার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।[৩৯১]

০৩. পরিবারটি হবে ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র

বিয়ের মাধ্যমে পরিবার হয়। পরিবার হয়ে উঠে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকেই বের হয়ে আসে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য, যা এক সময় সংস্কৃতিতে রূপ নেয়। একজন মুসলিম পরিবার থেকে তার জীবনাচরণ শিক্ষা লাভ করে। আল্লাহর নামে কাজ শুরু করা, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, কুর'আনকে সঙ্গী করা প্রতিটি মুসলিম পরিবারের সদস্যদের 'মুসলিম' পরিচয় বহন করে। একটি মুসলিম পরিবারের সদস্যদের রুচি, পছন্দ, এবং জীবনাচরণ একজন কাফের বা মুশরিকের থেকে সুস্পষ্ট পার্থক্য সম্বলিত হবে। এমন সংস্কৃতিতে গড়া একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ শুধু সমাজের জন্য নেয়ামত নয় বরং সমাজ গড়ার কারিগর। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। পারিবারিক জীবন থেকেই গড়ে উঠে ইসলামী পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা। মানুষকে সামাজিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিবারই তাকে দিক নির্দেশনা দেয়।

মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে করে তোলে সুন্দর, সুচারু, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত। আর এ সংস্কৃতি যদি হয় সুস্থ ও সবল ধারার, তবে তার জীবনটা হবে সফল। সুস্থ ধারার সংস্কৃতির উৎস হলো ইসলাম। আর এর মূলে রয়েছে কুর'আন ও সুন্নাহ। ইসলামী সংস্কৃতি ছাড়া অন্য কোনো সংস্কৃতি সুস্থ ধারার সংস্কৃতি নয়। ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে একটি মানবতাবাদী সংস্কৃতি। অন্যদিকে আধুনিক সংস্কৃতির মূলে রয়েছে ধর্মহীনতা, বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনা, এতে নেই কোনো মানবিকতা, নৈতিকতা ও শালীনতা।[৩৯২]

'সংস্কৃতি' শব্দটি মূলত সংস্কৃত ভাষার শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'কালচার' যার অর্থ কর্ষণ করা। আর আরবী প্রতিশব্দ হলো 'আস সাকাফাহ।' সাকাফাহ শব্দের অর্থ উপলব্ধি করা,

---

৩৯১. মাহমুদা নওরিন, *আদর্শ সমাজ গঠনে প্রথম সোপান পরিবার* (বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম), লিংক: https://m.banglanews24.com/islam/news/bd/592404.details

৩৯২. এইচ এম মাহবুবুর রহমান, *ইসলামী সংস্কৃতি ও আধুনিক সংস্কৃতি: একটি পর্যালোচনা* (ইসলামী বার্তা, ২৮ অক্টোবর, ২০১৭) লিংক: https://www.facebook.com/notes

জানা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া। পরিশীলিত, প্রশিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুসাক্কাফ' বা সংস্কৃতিবান। আর সংস্কৃতি শব্দটি গঠিত হয়েছে 'সংস্কার' শব্দ থেকে । যার অর্থ শুদ্ধি, পরিমার্জন, মেরামত, ভূল সংশোধন। সুতরাং সংস্কৃতি অর্থ হলো সংস্করণ, বিশুদ্ধকরণ, অনুশীলনলব্ধ দেহ, ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন।[৩৯৩]

০৪. ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কোনো সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যাবে না। ইসলামী সংস্কৃতি কোনো ভাবেই কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত সংস্কৃতি গ্রহণ করে না। ইসলামী সংস্কৃতি কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত উৎসব ব্যতিত অন্য কোনো উৎসব গ্রহণ করে না। যেমন মুসলমানদের উৎসব মাত্র দু'টি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। ইসলামী সংস্কৃতি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এক থাকে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না।[৩৯৪]

০৫. ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামী সংস্কৃতি মহান আল্লাহর তাওহীদ ভিত্তিক সংস্কৃতি অর্থাৎ যে সংস্কৃতিতে আল্লাহর সাথে শিরকের কোনো ছোঁয়া থাকবে না। ইসলামী সংস্কৃতির মূলনীতি ও মূল্যবোধ বিশুদ্ধ, যথার্থ, মহান ও সার্বজনীন। অর্থাৎ এটি এমন এক সংস্কৃতি যার মূলনীতি এতই বিশুদ্ধ যাতে সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। আর এটি এমন একটি সার্বজনীন সংস্কৃতি যা কোনো দেশ, জাতি, ভাষা, বর্ণে সীমাবদ্ধ নয়।

এ সংস্কৃতি সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং বিবেক ও জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইসলামী সংস্কৃতি একটি মানবতাবাদী সংস্কৃতি। এতে রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা। মহান আল্লাহর বাণী:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ •

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং অবগত।[৩৯৫]

ইসলামী সংস্কৃতি একজন মুসলমানকে আনুগত্যশীল করে তোলে। সে আরো বেশি রাসূল (সা.) এর সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করতে তৎপর হয়। এটি এমন এক সংস্কৃতি যাতে রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। হাদীসে বর্ণিত আছে,

'হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের (জিহবার) এবং দুই রানের মধ্যবর্তী স্থানের (লজ্জাস্থানের) জিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো।'[৩৯৬]

ইসলামী সংস্কৃতি মহান আল্লাহর তাওহীদভিত্তিক। ঈমান বা আল্লাহ তা'য়ালার একত্মবাদে বিশ্বাস ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণ। ইসলামের সব বিধি-বিধান, অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি মহান আল্লাহর তাওহিদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন ভ্রাতৃত্বের ধারণা মহান আল্লাহর

---

৩৯৩. ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, *ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য*, (আলোকিত বাংলাদেশ, ১লা জুন, ২০১৯) ই-পেপার, পৃ. ১ www.alokitobangladesh.com

৩৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৩৯৫. আল কুর'আন, ৪৯:১৩

৩৯৬. ইমাম বুখারী (রহ.), *সহীহ আল-বুখারী* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮২), খ. ১, হাদীস নং-২১০৯

একত্ববাদের ধারণা থেকেই উৎসারিত। মহান আল্লাহ এক এবং একক। তাঁরই বান্দা সবাই। কেউ কারও চেয়ে উত্তম বা অধম নয়। মানুষ মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ইসলামী সংস্কৃতি সর্বজনীন। ইসলামী সংস্কৃতি কোনো দেশ-কাল-পাত্র, জাতি ও ভাষায় সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র মানবজাতিকে মহান আল্লাহ সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। এতে ভাষা বা জাতিভেদ নেই, নেই কোনো স্থান-কালের সীমাবদ্ধতা। ইসলামী সংস্কৃতির এ সর্বজনীন আলোয় সমগ্র বিশ্ব মানব অবগাহন করতে পারে। ইসলামী সংস্কৃতি মানবতাবাদী। ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষক। এতে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এ সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সংস্কৃতি কল্যাণমুখী। শুধু মানুষ নয় বরং সব সৃষ্টির প্রতি দয়াশীল ও কল্যাণকামী হওয়া এ সংস্কৃতির শিক্ষা। মহানবী (সা.) বলেন, 'পারস্পরিক কল্যাণকামিতা ও সদিচ্ছাই দ্বীন।' তিনি আরও বলেন, 'সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবারতুল্য। অতএব, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, যে তার পরিবারের প্রতি বেশি সদয়।' ইসলামী সংস্কৃতি নৈতিকতাসমৃদ্ধ। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষকে মৌলিক ও সুন্দর নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। এতে চলাফেরা, আচার-আচরণ, লেনদেন তথা সার্বিক জীবনাচরণে সত্য ও সুন্দর মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা হয়েছে। সৎ গুণাবলির অনুশীলন ও অসৎ কার্যাবলির বর্জন ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সংস্কৃতি ধর্ম-কর্মের সমন্বয়ক। ইসলামী সংস্কৃতিতে ইহকাল ও পরকাল একই সুতায় গাঁথা। দুনিয়ার জীবন ত্যাগ করে নয়, বরং দুনিয়া-আখেরাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলার কথা বলা হয়েছে ইসলামে। সালাত শেষ হলে যমিনে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে পবিত্র কুর'আনে। মহান আল্লাহ বিশ্ব মানবকে তাঁর কাছে যে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো,

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ •

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।[৩৯৭]

এখানে ইহকাল এবং পরকালকে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই ধর্ম ও কর্মের যে অসাধারণ সমন্বয় ইসলামী সংস্কৃতিতে দৃশ্যমান, তা অন্য কোনো ধর্মমতে পরিলক্ষিত হয় না। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনাচরণের পথনির্দেশ প্রদান করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমনকি, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সাফল্যের নির্দেশনাও প্রদান করে। আবার সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল তথা মানুষের সার্বক্ষণিক জীবনের সব কাজেরও বিধান ইসলাম বর্ণনা করেছে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষদ্রতর কাজও এ বর্ণনা থেকে বাদ পড়েনি। ইসলামী সংস্কৃতির এ বিশাল পরিধি নিয়ে মক্কার কাফেররা অনেক সময় হাসি-ঠাট্টা করত যে, এটা কেমন দীন যাতে মানুষের শৌচকর্মের পদ্ধতিও শিক্ষা দেয়া হয়। অথচ শৌচকর্ম থেকে নিয়ে মানুষের আহার-নিদ্রা, চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, লেনদেন ইত্যাদির বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ মহানবী (সা.) সাহাবিগণকে দিয়েছেন, যার কারণে সাহাবিগণ নিজেদের মার্জিত ও রুচিবান মনে করে গর্ব করতেন। বাস্তবিকই, মানবজীবনের সব দিকের সুন্দর উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি তার স্বাতন্ত্র্য, মাহাত্ম্য ও উত্তমতার কথাই প্রমাণ করেছে যুগে যুগে।

আধুনিক ধর্মহীন, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বিজাতীয় সংস্কৃতির বিপরীতে পবিত্র কুর'আন তেলাওয়াত, ইসলামী সঙ্গীত, নাটক ও চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক চর্চা, ইসলামী বিধি-বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান উদযাপনও ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা ইসলামের পূত-পবিত্র

৩৯৭. আল কুর'আন, ২:২০১

জীবনবোধে অনুপ্রাণিত হওয়া যায়। আর এ অনুপ্রেরণাই ইসালামী বোধ ও বিশ্বাসে স্থির থাকতে মানুষকে সাহায্য করে। অপরদিকে, অপসংস্কৃতির চর্চা ব্যক্তিকে বল্গাহীন ও অশালীন জীবনযাপনে উৎসাহিত করে, যা সমাজ ও জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ ক্ষতির প্রভাব এমনই সুদূরপ্রসারী যে, মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করে বস্তু ও ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে। অবশেষে সে আল্লাদ্রোহী হয়ে ইহকালে লাঞ্ছনা -গঞ্জনা এবং পরকালে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।[৩৯৮]

ইসলামী সংস্কৃতির লালন পরিবার থেকেই শুরু হতে হবে, পরিবারের ভেতরে ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হলেই ব্যক্তি জীবন যেমন সার্থক হবে। তেমন সার্থক হবে সমাজ ও রাষ্ট্র।

০৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

আত্মীয়তা বজায় রাখা ইসলামী চরিত্র এবং ভালো গুণাবলীর অন্যতম। আত্মীয়তা বলতে সাধারণত আমরা পারিবারিকভাবে সম্পর্কিত সম্পর্ককেই বুঝি। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ হচ্ছে তাদের সার্বিক খোঁজ খবর রাখা ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا •

অর্থ: তোমরা ভয় করো আল্লাহ্‌কে, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা (পরস্পর থেকে) তোমাদের অধিকার দাবি করো। আর সতর্ক হও রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের (অধিকারের) ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধানকারী পাহারাদার।[৩৯৯]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ •

অর্থ: আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জিহাদে শরিক হয়েছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মীয়রা আল্লাহ্‌র বিধানে একজন অন্যজন অপেক্ষা বেশি হকদার। অবশ্যি আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞানী।[৪০০]

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রশস্ততা ও হায়াত বৃদ্ধি চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।[৪০১]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, আত্মীয়দের ভালো- মন্দের খোঁজ খবর রাখা, বিপদাপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করার নির্দেশ আল কুর'আন দিয়েছে। যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে না তাদের ধমক দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ • أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ •

৩৯৮. ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, প্রাগুক্ত।

৩৯৯. আল কুর'আন, ৪:১

৪০০. আল কুর'আন, ৮:৭৫

৪০১. ইমাম বুখারী (রহ.), প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং-২০৬৭

অর্থ: তবে কি তোমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? এরা হলো সেসব লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্ লানত করেন এবং যাদের বধির ও দৃষ্টিহীন করে দেন।[৪০২]

কুর'আনি পরিবারে আত্মীয়তার সম্পর্ক সুন্দর থাকে। এতে ঈমানের পূর্ণতা ঘটে ও ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

০৭. পরিবারের জন্য ব্যয় করার ফযিলত

নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ খরচ বহনের বিষয়টি আমাদের কাছে শুধু একটি পার্থিব বিষয় মনে হলেও এটি একটি মহান দীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুর'আন ও হাদিস অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগির চেয়ে এ অধ্যায়টিকে কোনো দিক দিয়ে কম গুরুত্ব দেয়নি। নিজের ও পরিবারের জন্য বৈধ রিযিকের সন্ধান করাও একজন মুসলিমের ফরয দায়িত্ব।

সহীহ হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: 'মানুষের সর্বোত্তম মুদ্রা সেটি, যা সে তার পরিবারের খরচে ব্যয় করে।'[৪০৩] অন্য একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেন: 'কোনো ব্যক্তি তার পরিবারে যে খরচ করে তা-ও সদকাস্বরূপ, অর্থাৎ এতেও সে সদকার সওয়াব পাবে।'[৪০৪]

সুখি- সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে গঠন করা। কেননা, আদর্শ সমাজের জন্য প্রয়োজন আদর্শ পরিবার। বস্তুবাদের প্রভাব, মানুষের অসচেতনতা ও অদূরদর্শিতা দিনে দিনে মানুষকে নানা বিপর্যকর অবস্থার ঠেলে দিচ্ছে। মানুষ ধীরে ধীরে তার প্রকৃত মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সকল মূল্যবোধের বিপরীত অনৈতিকতা, স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তি মানুষের মন ও মগজে জেঁকে বসেছে। ইসলামী শরীয়া সমাজ জীবনের মৌল ভিত্তি হিসেবে পরিবারকে অত্যন্ত মযবুত সংগঠনরূপে গড়ে তোলার প্রত্যাশী। এর ফলেই মুসলিম সমাজের পরিবারগুলো সমাজের শক্তিশালী ইউনিট হিসেবে টিকে রয়েছে।

---

৪০২. আল কুর'আন, ৪৭: ২২-২৩

৪০৩. ইমাম মুসলিম (রহ.), *সহীহ মুসলিম*, অনু: আ.স.ম. নূরুজ্জামান (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১) খ. ১, হাদীস নং-৯৯৪

৪০৪. ইমাম বুখারী (রহ.), প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং-৪০০৬

২য় পরিচ্ছেদ

মুসলিম সমাজে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব

ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা, যার সঠিক অনুসরণের মাঝে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। ইসলাম তখনই শান্তি ও নিরাপত্তার যিম্মাদার হবে, যখন তা নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করা হবে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বিস্তারে ইসলাম যথেষ্ঠ গুরুত্ব ও তাগিদ দিয়েছে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ •

অর্থ: হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে, তারপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং অবগত।[৪০৫]

উম্মতে মুহাম্মাদকে পবিত্র কুর'আনে সর্বকালের সর্বোৎকৃষ্ট দল হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ •

অর্থ: তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির (কল্যাণের) উদ্দেশ্যে। তোমাদের দায়িত্ব হলো: তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা রাখবে। আহলে কিতাব যদি ঈমান আনে তবে সেটা হবে তাদের জন্যে কল্যাণকর। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে বটে, তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক (সত্য বিচ্যুত, সীমালংঘনকারী)।[৪০৬]

মুসলিম সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব বিস্তার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে।"[৪০৭]

সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিস্তারে ইসলামের উদারতা এতটাই বেশি যে, শত্রুও এর থেকে বাদ পড়বে না। আল্লাহর রাসূল (সা.) তার বাস্তব জীবনের ঘটনা দ্বারা তা দেখিয়ে দিয়েছেন। যে মক্কাবাসী তাকে তার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছে, তাঁকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজেছিল বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করার পর তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৪০৮]

---

৪০৫. আল কুর'আন, ৪৯:১৩

৪০৬. আল কুর'আন, ৩:১১০

৪০৭. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অনু. মাওলানা আফলাতুন কায়সার, সম্পাদনা: মাওলানা মো: মুসা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২), হাদীস নং-২৬৯৯

৪০৮. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ইসলামের ভূষণ* (দৈনিক সমকাল, ২৮ অক্টোবর ২০১৬)

ইসলাম শান্তি-সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। কোনরূপ সহিংসতা, বিবাদ-বিসংবাদের স্থান মুসলিম সমাজে নেই। কুর'আন মাজীদে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ •

অর্থ: যেখানেই তাদের সাথে মোকাবেলা হয় তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাও এবং তাদের বহিষ্কার করো যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে। ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যার চাইতেও গুরুতর অপরাধ। মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যতোক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। হ্যাঁ, তারা যদি (সেখানে) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা করো। এভাবেই কাফিরদের যথোপযুক্ত প্রতিদান (শাস্তি) দিতে হয়।[৪০৯]

সমাজে শান্তির বিধান নিশ্চিত করে প্রেম-প্রীতি, সৌহার্দ্য আর শান্তির এক পরিবেশ বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। মানবজীবনে উদারতা একটি মহান শিক্ষা। এর দ্বারা পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র সবখানেই বজায় থাকে স্থিতিশীলতা ও শান্তি। ইসলামের শিক্ষা হলো মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সব মানুষই আল্লাহর বান্দা। সমগ্র মানবজাতি একই পরিবারভুক্ত। অপরের কল্যাণসাধন মুসলিম সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য। কুর'আনে এসেছে,

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ •

অর্থ: তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ পরিমাণ মতো প্লাবিত হয়। আর প্লাবন তার উপরে আবর্জনা বহন করে বুদ্বুদ আকারে। এছাড়া তোমরা অলংকার কিংবা তৈজসপত্র তৈরির জন্যে যেসব ধাতু আগুনে বিগলিত করো সেগুলোর উপরিভাগেও অনুরূপ আবর্জনা ভেসে উঠে বুদ্বুদ আকারে। এভাবেই আল্লাহ্ হক এবং বাতিলের উপমা দিয়ে থাকেন। অতঃপর আবর্জনা সমেত বুদ্বুদ বিলীন হয়ে যায়, আর যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর তা জমিনে জমে থাকে। আল্লাহ এভাবেই উপমা দিয়ে থাকেন।[৪১০]

দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী জীবনে স্বার্থপরতার মূলোৎপাটন, সর্বদা ভোগের বিপরীতে ত্যাগের মনোভাব তৈরি করার মধ্য দিয়ে পরকালীন জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ সুগম করাই মুসলিম সমাজে ভ্রাতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন সমগ্র শরীর বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।"[৪১১]

৪০৯. আল কুর'আন, ২:১৯১

৪১০. আল কুর'আন, ১৩:১৭

৪১১. ইমাম বুখারী (রহ.), *সহীহ আল-বুখারি* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮২) হাদীস নং-৪৯৫৩

মুসলিম সমাজে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বকে সুরক্ষিত রাখতে কুর'আন নির্দেশিত কিছু পন্থা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

০১. বিনয় ও নম্রতা

ইসলাম মানুষকে যেসব ভালো গুণকে আয়ত্ত করার নির্দেশ প্রদান করেছে, বিনয়ী হওয়া বা নম্রতা অবলম্বন করা তার অন্যতম। একজন মুসলিম সবার সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী আচরণ করবে এবং নম্রতা হবে তার মুসলিম চরিত্রের অন্যতম দিক। বিনয় ও নম্রতা উত্তম চরিত্রের ভূষণ। আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا •

অর্থ: রহমানের দাস তো তারাই যারা জমিনের ওপর চলাফেরা করে বিনয়ী হয়ে। অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদের সাথে বিতর্ক করতে চায়, তারা বলে: 'সালাম।'[৪১২]

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ৬৩ বছরের সুদীর্ঘ জীবনের পুরোটাই নম্রতা আর বিনয়ী আচরণে পরিপূর্ণ ছিলো। কেবল মুসলিমদের সঙ্গেই নয়, তৎকালীন কাফির- মুশরিকরাও রাসূল (সা.) এর বিনয় বা নম্রতার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করতে পারেনি। নম্রতা মানুষকে সামাজিকভাবে সম্মানিত করে। বিনয় দ্বারা দুনিয়ায় যেমন সম্মানের অধিকারী হওয়া যায় তেমনি পরকালের জন্যও এ বিনয় জান্নাত অর্জনের কারণ হতে পারে। আল কুর'আনে বলা হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ •

অর্থ: যারা ঈমান আনে, এবং আমলে সালেহ্ করে এবং তাদের প্রভুর প্রতি বিনীত হয়ে জীবন যাপন করে, তারাই হবে জান্নাতের অধিকারী, সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।[৪১৩]

ইবনুল মোবারক বিনয় প্রসঙ্গে বলেছেন, "তোমার চেয়ে কম অর্থশালী লোকের সামনে নিচু কণ্ঠ থাকাই আসল বিনয়, যাতে করে তুমি অনুভব করতে পার যে তার ওপর তোমার দুনিয়াদারির কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"[৪১৪]

নম্রতা ও স্বভাবের বিনয়ীভাব একজন মুসলিমের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবন পর্যন্ত ব্যপ্ত। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.) ও বান্দাহদের সামনে বিনয়ী হওয়া এবং কোনো মানুষের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে না করা।

০২. অপর মুসলিমের মানহানি না করা

যে ব্যক্তি অন্য কোনো লোকের মানহানি করে অথবা কোনো ধরনের যুল্‌ম করে, তবে সেদিন আসার পূর্বেই তার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত- যেদিন তার না থাকবে ধন-সম্পদ আর না অন্য কিছু। ইসলাম মানবতার সপক্ষে শক্ত অবস্থান দেখিয়েছে। কেউ কোনো কারণে, অন্যের ওপর কোনো অন্যায় করে ফেললে সেটা দুনিয়ার জীবনেই মিটিয়ে ফেলতে হবে। নয়তো আখিরাতের জন্য আসামীকে নিজের পূণ্য হারাতে হবে।

---

৪১২. আল কুর'আন, ২৫:৬৩

৪১৩. আল কুর'আন, ১১:২৩

৪১৪. হাসান আইউব, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, অনু. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৪), পৃ. ৭৫

০৩. অপর ব্যক্তির মান-ইয্যত ও সম্পদের নিরাপত্তা

জাতি, ধর্ম-বর্ণ, ভাষা সংস্কৃতি নির্বিশেষে সব মানুষের মান-ইয্যত ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করেছে ইসলাম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ •

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! কোনো পুরুষ যেনো অন্য পুরুষকে তিরস্কার না করে। কারণ যাকে তিরস্কার করা হয়, সে তিরস্কারকারী থেকে উত্তম হতে পারে। কোনো নারীও যেনো অপর নারীকে উপহাস না করে। কারণ, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণীর চাইতে উত্তম হতে পারে। তোমরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা অতি মন্দ। (এমনটি করার পর) যারা তওবা করবে না (অনুতপ্ত হবেনা) তারা যালিম।[৪১৫]

কোনো মুসলিম প্রধান দেশে সংখ্যালঘু অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের জান, সম্পদ ও ইয্যত সংরক্ষণ করা শুধু রাষ্ট্রেরই নয়, সকল মুসলিমের দায়িত্ব। রাসূল (সা.) কেবল মুসলিমদের নয়, অমুসলিমদেরও জান ও সম্পদের নিরাপত্তা দান করেছেন। রাসূল (সা.) ইসলাম পূর্ব যুগের পারস্পরিক হানাহানি ও রক্তের হোলিখেলা বন্ধ করে এমন একটি সুশীল ও সুস্থ সমাজ বিনির্মাণ করেছিলেন। যাতে সকল মানুষই জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছিলো।

সম্পদ রক্ষা করা মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি অধিকার। মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে জীবিকার অন্বেষণ ও মাল-সম্পদ অর্জন করে থাকে। নিজের মাল সম্পদ রক্ষা করা সমাজে অত্যন্ত কঠিন কাজ। এমনকি সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে কোনো কোনো ব্যক্তিকে প্রাণও হারাতে হয়। ইসলামে অপর কোনো মানুষের মাল-সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ •

অর্থ: তোমরা নিজেদের একে অপরের মাল-সম্পদ খেয়ো না বাতিল (অন্যায়-অবৈধ) প্রক্রিয়ায় এবং জেনে বুঝে মানুষের মাল সম্পদের কিছু অংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে শাসকদের সামনে উত্থাপন করো না।[৪১৬]

০৪. রাস্তার হক আদায় করা

পথ চলতে গিয়ে কিছু ভদ্রতা মেনে চলা আবশ্যক, তাছাড়া জনসেবা করা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করাও পথচারীর কর্তব্য। এ শিক্ষাও দিয়ে দিয়েছে ইসলাম। যেমন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবীগণের 'রাস্তার হক' আদায় করতে বলছিলেন এভাবে: রাস্তার হক হলো- ০১. দৃষ্টিকে সংযত রাখা, ০২. পথের

৪১৫. আল কুর'আন, ৪৯:১১

৪১৬. আল কুর'আন, ২:১৮৮

কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া, ০৩. সালামের জবাব দেয়া, ০৪. সৎকাজের নির্দেশ দেয়া ও ০৫. অন্যায়কাজ হতে দেখলে বাধা দেয়া।[৪১৭]

ইসলাম অনেক সুন্দর করে 'হাক্কুল ইবাদ' তথা জনসেবার পথ বাতলে দিয়েছে! একজন মুসলিমের হাত থেকে তাত্ত্বিকভাবে অন্য সকলে যেমন নিরাপদ, তেমনি সে অন্যের শুভকামনা করছে সালামের মাধ্যমে, 'শুভকামনার' বাস্তব রূপ "কাজের মাধ্যমে প্রকাশ" করতে সে রাস্তা থেকে কষ্টকর বস্তুগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। সর্বোত্তম শাখা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, সর্বনিম্ন শাখা রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া।"[৪১৮]

নারী ও অন্য পথিকদের সুবিধার্থে নিজের দৃষ্টিকে নত করছে, সে সাথে অন্য ভাইকেও ইসলামের শিক্ষায় পরিচালিত করছে। অর্থাৎ একজন মুসলিম ঘরের বাইরে বের হওয়ামাত্রই সমাজের জন্য একটি আশির্বাদ বেরিয়ে আসে, শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেয় চতুর্দিকে। কল্যাণমূখী এক জীবনাদর্শ ইসলাম।

০৫. ওয়াদা রক্ষা করা

ওয়াদা হলো সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরস্পরের সাথে কোনো মৌখিক বা লিখিত চুক্তি করা। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মানুষের কল্যাণমুখী গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তা সত্যবাদীতার অবিচ্ছেদ অঙ্গ। আল কুর'আনে মহান রাব্বুল আ'লামীন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির পরিচয় ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে বলেন:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ •

অর্থ: আর তারা রক্ষা করে নিজেদের আমানত ও অংগীকার।[৪১৯] অন্যত্র বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا •

অর্থ: উত্তম পন্থায় ছাড়া ইয়াতিমদের মাল সম্পদের কাছেও যেয়ো না যতোদিন না তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, কারণ অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত চাওয়া হবে।[৪২০]

আল্লাহ ওয়াদা পালনকারীকে ভালোবাসেন। আল্লাহ নিজে তাঁর ওয়াদা পালন সম্পর্কে আল কুর'আনে বলেন:

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ •

অর্থ: সাবধান, জেনে রাখো, মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। সাবধান, জেনে রাখো আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।[৪২১]

মুসলিমকে অবশ্যই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মারাত্মক দোষ। যারা ওয়াদা পালন করে না বা কথা দিয়ে কথা রাখে না, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

৪১৭. ইমাম বুখারি (রহ.), প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং-৬২২৯
৪১৮. ইমাম মুসলিম (রহ.), প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং-৩৫
৪১৯. আল কুর'আন, ২৩:৮
৪২০. আল কুর'আন, ১৭:৩৪
৪২১. আল কুর'আন, ১০:৫৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ •

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা করো না?[৪২২]

মুসলিমরা সমাজে নিজ কৃত ওয়াদা রক্ষার মাধ্যমে সকলের আস্থাভাজন হয়।

০৬. আমানাতের খিয়ানত না করা

ইসলামে আমানতের গুরুত্ব অত্যধিক। আমানতের খিয়ানত করা কবিরা গুনাহ ও মুনাফিকের পরিচায়ক। আমানতদারিতা এমন এক মহৎ গুণ যার উপরে জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। মহান আল্লাহ বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا •

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার হকদারকে দিয়ে দিতে। তিনি আরো নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সুবিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদের অতি উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৪২৩]

অন্যত্র বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ •

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ্ এবং রসূলের খিয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও খিয়ানত করো না।[৪২৪]

আমানত শব্দের অর্থ বিশ্বস্ততা, নিরাপত্তা, গচ্ছিত রাখা, জমা রাখা ইত্যাদি। যিনি গচ্ছিত বস্তু যথাযথভাবে হিফাযত করেন এবং প্রকৃত মালিক চাওয়ামাত্র তা ফেরত দেন তাকে আমিন বলা হয়। আমানত শুধু অর্থ সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর বিষয়বস্তু ব্যাপক। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী, শিক্ষকতা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়িত্ব, মজুরি সবই আমানতের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষকের কাছে ছাত্রছাত্রী আমানত, তাদের সুশিক্ষা দেওয়া তাঁর দায়িত্ব। ব্যাংকারদের কাছে গচ্ছিত টাকা তাদের নিকট জনগণের আমানত, গ্রাহককে এর চুক্তিমতো ফিরিয়ে দেয়া তাদের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ও কর্মচারিদের কাছে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, জনগণের জান-মালের সুরক্ষা ও মৌলিক চাহিদা পূরণ ইত্যাদি আমানত রক্ষা করা কর্তব্য। অনুরূপ মানুষের সুস্থ বিবেক, হাত-পা, চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ঠোঁট ইত্যাদি প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রতঙ্গ ব্যক্তির কাছে আমানতস্বরূপ। এগুলো ব্যবহার প্রসঙ্গে বিচার দিবসে জিজ্ঞেস করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ •

অর্থ: চোখের খিয়ানত এবং অন্তরের গোপন কথা তিনি জানেন।[৪২৫]

---

৪২২. আল কুর'আন, ৬১:২

৪২৩. আল কুর'আন, ৪:৫৮

৪২৪. আল কুর'আন, ৮:২৭

৪২৫. আল কুর'আন, ৪০:১৯

আমানত রক্ষা করা ঈমানদারের পরিচায়ক। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আমানতদার। তাঁর জাতি খুব অল্প বয়সেই তাঁকে আল-আমিন তথা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর সাহাবীগণও ছিলেন আমানতদারিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে তাঁরা আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

০৭. ওযনে কম না দেয়া

কুর'আন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ওযনে ও মাপে কম করার কঠোর নিন্দা এবং সঠিকভাবে ওযন ও পরিমাণ করার জন্য তাগিদ করা হয়েছে। অন্যকে ঠকিয়ে সম্পদ অর্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কুর'আনের ঘোষণা:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ • الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ • وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ •

অর্থ: যারা মাপে-ওযনে কম দেয় তাদের জন্যে ওয়াইল (ধ্বংস)। মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় তারা পুরো মাত্রায় দাবি করে, এবং যখন অন্যদের মেপে বা ওযন করে দেয়, তখন প্রাপ্যের চাইতে কম দেয়।[৪২৬] অন্য আয়াতে এসেছে:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا •

অর্থ: যখন মেপে দেবে মাপ পূর্ণ করবে এবং ওযন করবে সমান-সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়। এটাই উত্তম এবং পরিণামের দিক থেকে কল্যাণকর।[৪২৭]

ওযনে কম দেয়ার মাধ্যমে কাউকে ঠকানো একটি গুরুতর দন্ডনীয় অপরাধ। শুয়াইব (আ.)-এর জাতিকে আল্লাহ এ অপরাধে ধ্বংস করে দেন। এ অন্যায় পথে সম্পদ অর্জন সম্পূর্ণ অবৈধ।

এ নির্দেশটা নিছক ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক লেনদেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হাট-বাজার ও দোকানগুলোতে মাপজোক ও দাঁড়িপাল্লাগুলো তত্ত্বাবধান করা এবং শক্তি প্রয়োগ করে ওযনে ও মাপে কম দেয়া বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ওযন ও পরিমাণে স্বচ্ছতা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই শুভ পরিণামের কারণ হতে পারে। দুনিয়ায় এর শুভ পরিণাম হচ্ছে। এর ফলে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জন দু'জনের ওপর ভরসা করে, এর ফলে ব্যবসায়ে উন্নতি আসে এবং ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। অন্যদিকে আখেরাতে এর শুভ পরিণাম পুরোপুরি নির্ভর করে ঈমান ও আল্লাহভীতির ওপর।[৪২৮]

০৮. সালাম প্রদান

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় ও অটুট রাখার উত্তম মাধ্যম সালাম। এতে ব্যক্তির উন্নত আচরণ ও উত্তম স্বভাবের প্রতিফলন ঘটে। মুসলিমদের পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের মাধ্যম হলো সালাম বিনিময়। এ শব্দে নিহিত রয়েছে অনেক দরদ, মায়া ও ভালোবাসা। সালামের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বন্ধুত্ব, অর্জিত হয় ভালোবাসা এবং লাভ হয় নিরাপত্তা।

---

৪২৬. আল কুর'আন, ৮৩:১-৩

৪২৭. আল কুর'আন, ১৭:৩৫

৪২৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *তাফহীমুল কুর'আন* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪), খ. ৭, পৃ. ১৩৫

মুমিননের জীবনে সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। আদম (আ.) কে সৃষ্টি করে তার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়, তা হলো ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আ.) কে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ছিলো ষাট হাত। আল্লাহ তা'য়ালা যখন তাঁকে সৃষ্টি করলেন, বললেন: যাও এবং অবস্থানরত ফেরেশতাদের ঐ দলটিকে সালাম করো। আর তাঁরা তোমার সালামের কি জবাব দেয় তা শুনো। এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম। তখন তিনি গিয়ে বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম'। তাঁরা (জবাবে) বললেন, 'আস্সালামু আলাইকা ওয়ারাহমাতুল্লাহ'। রাসূল (সা.) বলেন, তাঁরা 'ওয়ারাহমাতুল্লাহ' অংশটি বৃদ্ধি করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, যে বেহেশতে প্রবেশ করবে সে হযরত আদম (আ.) এর আকৃতিতেই হবে এবং তার উচ্চতা হবে ষাট হাত। তখন থেকে সৃষ্টিকুলের উচ্চতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে।[৪২৯]

অন্যান্য নবীদের জীবনেও সালামের প্রচলন ছিলো। আল কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَ لَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَاۤ اِبۡرٰهِيۡمَ بِالۡبُشۡرٰى قَالُوۡا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنۡ جَآءَ بِعِجۡلٍ حَنِيۡذٍ •

অর্থ: আমাদের দূত (ফেরেশতাগণ) সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল ইবরাহিমের কাছে। এসে তারা বলেছিল: 'সালাম!' তিনিও বলেছিলেন: 'সালাম।' অতঃপর তিনি দেরি না করে ভুনা করা গো-বাছুর নিয়ে এলো (তাদের মেহমানদারির জন্যে)।[৪৩০]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

قِيۡلَ يٰنُوۡحُ اهۡبِطۡ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَ بَرَكٰتٍ عَلَيۡكَ وَ عَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنۡ مَّعَكَ ؕ وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمۡ ثُمَّ يَمَسُّهُمۡ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيۡمٌ •

অর্থ: বলা হয়েছিল: 'হে নূহ! (নৌযান থেকে) নেমে পড়ো। আমাদের পক্ষ থেকে সালাম ও বরকত তোমার প্রতি এবং যেসব প্রজাতি তোমার সাথে রয়েছে তাদের প্রতি। আর অন্যান্য জাতিসমূহকে আমরা কিছুকাল জীবন উপভোগ করতে দেবো, তারপর আমাদের পক্ষ থেকে বেদনাদায়ক আযাব তাদেরকেও স্পর্শ করবে।'[৪৩১]

সালামের বহুমুখী দিক রয়েছে। সালাম প্রদানকারী অহংকার থেকে মুক্ত থাকে। সালাম প্রদান করা একটি হক। সালাম প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। কারণ সালামের অর্থই হলো দ্বীনি ভাইয়ের প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত প্রার্থনা করা। সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর তোমরা ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দিবো না যা

---

৪২৯. এম, আফলাতুন কায়সার, *মিশকাত শরীফ* (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৩), খ. ৯, পৃ. ৩, হাদীস-৪৪২৩

৪৩০. আল কুর'আন, ১১:৬৯

৪৩১. আল কুর'আন, ১১:৪৮

তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে? (আর তা হচ্ছে) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে।"[৪৩২]

রাসূল (সা.) রাস্তায় যখন চলতেন, নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সবাইকেই তিনি সালাম দিতেন। সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। সঠিক অনুভূতি নিয়ে সালামের আদান প্রদান পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করে। সালামের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক দু'আ ও কল্যাণ কামনা। সালামের দ্বারা সৃষ্টি হয় সম্প্রীতির পরিবেশ।

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক ছয়টি: ০১. সালামের জবাব দেয়া, ০২. হাঁচিদাতাকে (তার আলহামদুলিল্লাহ বলার জবাবে) রহমতের দু'আ করা, ০৩. দাওয়াত কবুল করা, ০৪. অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ও ০৫. জানাযার সাথে গমন করা, ০৬. অপরের কল্যাণ কামনা চাই সে উপস্থিত থাকে বা না থাকে।"[৪৩৩]

سلام 'সালাম' এর আভিধানিক অর্থ- বিপদ-আপদ কিংবা দোষ-ত্রুটি হইতে নিরাপদে থাকা। ইসলামী শরীয়তে সালাম একটি দু'আ বিশেষ। মুসলিমগণ পরস্পর সাক্ষাতে বিনিময় করিয়া থাকে। ইতিহাস হতে জানা যায়, মানব সভ্যতার সূচনা হতেই একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সময় উপস্থিতকে স্বাগত জানানোর জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে আসছে। বর্তমান চলমান বিশ্বের প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদের নিজ নিজ রুচি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী সে ভাব বিনিময়ের পৃথক পৃথক পদ্ধতি চালু আছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের মধ্যে এমন কিছু বাক্য প্রচলিত ছিলো ইসলামের সূচনালগ্ন হতে রাসূল (সা.) পরিবর্তন করে প্রচলিত সালামের শব্দগুলি ব্যবহার করিতে আদেশ করেন। তারা যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করত তার অর্থ- 'আল্লাহ আপনার চক্ষু ঠাণ্ডা করুন', 'সু-প্রভাত' বা 'শুভ সন্ধ্যা' ইত্যাদি। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়- অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের ভাব প্রকাশের প্রচলিত সম্ভাষণ পদ্ধতির মধ্যে সে সার্বজনীনতা বা ব্যাপকতা নাই, যা মুসলিমদের 'সালামের' মধ্যে নিহিত রয়েছে। সালামের কার্যকারিতা বা উপকারিতাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একজন অপরিচিত ব্যক্তির সাথে পরিচয় অর্জন, ভাব-সম্প্রসারণ এবং তাকে খুব সহজেই আপন করে ফেলার জন্য সাক্ষাতের সাথেই প্রথম সম্ভাষণ হিসাবে ইসলামে সালামের গুরুত্ব অপরীসিম। অন্য কথায় তা যেন একটি যাদুমন্ত্র। আর পরিচিত ব্যক্তির সাথে সালাম বিনিময়ে হৃদ্যতা আরো সুদৃঢ় হয়। এ ছাড়া 'সালাম' আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভে উত্তম সহায়ক। সামাজিকভাবে সালামের দ্বারা পারস্পরিক শত্রুতা দূর হয় এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে উঠে, আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, 'সালাম' হলো ইসলামী শে'আর বা প্রতীক।

'সালাম' করা বা সালামের জবাব দেয়া উভয়টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে শান্তি ও নিরাপদে থাকার কামনা। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি সালাম করলো যে যেন যাকে সালাম করল তার অনিষ্ট হতে নিরাপদে থাকার কামনা করলো। আর যদি সে জবাব না দেয় তখন তার পক্ষ হতে কোনো প্রকারের ক্ষতি বা অনিষ্টকর কিছু প্রকাশ হবার ধারণা সৃষ্টি হয়। কাজেই সালামের সংগে সংগেই জবাব প্রদান করে উক্ত ধারণাটি দূর করে দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। ফলে সালামের জবাব দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব।[৪৩৪]

---

৪৩২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৪২৬

৪৩৩. ইমাম মুসলিম (রহ.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৪৬৫

৪৩৪. এম, আফলাতুন কায়সার, প্রাগুক্ত, খ. ৯, হাদীস নং- ১-২

০৯. হাসিমুখে কথা বলা

কর্কষভাষী বা কঠিন হৃদয়ের মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। মহান আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ •

অর্থ: (হে মুহাম্মদ!) এটা আল্লাহ্‌রই রহমত যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল! তুমি যদি তাদের প্রতি কঠোর-হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তো। সুতরাং তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের জন্যে (আল্লাহ্‌র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর কার্য পরিচালনায় তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন সংকল্প (সিদ্ধান্ত) গ্রহণ করবে আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের পছন্দ করেন।[৪৩৫]

ভালো ও সুন্দর কথা পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। "আদী ইবনে হাতেম (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। যদিও তা অর্ধেক খেজুরের বিনিময়েও হয়। যে তাও দান করতে অক্ষম, সে লোকজনকে ভালো ও সুন্দর কথা দ্বারা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।"[৪৩৬] অন্যত্র তিনি বলেন: 'ভালো কথাও সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে।'[৪৩৭] অপর হাদীসে এসেছে: 'আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, ভালো কাজের কোনটিকেই তুচ্ছ করবে না। যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতও হয়।'[৪৩৮]

হাসি সৌন্দর্যের প্রতীক। হাসিমুখে কথা বলা ও বিনয়ী আচরণ ইসলামের সৌন্দর্য। ইসলাম এক অনুপম আদর্শ জীবন ব্যবস্থার নাম। মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজেই রয়েছে কল্যাণ। নূন্যতম সৌজন্যবোধেও রয়েছে সওয়াব। এক মুসলিমের সঙ্গে অন্য মুসলিমের আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক, সৌজন্যতাবোধ ও হাসিমুখে সাক্ষাত তার উত্তম চরিত্রের পরিচয় বহন করে। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই পরিপূর্ণ ঈমানদার। আর ঈমানদার ব্যক্তির প্রতিটি কাজই হবে সওয়াবের এবং কল্যাণের।

১০. অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদ্ব্যবহার

মুসলিম সমাজে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সংগে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন: "আল্লাহর শপথ! মুক্তি নয়, আল্লাহর শপথ! মুক্তি নয়, আল্লাহর শপথ! মুক্তি নয়। সাহাবা কিরাম (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সে কে? যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।"

এখানে প্রতিবেশী মুসলিম হতে পারে বা অমুসলিম হতে পারে। সুতরাং একজন অমুসলিম প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলেও সেটা ঈমানের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুর'আনে বলা হয়েছে,

---

৪৩৫. আল কুর'আন, ৩:১৫৯

৪৩৬. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, অনু. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮২), হাদীস নং-৬০২৩

৪৩৭. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, অনু. মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭), হাদীস নং-১৯৫৬

৪৩৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৭০

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ •

অর্থ: জগদ্বাসীর জন্যে রহমত (অনুকম্পাও আশীর্বাদ) ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমরা তোমাকে রসূল বানিয়ে পাঠাইনি।[৪৩৯]

এখানে বিশ্বাবাসীর মধ্য মুসলিম ও অমুসলিম সবাই অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুর'আনের অন্যত্র ইসলাম সুস্পষ্টভাবে যেসব অমুসলিমরা মুসলমিদের সংগে হত্যায় লিপ্ত নয় কিংবা ক্ষতির কারণ নয়। তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায়পরায়ণতার কথা বলেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَّا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ •

অর্থ: দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে এবং ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।[৪৪০]

একজন অমুসলিম নাগরিকের ইসলামী দেশে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বসবাস করার নিশ্চয়তা ইসলামে রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ •

অর্থ: তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদের গালি দিও না, তাহলে তারাও না জেনে সীমালংঘন করে আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে। এভাবেই আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি তাদের কর্মকান্ডকে। তারপর তাদের প্রভুর কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে, তখন তিনি তাদের সংবাদ দেবেন- তারা কী আমল করতো।[৪৪১]

সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজে অমুসলিম নাগরিকদের জান মাল ও ইয্যত আবরু ঠিক মুসলিম নাগরিকদের জান মাল ও ইয্যত আবরুর মতোই মূল্যবান হয়ে থাকে।

সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থাকা এবং সবার মাঝে সুসম্পর্ক থাকা। মুসলিম সমাজ অত্যাচার-অনাচার, হানাহানি-দলাদলি এবং অশুভ আচরণ থেকে মানুষকে শুদ্ধতার দিকে ধাবিত করে। আবদ্ধ করে একে অপরকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। সৃষ্টি করে সংযমী ও মিথ্যার সঙ্গে আপোসহীন একটি মানব সমাজ।

৪৩৯. আল কুর'আন, ২১:১০৭

৪৪০. আল কুর'আন, ৬০:৮

৪৪১. আল কুর'আন, ৬:১০৮

৩য় পরিচ্ছেদ

সমাজের কল্যাণ সাধনে ইসলামী আইনের সফলতা

যেসব সমাজ ইসলামী শরীয়তকে আঁকড়ে ধরেছে এবং তার দ্বারা শাসিত হয়েছে সে সব সমাজের উন্নতি অগ্রগতি ও কল্যাণ সাধন করতে ইসলামী শরীয়ত সফল ও সক্ষম হয়েছিলো। ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের ফলে সত্য ও কল্যাণ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা বিকশিত হয়েছিলো। ন্যায় ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়েছিলো সমাজের চারিদিকে।

সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি

ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের ফলে তৈরি হয়েছিলো এমন সব সৎ লোক যারা আল্লাহর হক সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তারা কল্যাণকর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং সৎ কাজ করতেন। তারা সমাজ থেকে যেমন নিজেদের চাহিদা পূরণ করতেন তেমনি সমাজেও তাদের অবদান রাখতেন। ইসলামী শরীয়ত মানুষকে এ কথা বুঝিয়েছে যে, মানুষের অধিকার যেমন আছে তেমনি তার কর্তব্যও আছে। ইসলাম অধিকার চিন্তার চেয়ে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছে বেশি। কেননা মানুষের অধিকার হচ্ছে বাস্তবে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। কেউ তার অধিকার পেতে পারে না যদি না অন্যরা তাদের কর্তব্য আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়। এ কারণেই মুসলিম সমাজ একটি দায়িত্বশীল সমাজ। ইসলামী আইনের ভাষায় মুকাল্লেফীন বা দায়িত্ব বহনকারী সমাজ। এ সমাজের প্রত্যেক বুদ্ধি সম্পন্ন লোক দায়িত্বশীল, অর্থাৎ সকলকেই কর্তব্য পালন করতে হয়। কর্তব্য পালন না করে কেউ তার অধিকার চাইতে পারে না। বর্তমান আধুনিক যুগের সমস্যা হলো এ যুগের সকলেই কেবল বলে আমার অনেক অধিকার আছে। কেউ বলতে চায় না যে আমার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। মানুষের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হলো তার প্রভুর প্রতি কর্তব্য। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষ তাঁর পরিচয় জানবে, তাঁর ইবাদত বন্দেগী করবে এবং তাঁর সৃষ্ট এ দুনিয়ায় সত্য ও মঙ্গলজনক কাজ দ্বারা ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করবে। এ কারণেই ইসলামী সমাজ একাধারে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও পার্থিব উন্নয়নের সমাজ। এখানে ইবাদত-বন্দেগী ও পার্থিব উন্নয়ন পাশাপাশি চলে। এমনকি রাসূল (সা.) হিজরতের পর মদীনার সমাজে সর্ব প্রথম যে কাজটি করেছিলেন তা হলো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা আর দ্বিতীয় যে কাজটি করেছিলেন তা হলো বাজার প্রতিষ্ঠা। একটি করেছিলেন দ্বীনের জন্য আর অপরটি করেছিলেন পার্থিব উন্নয়নের জন্য।[৪৪২] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ •

অর্থ: তাদের মধ্যে আবার এমন লোকেরাও আছে, যারা বলে (প্রার্থনা করে): 'প্রভু! আমাদেরকে এই দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো, আর আমাদের রক্ষা করো আগুনের আযাব থেকে।'[৪৪৩]

৪৪২. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, অনু. ড. মাহফুজুর রহমান (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ৫৬

৪৪৩. আল কুর'আন, ২:২০১

নারী সমাজকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে মুক্ত করণ

ইসলামী শরীয়তের মাধ্যমেই নারী সমাজের প্রতি ইনসাফ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সব জাহিলিয়াত তাদের প্রতি যুলুম করেছে। ইসলাম তাদেরকে এ বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছে এবং মা, মেয়ে ও স্ত্রী হিসেবে পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

নারীর বিষয়ে জাহেলী যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে এসেছে কুর'আনের আয়াতে:

وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ • بِاَیِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ •

অর্থ: যখন জিজ্ঞাসা করা হবে জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে (হত্যা করা) মেয়েকে, কী অপরাধের কারণে হত্যা করা হয়েছিল তাকে?[৪৪৪]

যে সমাজে পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিলো নারীর অবস্থান। কণ্যা সন্তানের জন্ম সেখানে ছিলো অভিশাপ আর আপমানের বিষয়। অপমানবোধ আর মর্যাদা রক্ষায় জীবন্ত কবর দেয়া হতো কন্যা সন্তানকে। সে সমাজে নারীকে মানুষ বলে গণ্য করা হতো না। নারীর না ছিলো নিজের সত্তার উপর কোনো অধিকার, না ছিলো সম্পদের উপর। বরং সে নিজেই ছিলো সম্পদ। ওয়ারিশসূত্রে যার হাত বদল হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর নারী মুক্তি পেল। কন্যা সন্তানের জন্মকে বলা হলো সুসংবাদ। ইসলাম দিলো নারীর পিরাপত্তা। নারীর প্রতি সকল প্রকারের অন্যায়কে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হলো এবং নারীকে বাতলে দিলো নিরাপদ থাকার পথ। ইসলাম ঘোষণা দিলো, তারাও মানব জাতির অংশ। নারী ছাড়া মানব জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। কুর'আনের বিভিন্ন জায়গায় নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ •

অর্থ: হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে, তারপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জ্ঞানী এবং অবগত।[৪৪৫] অন্যত্র বলা হয়েছে:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَاۤ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ •

অর্থ: ফলে তাদের প্রভু তাদের দোয়ার জওয়াব দিয়েছেন এই বলে: 'আমি তোমাদের কোনো পুরুষ বা নারী আমলকারীর আমল বিনষ্ট করি না। তোমরা একই দলের সদস্য। তাই যারাই আমার জন্যে হিজরত করেছে এবং যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, আমার পথে কষ্ট দেয়া হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি অবশ্য অবশ্যি তাদের থেকে মুছে দেবো তাদের পাপ ও দোষত্রুটি এবং অবশ্য অবশ্যি

৪৪৪. আল কুর'আন, ৮১:৮-৯

৪৪৫. আল কুর'আন, ৪৯:১৩

তাদের দাখিল করবো সেসব জান্নাতে, যেগুলোর নিচে দিয়ে জারি থাকবে নদ-নদী-নহর। এগুলো তারা পাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবে আর উত্তম পুরস্কার তো আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে।'[৪৪৬]

নারী মহান আল্লাহর এক অসাধারণ সৃষ্টি। কারণ পুরুষের উন্নতি বা পূর্ণতার পথে নারীর সহযোগিতা অপরিহার্য। ইসলামের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি। সামাজিক অগ্রগতি, গঠনমূলক কাজ এবং বিশ্বের ব্যবস্থাপনার কাজে দায়িত্ব পালনের জন্য নারীকে অবশ্যই সুযোগ দেয়া উচিত। যোগ্যতার দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য অভিন্ন। তাদের উভয়ের জন্যই রয়েছে প্রতিদান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا •

অর্থ: নিশ্চয়ই মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিনন পুরুষ ও মুমিনন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌনাংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাংগ হিফাযতকারী নারী, বেশি বেশি আল্লাহ্‌র যিকিরকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ্ এদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন মাগফিরাত আর শ্রেষ্ঠ প্রতিদান।[৪৪৭]

ইসলাম পুরুষদের ন্যায় নারীদের ওপরও জ্ঞান ফরয করেছে। এ কারণেই তাদের মধ্যে অনেক সাহিত্যিক, কবি, হাফেযে কুর'আন এবং ইলমে হাদীসে অভিজ্ঞ সুপন্ডিত সৃষ্টি হয়েছিলো। তারা মাতৃত্ব ও সন্তানের শিক্ষা বা প্রতিপালনের ভূমিকা বজায় রেখে এবং ইসলামী পোশাক পরেই শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও গবেষণার মতো বিভিন্ন সামাজিক কাজে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এটা নারী সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রমাণ।

মাদকাসক্তি ও মাদকদ্রব্যের উচ্ছেদ

মদ বা সুরা বলা হয় এমন এক এ্যালকোহলীয় পদার্থকে, যা পান করা হলে নেশাগ্রস্ত হতে হয়। এ পদার্থটি পান করার ফলে ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি ও দৈহিক স্বাস্থ্যে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। তার দ্বীনদারীও নিঃশেষ হয়ে যায়। বৈষয়িকতার দিক দিয়েও তাকে কঠিন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যেতে হয়। তার পরিবারটিকেও বিরাট ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়। আর এরূপ অবস্থা জাতি ও সমাজের বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে চরম দুর্গতি নিয়ে আসে অনিবার্যভাবে।[৪৪৮]

ইসলামী শরীয়তের পরিমন্ডলেই জাতি তার ইতিহাসে সর্বপ্রথম মাদকদ্রব্যের উচ্ছেদ অভিযানে সফল হয়েছিলো। মাদকের পেছনে মানুষের খরচ হয় অঢেল ধন সম্পদ। মাদক সেবনের ফলে

৪৪৬. আল কুর'আন, ৩:১৯৫

৪৪৭. আল কুর'আন, ৩৩:৩৫

৪৪৮. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনু. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ১০৩

ক্ষতি হয় বুদ্ধিমত্তা, ধ্বংস হয় পরিবার এবং স্তব্ধ হয় সমাজের চালিকাশক্তি। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিচারেও একথা প্রমাণিত যে, মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। তা মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও চরিত্রকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও বিনষ্ট করে দেয় এবং তা মানব সভ্যতারও পরিপন্থী।

মানব জাতি এ বিজয় অর্জন করেছিলো চৌদ্দশ বছর পূর্বে ইসলামী শরীয়তের ছায়াতলে এবং ইসলামী তারবীয়াতের মাধ্যমে। অন্যদিকে চরিত্র ও স্বাস্থ্য বিধ্বংসী এ দূরাপদ হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা চরম ব্যর্থ হয়েছে অন্যান্য জাতি বা রাষ্ট্র। এর সর্ব উৎকৃষ্ট উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অঢেল অর্থ ব্যয়, বিরাট শক্তি প্রয়োগ এবং প্রচার প্রগান্ডার যাবতীয় মাধ্যম গ্রহণ করা সত্ত্বেও সমাজের ওপর এর ভয়াবহ আক্রমণ বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়া।[৪৪৯]

জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা সুরা পানের জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তাদের মদের আসক্তির কোনো সীমা ছিলো না। তাদের ভাষায় মদের প্রায় একশটি নাম রাখা হয়েছিলো। তাদের কাব্য ও কবিতায় মদের বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ রয়েছে, প্রত্যেক প্রকারের বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা পান পাত্র ও পরিবেশনকারী-কারিনীদের সৌন্দর্য বর্ণনায়, মদ পানের মজলিস সমূহের গুণগানে মুখর হয়ে উঠেছিলো। ইসলাম এসে তাদেরকে একটা সুনির্দিষ্ট ও সুস্থ পথে শিক্ষিত ও পরিচালিত করে। মদপান নিষিদ্ধ করে কুর'আনের আয়াত নাজিল হয়:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! জেনে রাখো, মদ, জুয়া, আস্তানা এবং ভাগ্য নির্ণয়ের শর-এগুলো সবই নোংরা শয়তানি কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন করো, তবেই সফলকাম হবে। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে সে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে এবং তোমাদের বাধা দেবে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও সালাত থেকে। তারপরও কি তোমরা তা থেকে বিরত হবেনা?[৪৫০]

আমেরিকার ১৯১৯ সালের ঘটনা। মাদকদ্রব্য ব্যবহার ও মদপান সেখানে ব্যাপক আকার ধারণ করে। ছোট, বড়, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সবাই মদ পান করে বেহুশ হয়ে পড়তে শুরু করে। সরকার গোটা জাতির আসন্ন ধ্বংসের আশংকায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। তখন সেখানে মদ পান নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা হয়। সরকার আইন জারি করার পর প্রকাশ্যভাবে মদ পান বন্ধ হয় কিন্তু গোপনভাবে তা পূর্বের চেয়েও মারাত্মক রূপে পরিণত হয়। সরকার আইন রচনা করে প্রচারাভিযান চালায়। তাতে ৬০ মিলিয়ন ডলারেরও অধিক ব্যয় করা হয়। প্রচার পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০ মিলিয়নকেও ছাড়িয়ে যায়। মদ পানের অপরাধে ৩০০ জনকে ফাঁসী দেয়া হয়। ৫,৩২,৩৩৫ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। আর জরিমানা স্বরূপ আদায় করা হয় ১৬ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমেরিকান জাতিকে মাদকাসক্তি ও মদ পানের নিকৃষ্টতম অভ্যাস থেকে মুক্ত করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত ১৪ বছর পর (১৯১৯-১৯৩৩) পর্যন্ত মদ পান নিষিদ্ধকরণ

৪৪৯. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৪৫০. আল কুর'আন, ৫:৯০-৯১

আইনটিকে প্রত্যাহার করতে সরকার বাধ্য হয়। মানব রচিত আইনের এ ব্যর্থতা দুনিয়ার মানুষের জন্য চিরকালের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকলো।[৪৫১]

এ পর্যায়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে বিধৃত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন শেষ রাসূল হিসেবে মনোনীত হলেন, তখন আরব সমাজ মদ পানে ভয়ানকভাবে অভ্যস্থ ছিলো। তাদের দেহের শিরায় শিরায় রক্ত নয়- রঙিন সুরা প্রবাহমান ছিলো। বহু সংখ্যক সাহাবীও মদ পানে লিপ্ত ছিলেন।

মদ পান নিষিদ্ধ হওয়ার এ স্পষ্ট ঘোষণা অবতীর্ণ হওয়ার পর ঈমানদার সমাজে এক বিস্ময়কর দৃশ্য অবতীর্ণ হয়। কেউ তার হাতে ধরা উচ্ছ্বসিত পাত্র দূরে নিক্ষেপ করে দিচ্ছে, কেউ বড় পাত্র থেকে ছোট পাত্রে তুলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে, কেউ মুখের কাছে ধরা ও চুমুক দিতে উদ্যত হয়েও পানপাত্র দূরে নিক্ষেপ করে দিচ্ছে, কেউ মদ্য ভর্তি মটকা ভেঙে অলিতে-গলিতে মদের স্রোত প্রবাহিত করে দিচ্ছে, আর যারা মদ্যপান করে পেট ভর্তি করে নিয়েছিল, তারা গলায় আংগুল ঢুকিয়ে বমি করে ফেলে দিচ্ছে। সে এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) একটা ভাষণ দিলেন। বললেন: হে জনগণ! আল্লাহ তা'য়ালা মদ্যপান ঘৃণা ও অপছন্দ করেন। সম্ভবত খুব শিগগিরই এ পর্যায়ে নিষেধ বাণী অবতীর্ণ হবে কাজেই এখনো সময় আছে। যার নিকট যতটা আছে সব বিক্রয় করে ফেল এবং অন্য কোনো কাজে লাগাও। আবু সায়ীদ (রা.) বললেন: অতঃপর অল্প কয়েকটা দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর একদিন বললেন: আল্লাহ তা'য়ালা চূড়ান্তভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এখন কারো নিকট মদ্য থাকলে তা পানও করতে পারবে না, বিক্রয়ও করতে পারবে না। একথা শোনা মাত্রই লোকেরা চলে গিয়ে নিজের নিজের সুরাপাত্র ও ভাণ্ডারসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো। মন ও মানসিকতার তাদের এতোটাই প্রবল আধিপত্য ছিলো, যার ফলে তারা একটি আসক্তি ও অভ্যাসকে নিমিষেই পরিত্যাগ করতে পেরেছিলো।[৪৫২]

ইসলামে মাদক দ্রব্য মাত্রই হারাম ঘোষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে তার পরিমাণের ওপর মোটেই দৃষ্টি দেয়া হয়নি। কাজেই তার পরিমাণ কম হোক বা বেশি, উভয় অবস্থাতেই তা হারাম। ইসলামী শরীয়তের সাধারণ নিয়মে মুসলমানের পক্ষে এমন কোনো জিনিস খাওয়া বা পান করা জায়েয নয়, যা তাকে সংগে সংগে অথবা ধীরে ধীরে ধ্বংস ও সংহার করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা কুর'আনে বলেছেন:

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অর্থ: আর তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করোনা। ভালো কাজ করো, যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।[৪৫৩]

মাদক মানব সভ্যতার চরম শত্রু। এটি জীবন ও সম্ভবনাকে নষ্ট করে। শান্তির পরিবারে অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত করে এবং সমাজে অনাচার ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। তাই কল্যাণের ধর্ম ইসলামে মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ হরামা।

---

৪৫১. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *আল কুর'আনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জানুয়ারি ১৯৯৩), পৃ. ২৬৫

৪৫২. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

৪৫৩. আল কুর'আন, ২:১৯৫

সুদের হাত থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করণ

ইসলামী শরীয়তের ছায়াতেই মানব জাতি আরেকটি বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো সুদ হারাম ঘোষণা করার মাধ্যমে। সুদের বিরুদ্ধে কুর'আন ও হাদীস শক্তভাবে বাধা আরোপ করেছে। কুর'আন সুদ সম্পর্কে ঘোষণা করেছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ • فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ •

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং মানুষের কাছে তোমাদের যে সুদ পাওনা (বাকি) রয়ে গেছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা (সত্যিকার) মুমিনন হয়ে থাকো। তোমরা যদি তা (পরিত্যাগ) না করো, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ করো। আর যদি অনুতপ্ত হয়ে (সুদ) পরিত্যাগ করো, তবে মূলধন ফেরত নেয়া তোমাদের জন্যে বৈধ। তোমরা যুলুম করো না এবং যুলুমের শিকারও হয়ো না।[৪৫৪]

রাসূল (সা.) সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদ সংক্রান্ত মামলার লেখক ও সুদের সাক্ষী সকলের ওপর লানত করেছেন।

বিরোধীদের সাথে সদাচরণ

ইসলামের ছায়াতেই মানব জাতি আন্তর্জাতিক ও মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদর্শিক ও চারিত্রিক নীতি লাভ করেছে। সে নীতিটি হলো বিধর্মীদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত নীতি। তারা তাদের প্রধান শত্রুর সাথেও এ নীতি অবলম্বন করে। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও করেছে। ইসলামী শরীয়ত অন্যর ধর্ম বিশ্বাসকে সবসময় সম্মান করে। ইসলাম গ্রহণের জন্য কাউকে কখনো বাধ্য করে না। পবিত্র কুর'আন এ সম্পর্কে ঘোষণা দেয়:

لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ •

অর্থ: দীন গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা ও বল প্রয়োগ নেই। সঠিক পথকে উজ্জ্বল-পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে, সে সবচে মজবুত বিশ্বস্ত হাতলটিই আঁকড়ে ধরবে, যা কখনো ভেঙ্গে যাবার নয়। আর আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।[৪৫৫]

মুসলিমদের একান্ত কর্তব্য মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য সুশীল, শিষ্ঠাচারসম্পন্ন, নম্র, সম্প্রীতিশীল ও সদাচারী হওয়া। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সমস্ত লোকদের ভালোবাসেন না যারা অন্যদের প্রতি অপ্রীতিকর ও অমার্জিত।

সর্বক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা

ইসলামী শরীয়তের ছায়াতেই ন্যায় বিচার বিস্তৃতি লাভ করেছে। সমস্ত মানুষ তার সুফল ভোগ করেছে। ইসলাম কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না। মহান আল্লাহ হলেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠার বিধানদাতা। তিনি কখনো তাঁর কোনো বান্দার ক্ষতি করেন না। একদা এক নিরপরাধ ইয়াহুদীর

৪৫৪. আল কুর'আন, ২:২৭৮-২৭৯

৪৫৫. আল কুর'আন, ২:২৫৬

বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হলে পবিত্র কুর'আনে এমন সব চিরন্তন আয়াত নাযিল করা হয়, যাতে সুস্পষ্টভাবে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয় এবং অভিযোগকারীদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'য়ালা নিম্ন প্রদত্ত বাণীতে এর উল্লেখ করেন।

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَ لَا تَكُنۡ لِّلۡخَآئِنِيۡنَ خَصِيۡمًا ۙ • وَّ اسۡتَغۡفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا • وَ لَا تُجَادِلۡ عَنِ الَّذِيۡنَ يَخۡتَانُوۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنۡ كَانَ خَوَّانًا اَثِيۡمًا • يَّسۡتَخۡفُوۡنَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسۡتَخۡفُوۡنَ مِنَ اللّٰهِ وَ هُوَ مَعَهُمۡ اِذۡ يُبَيِّتُوۡنَ مَا لَا يَرۡضٰى مِنَ الۡقَوۡلِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ مُحِيۡطًا • هٰۤاَنۡتُمۡ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلۡتُمۡ عَنۡهُمۡ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۫ فَمَنۡ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنۡهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ اَمۡ مَّنۡ يَّكُوۡنُ عَلَيۡهِمۡ وَكِيۡلًا • وَ مَنۡ يَّعۡمَلۡ سُوۡٓءًا اَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهٗ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا • وَ مَنۡ يَّكۡسِبۡ اِثۡمًا فَاِنَّمَا يَكۡسِبُهٗ عَلٰى نَفۡسِهٖ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا • وَ مَنۡ يَّكۡسِبۡ خَطِيۡٓئَةً اَوۡ اِثۡمًا ثُمَّ يَرۡمِ بِهٖ بَرِيۡٓـًٔا فَقَدِ احۡتَمَلَ بُهۡتَانًا وَّ اِثۡمًا مُّبِيۡنًا • وَ لَوۡ لَا فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكَ وَ رَحۡمَتُهٗ لَهَمَّتۡ طَّآئِفَةٌ مِّنۡهُمۡ اَنۡ يُّضِلُّوۡكَ ؕ وَ مَا يُضِلُّوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡفُسَهُمۡ وَ مَا يَضُرُّوۡنَكَ مِنۡ شَىۡءٍ ؕ وَ اَنۡزَلَ اللّٰهُ عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ وَ الۡحِكۡمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُنۡ تَعۡلَمُ ؕ وَ كَانَ فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكَ عَظِيۡمًا •

অর্থ: আমরা তোমার প্রতি সত্যতা ও বাস্তবতার নিরিখে নাযিল করেছি এ কিতাব, যাতে আল্লাহ্ তোমাকে যে সঠিক পথ জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করে দিতে পারো। তুমি কখনো খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ক করো না। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, কারণ আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান। যারা নিজেদের সাথে খিয়ানত করে, তুমি তাদের পক্ষে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোনো খেয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না। তারা মানুষ থেকে তাদের দুষ্কর্ম গোপন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্র থেকে গোপন করতে পারে না, তিনি তাদের সাথেই থাকেন রাত্রে যখন তারা তাঁর অপছন্দনীয় সলাপরামর্শ করে। তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে আছেন। হ্যাঁ, তোমরা ইহজীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছো, কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে কে বিতর্ক করবে তাদের পক্ষে? কিংবা কে হবে তাদের পক্ষে উকিল? যে কেউ পাপ কাজ করে, কিংবা নিজের প্রতি যুলুম করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল দয়াবানই পাবে। যে কেউ কামাই করবে পাপ, সে তা কামাই করবে নিজেরই বিরুদ্ধে। আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাবান। যে কেউ উপার্জন করবে অপরাধ বা পাপ, পরে তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করবে, সে তো বহন করবে মিথ্যা অপবাদ এবং সুস্পষ্ট পাপের বোঝা। তোমার প্রতি যদি আল্লাহ্র ফজল (অনুগ্রহ) এবং রহমত (দয়া) না হতো, তাহলে তাদের একটি দল তোমাকে বিপথগামী করতে চাইতো। আসলে তারা তো নিজেদের ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করে না। তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তো তোমার প্রতি নাযিল করেছেন আল কিতাব (আল কুরআন) এবং হিকমাহ (কর্মকৌশল ও কার্যনির্বাহী জ্ঞান) আর তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তোমার প্রতি আল্লাহ্র ফজল বিরাট।[৪৫৬]

দুনিয়াবাসী ইসলামী আদালতের ন্যায় অন্য কোনো আদালত কখনো দেখতে পায়নি।

৪৫৬. আল কুর'আন, ৪:১০৫-১১৩

সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা বিধান

ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর তত্ত্বাবধানে মুসলিম ব্যক্তির ঈমান এবং মুসলিম রাষ্টের ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়েছে। পরিবার ও গোত্রের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ববোধের ফলে শক্তিশালীরা দূর্বলদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সামর্থবানরা সামর্থহীনদের দায়িত্ব নেয়। একই এলাকা বা অঞ্চলের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এর কারণে ফরয বিধান হিসেবে ধনীদের যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়।

সামাজিক দায়িত্ববোধ আমরা দেখতে পেয়েছি রাসূল (সা.) এর জীবনে। তিনি তার প্রতিনিধি ও সাদকা উসুলকারীদের যেসব গোত্র ও অঞ্চল ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তাদের কাছে প্রেরণ করতেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিতেন তারা যেন সেসব গোত্র ও অঞ্চলের ধনীদের যাকাত আদায় করে তা গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। এসব যাকাত উসুলকারী আমিল বা কর্মকর্তাগণ সেখানে গিয়ে যাকাত উসুল করতেন এবং তা তাদের গরীবদের মধ্য বণ্টন করে দিতেন। পরিশেষে কেবল তার চাদর ও লাঠি নিয়ে ফিরে আসতেন।[৪৫৭]

সৎ ও যোগ্য শাসক সৃষ্টি

ইসলামী শাসনের ছায়াতলে এমন সব শাসক সৃষ্টি হয়েছিলো যারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন না। জনগণকে যুলুম করতেন না। জনগণের ওপর কিছু চাপিয়ে দিতেন না। বরং তারা জনগণের পরামর্শ চাইতেন এবং তা গ্রহণ করতেন। পূর্ণ সততা ও ইনসাফের সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। শাসক এবং শাসিতের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা অনুধাবন করা অতীব প্রয়োজনীয়। কুর'আনে বলা হয়েছে:

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার হকদারকে দিয়ে দিতে। তিনি আরো নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সুবিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদের অতি উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৪৫৮]

এভাবেই ইসলামী আইন সমাজের সর্বস্তরে কল্যাণ সাধন করে থাকে এবং সমাজের মানুষদের মাঝে এনে দেয় প্রশান্তি। ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য মানবের কল্যাণ সাধন করা। ইসলামী আইন মানবকল্যাণকে শুধুমাত্র ইহকালেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। ইসলামী আইনের চিরন্তনতা ও ব্যাপকতা স্থান-কালের সীমার উর্ধ্বে। ইসলামী আইন প্রণয়নে রাসূল (সা.) এর মর্যাদা পৃথিবীর সমগ্র আইন প্রণয়নারী সংস্থার উর্ধ্বে। আল্লাহর নির্দেশেই রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠা করেন আল্লাহর আইনানুগ সরকার। সরকারের প্রধান ছিলেন স্বয়ং রাসূল (সা.)। রাসূর (সা.) প্রতিষ্ঠিত সে সমাজে ছিলো না সন্ত্রাসবাদ, ছিলো না অত্যাচার, নির্যাতন। সে সমাজে বসবাসরত সব ধর্মাবলম্বীর স্বাধীনতা ও অধিকারের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি ছিলো। ইসলামী আইনের আলোকে তৈরি সমাজে নাগরিকরা নিরাপত্তা বলয়ের ভিতর থাকে এবং নাগরিকদের সবার মাঝে থাকে শান্তি ও সম্প্রীতি।

---

৪৫৭. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৪৫৮. আল কুর'আন, ৪:৫৮

সুপারিশমালা

আজ আমরা যে সমাজে বাস করছি সে সমাজ অন্যায়ের স্রোতে ভেসে চলছে। বিশুদ্ধ ঈমান ও তাওহীদী আকীদাহ বিশ্বাসের সাথে ভেজালের মিশ্রণ ঘটেছে। মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শয়তান তার রাজত্ব কায়েম করে নিয়েছে। চতুর্দিকে অন্যায় অশান্তির বিষাক্ত ছোবল। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অস্থিরতা বিরাজমান। সমাজের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা আজ বিলুপ্তির পথে। আল্লাহর সন্তোষ আর পরকালের নাজাত প্রত্যাশী মানুষদের এ ঘুনে ধরা সমাজকে শান্তিময় করে তোলার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে ও পরিবার পরিজনদের বাঁচাতে কুর'আন নির্দেশিত পথ অবলম্বন করতে হবে। আল কুর'আন মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য চমৎকার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। পরিবারকে উত্তম সমাজের ভিত্তি বলে গণ্য করেছে এবং একে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিধানও বর্ণনা করেছে। সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য পারিবারিক জীবনে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রগুলোকে আলাদা করেছে। যে সমাজে সবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্যায়ের মোকাবিলায় কঠিনভাবে রুখে দাঁড়ানোর মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে। একটি জনকল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌল উদ্দেশ্য।

এ অবস্থায় আল কুর'আনের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর রূপরেখা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা তুলে ধরা হলো:

০১. কুর'আনি সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা চালানো প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। এ দায়িত্ব পালন শুরু হয় পারিবারিক জীবন থেকে। পরিবার যদি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাহলে অনাবিল শান্তি অবধারিত। প্রতিটি পরিবারের সদস্যগণকে নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তাহলে কাঙ্ক্ষিত সুন্দর ও সুশৃংখল পরিবার গড়ে উঠে। আর সুন্দর ও সুশৃংখল পরিবার গড়ে উঠলেই সুন্দর ও সুশৃংখল সমাজ প্রতিষ্ঠ সম্ভব।

০২. পরিবার একজন মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ। পরিবার নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি শিশু সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠে। পরিবারের রীতিনীতির উপর ভিত্তি করেই শিশুর মনোজগত তৈরি হয়। তাই শিশুর সঠিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিটি পরিবারের বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

০৩. ইসলামের পারিবারিক আদর্শ সম্পর্কে চরম অজ্ঞতাজনিত রক্ষণশীলতা ও অপরদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচন্ড আঘাত আজ মুসলিম সমাজের পারিবারিক জীবনকে এক মহা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এরূপ অবস্থায় অনতিবিলম্বে আমাদের পরিবারকে এ বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

০৪. পরিবারের সবার মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য পরিবারের প্রতিটি সদস্যের আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকা প্রয়োজন।

০৫. সমাজের সকল শ্রেণীর পরিবারের নৈতিকতার মান উন্নয়নের মাধ্যমে অবক্ষয় রোধ করার চেষ্টা করতে হবে।

০৬. ইসলামী পরিবার ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ উভয়কে তাদের আত্মিক অবস্থা অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তারা একে অপরের পরিপূরক। তাদের নিজ নিজ স্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। তাহলেই একটি পরিপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

০৭. ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখতে সক্ষম। ধর্ম, বর্ণ ও দল-মতের ভেদাভেদ ভুলিয়ে সবার মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখা খুব প্রয়োজন। ভ্রাতৃত্বচর্চা বৃদ্ধি পেলে মুসলিম উম্মাহ কলহের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসতে পারবে।

০৮. ইসলামে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে সুদৃঢ় বন্ধনের মাধ্যমে। এ সম্পর্ক যেন তুচ্ছ কোনো কারণে বিনষ্ট না হয়, সেদিকে পরিবারগুলোকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিশ্বের প্রতিটি অণু পরমাণু আল্লাহর আইন মেনে চলছে। এজন্যই এ বিশ্বজগত এতো সুন্দর। মানুষকে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে। কিন্তু এ দুনিয়ার চারদিকে তাকালে দেখা যায় মানুষে মানুষে সৃষ্টি হয়েছে ভেদাভেদ, হানাহানি ও বিদ্বেষ। অশান্তিতে জর্জরিত হয়ে উঠছে পরিবার ও সমাজ। পবিত্র কুর'আনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে বাতলে দিয়েছেন সরল শান্তির পথ সিরাতুল মুস্তাকীম। কিন্তু আল্লাহর দেখানো এ মুক্তির পথ বাদ দিয়ে মানুষ নিজেই তার চলার পথ রচনার চেষ্টা করেছে বহুবার। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু মতবাদ ও মতাদর্শ। যেগুলো মানবতার কল্যাণের জন্য বড় বড় শ্লোগান দেয়। কিন্তু পৃথিবীর শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানব রচিত কোনো মতবাদই মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারেনি। পারেনি নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা। ইতিহাস সাক্ষী, একমাত্র আল কুর'আনের অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকার শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পেরেছে।

ইসলামের গোটা ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র ও ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর সত্তা। এ ব্যবস্থাপনায় যা কিছু রয়েছে তা মনন ও প্রত্যয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত হোক অথবা তা দুনিয়াবি জীবনের কোনো কাজই হোক প্রতিটি জিনিসেরই গতি এক আল্লাহর দিকেই নিবদ্ধ থাকবে। ইসলাম নির্দেশিত কাজগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হলে তা হবে সৎ ও প্রতিদানযোগ্য কাজ, নতুবা তা হবে নিষ্ফল ও অর্থহীন কাজ। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় শাখা একই কেন্দ্রের অভিমুখী। এ লক্ষ্য ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বত্র বিস্তৃত। দুনিয়ায় যতো বৈষয়িক উদ্দেশ্য রয়েছে, তার কোনো একটিতে দু'জন মানুষও সত্যিকার অর্থে একে অপরের সহায়ক হতে পারে না। এমনকি রক্তের সম্পর্কও ছিন্ন হতে দেখা যায়। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কাজ করা হয়, তাতে কেউ কারো স্বার্থে সংঘর্ষ না লাগিয়ে কোটি কোটি মানুষ একই সময়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।

সারা বিশ্বে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। পারিবারিক জীবন যাপনের মূখ্যতম লক্ষ্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মনের স্থায়ী শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ। এ ছাড়াও অন্যতম বৃহত্তম লক্ষ্য হচ্ছে সন্তানদের আশ্রয়দান, তাদের সুষ্ঠু লালন-পালন। মানব সন্তানের জন্ম হয়তো পারিবারিক জীবন ছাড়াও সম্ভব, কিন্তু তার পবিত্রতা বিধান, সুষ্ঠু লালন পালন, সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যত সমাজের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পারিবারিক জীবন ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ে মুসলিমদের পারিবারিক জীবন ইসলামী আদর্শের অনুসারী নয়। কোথাও তা পুরোপুরিভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং গোটা পরিবারই ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলেছে। আর কোথাও সম্পূর্ণ না হলেও ইসলামের অনেক নীতিই অনুসৃত ও প্রতিপালিত হচ্ছে না। পারিবারিক জীবনে অনাবিল শান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে পরিবার হয়ে উঠবে সব উদ্যম, প্রেরণা ও প্রশান্তির ক্ষেত্র। একটি পরিবারই সমাজকে ইতিবাচক অর্থে সার্থকভাবে কিছু দিতে পারে, যা সুস্থ সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। পারিবারিক পবিত্রতা ও সুস্থতার উপরই নির্ভর করে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বময় মানবজাতির পবিত্রতা ও সুস্থতা।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে কখনো শ্রেণী মানসিকতা বা শ্রেণী সংঘাত দেখা যায় না। অর্থনৈতিক স্বার্থে উচ্চবিত্ত বা নিম্নবিত্তের লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য কেউ সংঘবদ্ধ হয় না। এখানে কখনো শ্রেণী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। সূচনাকাল থেকেই ইসলামী সমাজ বর্ণ, গোত্র অথবা জন্মগত কারণে মানুষের মধ্যে কোনো ধরনের ব্যবধানকে

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার করেনি। মুসলিমরা পরস্পর সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহর কাছে তাকওয়ার (পরহেজগারির) মানদন্ড ছাড়া আর কেউ কোনো দিক দিয়ে কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতে পারে না। ইসলামী সমাজ সকলের জন্য উন্মুক্ত। এ সমাজের সকল সদস্য সমান মর্যাদার সাথে বসবাস করে এবং নিজেকে বিকশিত করার ও জীবন নির্বাহে অর্থোপার্জনে সমান সুযোগ পায়। এখানে কোনো সামাজিক বৈষম্য নেই। যদি ইসলামী সমাজের বৈজ্ঞানিক, মার্জিত ও সুসভ্য অগ্রগতি অব্যাহত থাকতো এবং আজকের মানবতার নেতৃত্ব দিতো তাহলে ভালোবাসা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে শক্তিশালী সমাজ গঠনে ইসলামের সৌন্দর্য আরো সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়তো। রাসূল (সা.) এর সময় থেকে এখন পর্যন্ত ইসলামী সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। যুগে যুগে নবী রাসূলগণের কর্মসূচি ছিলো এক ও অভিন্ন। কিন্তু কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশল ছিলো ভিন্ন। সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে সামনে রেখে তাঁরা নিজেদের কর্মকৌশল ঠিক করেছিলেন। কুর'আনি সমাজ গঠনের জন্য এমন কিছু মানুষ তৈরি হওয়া প্রয়োজন যারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ গঠনের যোগ্যতা রাখেন। যারা সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে সামনে রেখে একটি বাস্তবভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে পারবেন। দেশ ও জাতি দ্বিধাহীনচিত্তে যাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে। তবেই সে সমাজের মানুষ খুঁজে পাবে শান্তি ও স্বস্তি।

আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে আজ ভেদাভেদ, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আজ শিথিল। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ, সহিংসতা আর হানাহানিতে লিপ্ত। সমগ্র বিশ্বে আজ অশান্তির তীব্র আগুন জ্বলছে। দেশের ভেতরে রক্তারক্তি, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশে দেশে যুদ্ধ। মানবতাকে মানবতা বিধ্বংসী এ ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কুর'আনি অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করে শান্তি প্রতিষ্ঠা সময়ের অনিবার্য দাবি। কুর'আনে বর্ণিত পারিবারিক ও সামাজিক নির্দেশনা অনুসরণীয় সব মুসলিমকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার হাত প্রসারিত করতে পারে।

মহাগ্রন্থ আল কুর'আন মহান আল্লাহ পৃথিবীবাসীর জন্য নিয়ামত স্বরূপ পাঠিয়েছেন, পাঠিয়েছেন হিদায়াতের মাধ্যম হিসেবে। এ কুর'আন এসেছে মানুষের জীবন বিধান হিসেবে। তাই এ কুর'আনকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় গ্রন্থ না ভেবে বরং কুর'আনের শাশ্বত দাবিকে উপলব্ধি করার সাথে সাথে সে দাবির হক আদায় করা প্রয়োজন। তাহলেই সম্ভব কুর'আনের আলোয় আলোকিত একটি সুন্দর সমাজ নির্মাণ করা। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুস্থতা প্রতিষ্ঠায় কুর'আনের অনুসরণ আজ খুব প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপুঞ্জী

০১. আল কুর'আনুল কারীম

তাফসীর গ্রন্থসমূহ

০২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল আনসারী আল কুরতুবী, *আল জামিউ লি আহকামিল কুর'আন* (মিশর: কায়রো, দারু কিতাবিল আরাবী, ১৯৬৭)

০৩. আবুল ফিদা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর (র.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবর রহমান (ঢাকা: হুসাইন আল মাদানী, ২০১২)

০৪. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.), *তাফসীরে মাযহারি*, অনু. মাওলানা তালেব আলী (নারায়ণগঞ্জ: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ১৯৯৯)

০৫. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), *তাফসীরে মাআরেফুল কুর'আন*, অনু. মাওলানা মহিউদ্দিন খান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ১৯৮৮)

০৬. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *তাফহীমুল কুর'আন*, অনু. আবদুল মান্নান তালিব (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪)

০৭. সাইয়েদ কুতুব (র.), *তাফসীর ফী যিলালিল কুর'আন*, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ (লন্ডন: আল কুর'আন একাডেমী, ১৯৯৫)

০৮. শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র.), *তাফসীরে ওসমানী* (ঢাকা: আল কুর'আন একাডেমী, ১৯৯৬)

হাদীস গ্রন্থসমূহ

০৯. আবূ আবদির রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব আন নাসায়ী, *সুনানুন নাসায়ী* (দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৬)

১০. আবু দাউদ সিজাস্তানি, *সুনানু আবী দাউদ* (বৈরুত: লেবানন, দারু ইহইয়াতিত তুরাছিল আরাবী, ১৯৭৫)

১১. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা* (বৈরুত: ইহইয়াতিত তুরাছিল আরাবী, ১৯৭৫)

১২. আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল মুসনাদ* (মিশর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৮০)

১৩. আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা*, অনু. মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০)

১৪. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, অনু. মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭)

১৫. ইমাম মালেক ইবন আনাস, *আল মুয়াত্তা* (বৈরুত: লেবানন দারু ইহইয়ালিল 'উলুম, ১৯৮৮)

১৬. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, অনু. অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮২)

১৭. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০১৭)

১৮. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অনু. মাওলানা মোজাম্মেল হক, মাওলানা আফলাতুন কায়সার (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার, ২০০২)

১৯. এম, আফলাতুন কায়সার, *মিশকাত শরীফ* (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৩)

২০. এ.কে.এম ইউসুফ, *হাদীসের আলোকে মানব জীবন* (ঢাকা: খেলাফত পাবলিকেশন, আগস্ট ২০০৪)

২১. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *তাদরিসুল হাদিস* (ঢাকা: বর্ণালি বুক সেন্টার, সেপ্টেম্বর ২০১৯)

২২. মুহিউদ্দিন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী (র.), *রিয়াদুস সালিহীন*, অনু. সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১)

২৩. হাফেজ ইমাম আবু মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন, *আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব*, অনু. হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক (ঢাকা: হাসনা প্রকাশনী, ২০০২)

অন্যান্য গ্রন্থাবলী

২৪. অধ্যাপক ফিরোজা খানম, *আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশে ধর্ম* (ঢাকা: পলল প্রকাশনী, ২০০১)

২৫. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *সমাজ ও বিবাহ* (কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৩)

২৬. আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী, *দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০ টি সমাধান*, সম্পাদনা. মো. আব্দুল কাদের মিয়া (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন, আগস্ট ২০১২)

২৭. আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামের পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: বর্ণালী বুক সেন্টার, সেপ্টেম্বর, ২০০৭)

২৮. আবদুস শহীদ নাসিম, *কুআন ও পরিবার* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৬)

২৯. আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, *মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার*, অনু. আব্দুল কাদের (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯৬)

৩০. আ.স.ম. নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *সমাজকল্যাণ নীতি ও কর্মসূচি* (ঢাকা: বই পত্র, ২০০২)

৩১. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৯১)

৩২. আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামে জ্ঞানচর্চা* (ঢাকা: সেন্টার ফর এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০১৪)

৩৩. আবদুস শহীদ নাসিম, *কুর'আনের সাথে পথ চলা* (ঢাকা: বর্ণালি বুক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০০৬)

৩৪. আবদুস শহীদ নাসিম, *মুক্তির পথ ইসলাম* (ঢাকা: WAMY প্রথম প্রকাশ- জুলাই ২০০৪)

৩৫. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, অনু. ড. মাহফুজুর রহমান (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২)

৩৬. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনু. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২)

৩৭. ইবন হাজার আসকালানী, বুলুগুল সারাম, *কিতাবুন নিকাহ* (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৯৯)

৩৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (গবেষণা বিভাগ), *ইসলামী দর্শন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৪)

৩৯. ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফেলোবৃন্দ, *পবিত্র কুরআনের আলোকে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়* (ঢাকা: আই.ই.আর.এফ, ২০১৩)

৪০. ইসলামি গবেষণা পত্রিকা- *মাসিক পৃথিবী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)

৪১. *ইসলামি বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল- জুন ১৯৯৭)

৪২. কাজী মুহাম্মদ নিজামুল হক, *বিশ্বময় ইসলামের পুনর্জাগরণ* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০০৪)

৪৩. গোলাম হোসেন, *বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি* (ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯২)

৪৪. নসরুল্লাহ খান আযীয, *ইসলামের জীবন চিত্র*, অনু. আব্দুস শহীদ নাসিম (ঢাকা: বর্ণালী বুক সেন্টার, নভেম্বর ২০০৪)

৪৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮)

৪৬. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর'আনের পরিভাষা* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, প্রকাশকাল- ডিসেম্বর ১৯৯৮)

৪৭. ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম* (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০০৯)

৪৮. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা* (ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এড সেন্টার, জুন ২০১৫)

৪৯. ড. আকরাম জিয়া আল উমরী, *রাসূলের (সা.) যুগে মদীনার সমাজ রূপ ও বৈশিষ্ট্য*, অনু. মো: সাজ্জাদুল ইসলাম (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৯৯৮), খ. ১

৫০. ড. মো. নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা* (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স)

৫১. ড. মোস্তফা আস সাবায়ী, *স্বর্ণযুগে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ*, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ (ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ২০০৬)

৫২. ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ১৯৮৭)

৫৩. ফ্লোরা এচ উইলিয়ামস, *আপনি এবং আপনার সন্তান*, অনু. মি. শৈলেন্দ্রনাথ বাড়ৈ, মিসেস জেসমিন জেনী বেগম (ভারত: ওরিয়েন্টাল ওয়াচম্যান পাবলিশিং হাউজ, ২০০১)

৫৪. *বাংলা পিডিয়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকাল- মার্চ ২০০৩)

৫৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *কুর'আন ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৯৭)

৫৬. মো: রফিকুল ইসলাম, মাওলানা শফিকুল ইসলাম খান, হাফেজ মাওলানা আরিফ হোসাইন মজুমদার, *বিষয়ভিত্তিক কুর'আন ও হাদীস সংকলন-১* (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল- জানুয়ারি ২০১১)

৫৭. মো: নুরুল ইসলাম, *আল-কুর'আনে আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৩)

৫৮. মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন সাম্ভলী, *পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম*, অনু. অধ্যাপক আবুল কাশেম মুহাম্মাদ ছিফাতুল্লাহ্ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩)

৫৯. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১০)

৬০. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *আল কুর'আনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জানুয়ারি ১৯৯৩)

৬১. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী, *সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, সংকলন: মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন, নভেম্বর ২০১১)

৬২. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *মহানবী (সা.) এর প্রশাসন* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১০)

৬৩. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামে সম্পদ অর্জন ব্যয় ও বণ্টন* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১০)

৬৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *সীরাতে সরওয়ারে আলম*, অনুবাদ: আব্বাস আলী খান (ঢাকা: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৮৮)

৬৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১ম খন্ড* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

৬৬. সাজেদা হোমায়রা, *শ্রেষ্ঠ জীবনের পথ* (ঢাকা: বাংলাদেশ কুর'আন শিক্ষা সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর ২০১৪)

৬৭. সম্পাদনা পরিষদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৫)

৬৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা*, সম্পাদনা: আব্দুস শহীদ নাসিম (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, আগস্ট ২০০৮)

৬৯. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, অনু. মাওলানা কারামত আলী নিযামী (ঢাকা: এ.এচ.পি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

৭০. শাহ আবদুল হান্নান, *দেশ সমাজ রাজনীতি* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, মার্চ ২০০৩)

৭১. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র.), *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*, অনুবাদ: আহমদ মানযুরুল মাওলা (ঢাকা: ফেরদৌস পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৭৮)

৭২. হাফেজ মাওলানা শহীদুল ইসলাম, *আল কুর'আনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত* (ঢাকা: আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯৬)

৭৩. হাসান আইউব, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, অনু. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৪)